শ্রীপূর্ণচন্দ্র বসু

প্রণীত।

কলিকাতা,

২০১, নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, বেঙ্গল মেডিকেল লাইব্রেরী হইতে

শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক

প্রকাশিত।

১৩১৪।

মূল্য ১৲ এক টাকা।

নিবেদন।

সকলেই জানেন, "কর্ম্মফলবাদ" হিন্দুধর্ম্মের কেমন প্রধান নীতি। ধর্ম্মেই শুদ্ধ যে, এই ফলবাদের প্রাধান্য, এমত নহে; পৌরাণিক সাহিত্যেও তাহার প্রাধান্য। হিন্দু-ধর্ম্মকর্ম্মে যেমন ফলশ্রুতি কীর্ত্তিত হয়, পৌরাণিক সাহিত্যেও তদ্রূপ। এ গ্রন্থে সাহিত্যেরই "ফলশ্রুতি" গৃহীত হইয়া তাহার প্রকৃতি বিশিষ্ট-রূপে পর্য্যালোচিত হইয়াছে। "সাহিত্যচিন্তা"য় এই ফলশ্রুতি, "অধ্যয়ন-ফল" বলিয়া অনেক স্থলেই উক্ত হইয়াছে। কিন্তু তাহাতে সেই অধ্যয়ন-ফলের প্রকৃতি ও লক্ষণ কিছুই বলা হয় নাই। কারণ, তাহা ভালরূপে বলিতে গেলে একখানি স্বতন্ত্র গ্রন্থ লিখিতে হয়। সেই গ্রন্থ এক্ষণে প্রকাশিত হইল। এই ফলবাদ দ্বারা আমাদিগের পৌরাণিক কবিগণ চালিত হইয়া আর্য্যসাহিত্যে কেমন উৎকৃষ্ট ফললাভ করিয়া গিয়াছেন, তাহা এই গ্রন্থে পরিদৃষ্ট হইবে। আর সেই নীতি-বিরহিত হইয়া এক্ষণে বাঙ্গালাসাহিত্যে কিরূপ কুফল ফলিতেছে, তাহাও এ গ্রন্থ-পাঠে প্রতীত হইবে।

বিলাতী সাহিত্যের সহিত তুলনা করিতে গেলেই আর্য্যসাহিত্যে বিস্তর বিভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। সেই সমূহ বিভিন্নতার মধ্যে পৌরাণিক সাহিত্যের "ফলশ্রুতি"ও গণ্য। এই ফলশ্রুতির বিষয় চিন্তা করিতে গিয়া আমি আর্য্যসাহিত্যে যে ফল-বাদ দেখিতে পাইয়াছিলাম, তদ্দ্বারাই সেই সাহিত্যের অপর সর্ব্ববিধ বিভিন্নতার রহস্য সুন্দর বুঝিতে পারিয়াছি। "সাহিত্যচিন্তা"য় কতিপয়

বিভিন্নতার কারণ ও রহস্য প্রদর্শন করিয়াছি, এ গ্রন্থে আর কতিপয় বিভিন্নতার কারণ পর্য্যালোচনা করিয়া সেই ফলবাদেরই সমর্থন করিয়াছি। এই ফলবাদে শুধু যে বিভিন্নতার রহস্যোদ্ভেদ হইয়াছে এমত নহে; তদ্দ্বারা আরও প্রতিপন্ন হইয়াছে, সেইরূপ বিভিন্নতাই আর্য্যসাহিত্যের গৌরবহেতু। বাঙ্গালা সাহিত্যে এক্ষণে যে সকল গ্রন্থ বিলাতী আদর্শে সৃষ্ট হইতেছে, তাহাতে তদ্রূপ বিভিন্নতাও নাই এবং ফল-গৌরবও নাই। অতএব, এই ফলবাদ যদি আমাদিগের নূতন বাঙ্গালা সাহিত্যে অবলম্বিত হয়, নিশ্চয় বলিতে পারি, সেই সাহিত্য শুধু যে প্রকৃত হিন্দুনীতির মূলভিত্তির উপর পরিস্থাপিত হইবে এমত নহে, দিন দিন তাহার শ্রীবৃদ্ধিসাধন ও শ্রেয়োলাভ হইবে।

কলিকাতা, হোগলকুঁড়িয়া।
১লা বৈশাখ, ১৩১৪।

গ্রন্থকার।

সূচী।

বিষয়। পত্রাঙ্ক।

ভ্রমসংশোধন।

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	পত্র	ছত্র।
দিরা	দিয়া	৬৯	২১
অসিতে	অসিকে	৭১	১৭
ভাষায়	ভাষার	৮৪	৪
কর্ম্মক্ষেত্রে	কর্ম্মক্ষেত্রের	১১৪	৫
জনসনের	কি জনসনের	১১৮	১১
সে	যে	১৩৩	৬
আর্য্যসাহিত্যে	আর্য্যসাহিত্য	১৩৭	১২
নারার	নারীর	১৫৫	১২
যে	যে কর্ম্ম	২০৪	২
সেই	সে	২০৪	৪
সেই সকল	সেই	২০৪	৫
না,	না; তেমনি ইন্দ্রা-দেশে অপ্সরার কার্য্য।	২০৪	৬
কৃত	যে কার্য্য কৃত	২০৪	৭
প্রণীর	প্রাণীর	২২৪	৮
বিরযকে	বিষয়কে	২২৬	১৮
এবং	বরং	২৩৬	১৬

সাহিত্যের সমালোচনা।

আর্য্যসাহিত্যে সমালোচনা নাই।

ইউরোপীয় সাহিত্যের সহিত আমাদের সংস্কৃত আর্য্যসাহিত্যের তুলনা করিলে দেখা যায় যে, ইউরোপীয় সাহিত্যে এমন অনেক সামগ্রী আছে, যাহা আমাদের আর্য্যসাহিত্যে নাই। ইউরোপীয় সাহিত্যের গৌরব যে 'ট্র্যাজিডি,' আর্য্যসাহিত্যে তাহা নাই। আর্য্যসাহিত্যে 'ট্র্যাজিডি' কেন একেবারে পরিত্যক্ত হইয়াছে, তাহা "সাহিত্যচিন্তা"নামক গ্রন্থে প্রদর্শিত হইয়াছে। এক্ষণে আমরা পরীক্ষা দ্বারা বিলক্ষণ দেখিতে পাইতেছি যে, সেই 'ট্র্যাজিডি' ইংরাজীতে বহুলরূপে অধীত হওয়ায়, ভদ্রসমাজের মধ্যে আত্মহত্যা, খুন প্রভৃতি পাতক-ভয় অনেকাংশে অপনীত হইয়াছে এবং সমাজে সেই সেই অনিষ্টাপাত আর বিরল ঘটনা নাই। আধুনিক বাঙ্গালা সাহিত্যের মধ্যেও খুনান্ত নাটক নভেল প্রচলিত হওয়ায়, সেই সাহিত্য-অধ্যয়নের কুফল দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। এখন আর কেহ কাহাকে মানে না; আমাদের পুত্রকন্যাদিগকে এবং গৃহ-

বধূগণকে ধম্‌কাইতে বা শাসন করিতে আর আমাদের সাহস হয় না। ভয় দেখাইতে গেলেই তাহারা অমনি বিষের বাটী, না হয় ছুরী হাতে করিয়া বসে। এ বড় সর্ব্বনাশের কথা!

আর্য্যসাহিত্যে যে শুদ্ধ 'ট্র্যাজিডি' নাই, এমন নহে; মোক্ষমূলার তাঁহার প্রসিদ্ধ "ধর্ম্মের উৎপত্তি ও উন্নতি"-বিষয়ক Hibbert Lecture-এর মধ্যে ভারতে ধর্ম্মের উৎপত্তি-সম্বন্ধে বলিয়াছেন—"প্রকৃত ইতিহাস-শব্দে যাহা বুঝায়, তাহা ভারতীয় সাহিত্যে একপ্রকার নাই বলিলেই হয়।" একপ্রকার নাই বলিবার কারণ এই, সংস্কৃত সাহিত্যের মধ্যে যে দুই একখানি ইতিহাস আছে, তাহা আর ধর্ত্তব্যের মধ্যে নহে। ইংরাজীর 'ভলম্ ভলম্' ও রাশি রাশি ইতিহাসগ্রন্থের সহিত তুলনায় তাহাদের সংখ্যা নগণ্য। ইউরোপীয় সাহিত্যের ঐতিহাসিক গ্রন্থ-সমুদয় একত্র করিলে বোধ করি একটা বাড়ী পূরিয়া যায়। সে সকল ইতিহাস কেবল আসুরিক ব্যাপারে ও বীরত্বের বিবরণে পরিপূর্ণ। আর্য্যসাহিত্য সে প্রকার ইতিহাস রক্ষা করা উপযুক্ত বলিয়া বিবেচনা করে নাই। কেবল পাপচিত্রের বিবরণ রক্ষা করায় ফল কি? সেরূপ ইতিহাস-অধ্যয়নের ফল 'ট্র্যাজিডি'-পাঠের কুফলেরই সমান;—এ কথাও আমরা "সাহিত্যচিন্তায়" আলোচনা করিয়াছি *। ইংরাজীতে যাহাকে History বলে, তাহা অনুবাদ করিবার সময় আমাদের

* এস্থলে ইতিহাস শব্দের অর্থ প্রধানতঃ রাজবংশ এবং যুদ্ধাদির বিবরণ; সাহিত্য, বিজ্ঞান, শিল্প, দর্শন, সভ্যতা প্রভৃতির ইতিহাস নহে। এ সকল ইতিহাস ইউরোপেও সেদিন মাত্র আরম্ভ হইয়াছে, পূর্ব্বে ছিল না। সুতরাং সে সকল ইতিহাসের কথা ধর্ত্তব্য নহে।

বাঙ্গালা-লেখকেরা অন্য শব্দের অভাবে ঐ 'ইতিহাস'-শব্দই ব্যবহার করিয়াছিলেন। তদবধি ইতিহাস বলিতে সেই বিলাতী ভাবের ইতিহাসই এক্ষণে বুঝাইয়া থাকে। কিন্তু আর্য্যসাহিত্যে যে ইতিহাস-শব্দের প্রয়োগ আছে, তাহার অর্থ স্বতন্ত্র। সেরূপ ইতিহাসের প্রকৃতি কি, তাহা আমরা "কাব্যচিন্তা" এবং "হিন্দু-ধর্ম্মের প্রমাণ" নামক গ্রন্থদ্বয়ে বিস্তারিত রূপে দেখাইয়াছি, এ গ্রন্থেও পরে অপর প্রস্তাবে আরও কিছু বলিব। আর্য্যসাহিত্যে আরও এক বিলাতী সামগ্রীর অভাব দৃষ্ট হয়। সে সামগ্রী সমালোচন-সাহিত্য। ইউরোপীয় সাহিত্যে সমালোচন-সাহিত্য প্রচুর; এত প্রচুর, এত রাশি রাশি যে, তাহাও জড় করিলে বাড়ী পুরিয়া যায়। এক শেক্সপিয়ারের গুণকীর্ত্তনে প্রবৃত্ত হইয়া জার্ম্মান এবং বিলাতী লেখকগণ অসংখ্য বই লিখিয়াছেন। বিলাতী সাহিত্যে একখানা বই বাহির হইতে যত দেরী। বই বাহির হইলেই অমনি তাহার অসংখ্য সমালোচনা প্রকাশিত হইয়া পড়ে। এইরূপ সমালোচন-রীতি এক্ষণে বাঙ্গালা সাহিত্যেও প্রবেশ লাভ করিতেছে। তজ্জন্য কোন কোন লেখককে একেবারে স্বর্গে তোলা হইয়াছে। এরূপ সমালোচন-সাহিত্য সংস্কৃতে দেখা যায় না। ব্যাস, ব্যাল্মীকির গুণকীর্ত্তন লইয়া আর্য্যসাহিত্যে সমালোচন-গ্রন্থ কই? কালিদাসাদির সমালোচন-গ্রন্থ কোথায়? সে সাহিত্য মধ্যে রীতিমত সমালোচনার স্বতন্ত্র গ্রন্থ নাই; আছে কেবল অলঙ্কার-শাস্ত্র মধ্যে দোষগুণের পরিচ্ছেদে দৃষ্টান্তের উল্লেখ। আর আছে, টীকাকার এবং ভাষ্যকারগণের পুস্তকারম্ভে সামান্য ভূমিকা। ভাষ্যকে ঠিক সমালোচনা বলা যায় না। তাহা গ্রন্থস্থ প্রতি শ্লোকের ব্যাখ্যা, সঙ্গতি এবং তাৎপর্য্য। ইংরাজীতে যাহা Commentary, ভাষ্য

তদধিক আর কিছুই নহে। আর ভাষ্যকারগণের সামান্য ভূমিকা গ্রন্থের অধ্যয়ন-ফলমাত্র, সেই অধ্যয়নফলের সংক্ষিপ্ত বিবৃতি, তাহা রীতিমত সমালোচনা নহে। সমুদয় গ্রন্থ অধীত না হইলে তাহা ভালরূপে বোধগম্য হয় না। এই যৎসামান্য সমালোচনা ছাড়িয়া দিলে কি বলিতে পারা যায় না যে, আর্য্যসাহিত্যে ইউরোপীয় সাহিত্যের মত সমালোচন-সাহিত্যের সম্পূর্ণ অভাব? সে অভাব কেন ঘটিয়াছে, তাহা আমরা পরে বলিব। অগ্রে বিলাতী সমালোচন-সাহিত্যের কথা একবার আলোচনা করা যাউক।

অধ্যয়ন-ফল।

জ্ঞানালোচনার সঙ্গে সঙ্গে ইউরোপে এখন দিন দিন অজস্র গ্রন্থ প্রকাশিত হইতেছে। শেক্সপিয়ার বলিয়াছেন:—

"Poets are not blackberries."

কিন্তু যে পরিমাণে আজিকালি কবিতা প্রসূত হইতেছে, তাহা কালজাম অপেক্ষাও প্রচুর। প্রকৃতির নিয়ম এই যে, যাহা প্রভূতপরিমাণে জন্মে, তাহা প্রভূতপরিমাণে বিনষ্ট হয়। বাঙ্গালায় অজস্র পরিমাণে মৎস্য জন্মে; লোকে অজস্রপরিমাণে মৎস্য আহার করিয়া থাকে। সর্পের বহুসংখ্যক শাবক হয়; সর্প নিজেই অনেক শাবক খাইয়া ফেলে। সকল শাবক বাঁচিলে কি আর রক্ষা থাকিত? সাহিত্য-সম্বন্ধেও সেই নিয়ম। দিন দিন অজস্র কবিতা প্রসূত হইতেছে, কিন্তু তাহার অধিকাংশই ফেলা যাইতেছে। তৎসম্বন্ধে এডিনবর্গ-বীক্ষণ কি বলিয়াছেন, দেখুন:—

"There is nothing of which Nature has been more bountiful than poets. They swarm like the

spawn of the codfish, with a vicious fecundity that invites and requires destruction. To publish verses is become a sort of evidence that a man wants sense; which is repelled not by writing good verses, but by writing excellent verses—by doing what Lord Byron has done; by displaying talents great enough to overcome the disgust which proceeds from satiety and showing that things may become new under the reviving touch of genius."—Ed. Rev. No 43, page 68.

একথা স্বীকার্য্য; ইহা স্বীকার্য্য যে, লোকে লিখিতে শিখিলেই অগ্রে কবিতা লিখিয়া একবার কবি হইতে চাহেন। ডাক্তার ব্রাউন অগ্রে বিস্তর কবিতা লিখিয়া পরে দার্শনিক বিষয়ের বক্তৃতা দিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। তাঁহার কবিতাগুলি এক্ষণে আর কেহ পড়ে না, কিন্তু তাঁহার দার্শনিক বক্তৃতাগুলি চির-প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। ডাক্তার ব্রাউনের মনে যে কবিত্ব ছিল, তাহা তাঁহার দার্শনিক বক্তৃতার স্থানে স্থানে বিলক্ষণ প্রকাশিত হইয়াছে। ব্রাউন যদি এই বক্তৃতাগুলি না দিতেন, তবে সাহিত্যক্ষেত্রে তাঁহার স্থানই হইত না। কত নবীন লেখকের যে কবিতাপুঞ্জ চিরবিস্মৃতির নীরে নিমগ্ন হইতেছে, তাহার আর সংখ্যা করা যায় না। সর্ব্ব-সংহারক কালই তাহাদিগকে ধ্বংস করিয়া ফেলে। আবার সেই কাল আজিও কালিদাসাদিকে সঞ্জীবিত করিয়া রাখিয়াছে। কাহাকে কেহ ঠেলিয়া উঠাইতে পারে না। কবিবর হেমচন্দ্রের স্মৃতিচিহ্ন রক্ষা করিবার জন্য সে দিন বহু চেষ্টা হইয়া গিয়াছে, কিন্তু তাঁহার

কাব্যাবলি কি অক্ষয় স্মৃতিচিহ্ন নহে? সেই কাব্যাবলি মধ্যে যদি প্রকৃত কবিত্ব থাকে, কাল তাহা রক্ষা করিবে। যদি না থাকে, তবে প্রস্তরের স্মৃতিচিহ্নও তাঁহাকে কবি করিতে পারিবে না। বড় বড় কবিদিগের কাব্যের মধ্যে যে সকল অমূল্য রত্ন আছে, সেই সকল রত্নই তাঁহাদিগের অবিনশ্বর স্মৃতি। তাই কত দূরবর্ত্তী ভূতকালের ধ্বংসাবশেষ হইতে কাল সেই সকল কবিগণকে আজিও রক্ষা করিয়া আসিয়াছে। কবির সম্মান কি একজনে দেয়? যুগে যুগে তাঁহার গৌরব বৃদ্ধি হইতে থাকে। কুলেখক ও কুকবি-গণকে সাহিত্যক্ষেত্র হইতে তাড়াইবার জন্য এডিনবর্গ-বীক্ষণ যে সম্মার্জ্জনীর আবশ্যকতার উল্লেখ করিয়াছেন, তদপেক্ষা গুরুতর সম্মার্জ্জনী কালের হস্তে আছে। আমাদিগের এমন আশঙ্কা হয় না যে, কুলেখকগণ কখন জগতের প্রতিষ্ঠাভাজন হইবেন। সকল গ্রন্থের দোষগুণ গ্রন্থ পড়িবার পরেই তাহার ফলাফলে আপনি বাহির হইয়া পড়ে। এককালে বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসগুলির কতই সমাদর ছিল। তখন কেহ তাহাদের দোষ দেখিতে পান্ নাই। কিন্তু এক্ষণে সেই উপন্যাসাবলি-পাঠের ফলাফল দেখিয়া লোকে তাহাদের কতই দোষ বাহির করিতেছেন। দোষ বাহির করিবার সময় বলিতেছেন, সেই চিত্রাঙ্কনে যে সৃষ্টি-চাতুর্য্য প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা দুর্লভ; কিন্তু সে সকল কিসের সৃষ্টি? বিশ্বামিত্রের সৃষ্টির ন্যায় কতকগুলি বিলাতী হিন্দু নারীর অদ্ভুত সৃষ্টি। তাহাতে তাঁহার কি সৃষ্টি করিবার ক্ষমতা, কি লিপি-নৈপুণ্য, তাহা কেহ অস্বীকার করে না। আমরাও "কাব্য-সুন্দরী"তে সেই সৃষ্টি-চাতুর্য্য, সেই স্বভাব-চিত্রের বিলক্ষণ পরিচয় দিয়াছি। তা বলিয়া, আমরা সেই সৃষ্টি-চাতুর্য্যের এবং স্বভাব-

চিত্রের ভালমন্দের বিচার করি নাই। সেই ভালমন্দের বিচার এখন সেই কাব্যাবলির অধ্যয়নফলে প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছে। ভারতচন্দ্র "বিদ্যাসুন্দর"-রচনায় যে লিপিনৈপুণ্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা কে অস্বীকার করিবে? তা বলিয়া বিদ্যাসুন্দরের অধ্যয়নফল যে ভাল, একথা কেহ বলে না। সেই অধ্যয়নফলই শ্রীযুক্ত নবীন সেনের, রবীন্দ্রনাথের, গিরিশচন্দ্রের এবং হেমচন্দ্রের কাব্যাবলির গুণাগুণ কালক্রমে প্রকাশিত করিয়া দিবে। লোকে যদি এখন অন্ধ হইয়া থাকে, পরে সে অন্ধতা ঘুচিয়া যাইবে। এই অধ্যয়ন-ফলই ঠিক করিয়া দিবে, কাহারা কুলেখক, আর কাহারা প্রকৃত কবি।

জগতের সকল সুলেখকের সম্যক্ প্রতিষ্ঠা স্থাপন করা যখন দুঃসাধ্য, তখন কুলেখকের কথা উল্লেখযোগ্যই হয় না। মহাকবি মিল্টনও একদা দুঃখ করিয়া বলিয়া গিয়াছিলেন :—

"Fit read rs find, but few."

শেক্সপিয়ারের পূজা কত কাল পরে আরম্ভ হয়, তাহা ইংরাজী কৃতবিদ্যগণের অবিদিত নাই। বহু গুণাকর কবিগণের প্রতিষ্ঠা যখন জগতে সহজে স্থাপিত হয় না, তখন সামান্য লেখকের সমাদর হওয়া কেমন কঠিন, তাহা অনায়াসে অনুমিত হইতে পারে। কুলেখকগণের গৌরব কোন বিশেষ কারণ-বশতঃ কিছু দিনের জন্য ঘোষিত হইতে পারে বটে, কিন্তু সেই বিশেষ কারণ তিরোহিত হইলেই আর প্রতিষ্ঠা তিষ্ঠিতে পারে না।

অধ্যয়নফল-দ্বারা আমরা গ্রন্থের গুণাগুণ বিচার করিব বটে, কিন্তু আবার অধ্যয়নফলের গুণাগুণ কিরূপে নিরূপিত হইবে? কি কুগ্রন্থ, কি সুগ্রন্থ, উভয়েরই অধ্যয়ন-ফল থাকিতে পারে।

লেখার ও রচনার গুণে এবং উদ্দীপনার গুণে যে রসের সঞ্চার হইবে, সেই রসের রসিকমাত্রেই ত অধ্যয়নফল উৎপন্ন হইবে। শেক্সপিয়ারের 'ট্র্যাজিডি' সমুদায়ের কি উদ্দীপনা, রসের সঞ্চার এবং অধ্যয়নফল নাই, না বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসাবলির অধ্যয়নফল নাই? কথা এই, সেই অধ্যয়নফলের ভালমন্দের বিচার করে কে? এইখানেই সুরুচিসম্পন্ন সমালোচনার প্রয়োজন। সহৃদয়, সদ্ভাব এবং সুনীতিসম্পন্ন সমালোচনা এই অধ্যয়ন-ফলের তারতম্য তন্ন তন্ন করিয়া বুঝাইয়া না দিলে কুরুচিসম্পন্ন পাঠকের মন শীঘ্র ফিরিতে পারে না। সেরূপ সমালোচনা-অভাবে সে কার্য্য কালের হস্তে গিয়া পড়ে। পড়াতে ফল এই হয় যে, গ্রন্থের প্রকৃত গুণাগুণ বাহির করিতে অনেক বিলম্ব হয়। শ্রীযুক্ত বীরেশ্বর পাঁড়ে-প্রণীত "ঊনবিংশ শতাব্দীর মহাভারত" প্রকাশিত না হইলে শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র সেনের কাব্যাবলির প্রকৃত গুণাগুণ কি প্রকাশিত হইত না? হইত; তবে কাল-বিলম্বে। এজন্য এক্ষণে আমাদের ইংরাজী-শিক্ষিত সমাজের যে দিনকাল পড়িয়াছে, তাহাতে সুরুচি-সম্পন্ন সমালোচনার একান্ত আবশ্যকতা হইয়াছে। এক্ষণে আমা-দের তরুণবয়স্ক ইংরাজী কৃতবিদ্যগণের রুচি ও রসজ্ঞতা এমনই দূষিত হইয়া পড়িয়াছে যে, সেই দোষ ভাল করিয়া দেখাইয়া দেওয়া একান্ত আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে। নহিলে, অনেক অহিন্দু এবং সমাজবিপ্লবকারী কাব্যরসে মাতিয়া গিয়া তাঁহারা অনেক সামাজিক অমঙ্গলের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইতে পারেন। সুরুচিসম্পন্ন সমা-লোচকের হস্তে এক্ষণে এই গুরুভার ন্যস্ত হইয়া রহিয়াছে। সকলেই কি সমালোচন-কার্য্য সুসম্পন্ন করিতে পারেন? সমালোচন-কার্য্য বড়ই গুরুতর। যে সকল সমালোচক এইরূপ অধ্যয়নফল ধরিয়া

সমালোচনা না করেন, তাঁহাদের সমালোচন-কার্য্য সুনিয়মিত ও সুপরিচালিত হয় না। তজ্জন্ত তাঁহারা প্রায়ই বিপথগামী হইয়া পক্ষপাতী, না হয় একদেশদর্শী হইয়া পড়েন। কর্ণধার-বিরহে যেমন তরণী নদী-তরঙ্গে নানা দেশে বিতাড়িত ও বিক্ষিপ্ত হয়, তাঁহারাও তেমনি ইতস্ততঃ পরিচালিত হন। সুনীতি ও সুরুচি তাঁহাদিগকে চালিত করিতে পারে না। অনেক সমালোচক মনে করেন, আমরা নিরপেক্ষভাবে অতি বিচক্ষণতার সহিত সমালোচনা করিব। কিন্তু তাঁহাদের সেই নিরপেক্ষভাব কি ধরিয়া অবধারিত হইবে? যিনি কেবল গ্রন্থের অধ্যয়নফল ধরিয়া বিচার করিতে সমর্থ, তিনিই প্রকৃতপক্ষে নিরপেক্ষ হইতে পারেন। সেই অধ্যয়ন-ফলের প্রতি লক্ষ্য রাখিলেই সমালোচক কোন দিকে আর হেলিয়া পড়িবেন না। তথাপি কাব্যসমালোচনা কিরূপ দুরূহ কার্য্য, তাহা একবার ভাবিয়া দেখা উচিত।

সমালোচনা কিরূপ দুরূহ কার্য্য।

মানবের জীবন সুখদুঃখময়। এই জীবনের দিবাভাগ আছে;—সুখসূর্য্য উদিত হইলে মানব হাসিতে থাকে। জীবনের রজনীও আছে; কিন্তু সেই রজনীরও আবার জ্যোৎস্না আছে। মানব এই জ্যোৎস্নায় বসিয়া কবির সমুদায় আনন্দ ভোগ করেন। এক এক দিন এমন সময় উদিত হয়, যখন তাঁহার জীবন, মন ও হৃদয় কবিত্বে পরিপূর্ণ হয়। কবির ভাবপ্রবাহ ও কল্পনা তাঁহার মানসাকাশে ক্রীড়া করিতে থাকে। কে না এক এক দিন সন্ধ্যাকালে বৃক্ষমূলে বসিয়া কত সুবর্ণময় কল্পনারাজ্যে ভ্রমণ করিয়াছেন? তখন এই মর্ত্ত্যধাম পৃথিবী কত কল্পনায় পরিপূর্ণ

বোধ হয়, তখন ঐ সুবর্ণরঞ্জিত সন্ধ্যা-গগনকে স্বর্গরাজ্যের আভাস-মাত্র বোধ হইতে থাকে, তখন বিহঙ্গগণ মধুর রবে অন্তরে মধুরতর সুখের লহরী উৎপাদন করিয়া দেয়! সকলেরই জীবনে এক একবার এইরূপ বসন্তকালের উদয় হয়। তরুণ বয়সে যখন কল্পনা এইরূপ অম্বুরঞ্জিত হয়, যখন সকলেই একবার কবির ভাবে প্রকৃতিকে এবং নিজের জীবনকে অবলোকন করেন, তখন তাঁহাদের হৃদয়ের ভাবসমূহে কি কবিত্ব নাই? কবির হৃদয়ে এই ভাবের স্ফূর্ত্তি এক দিনে হয় না। কত চিন্তা, কত ভাব, কত কল্পনা, এক একবার একত্র দলে দলে হৃদয়-গগনকে আচ্ছন্ন করে। হৃদয় এক একবার ভাবে উছলিয়া পড়ে। কত সুবর্ণচিত্র দূর হইতে প্রলোভন দেখাইতে থাকে। কত চিত্রের উপর চিত্র, কত সুখস্বপ্ন হৃদয়ে নাচিতে থাকে। সে সকল কি ঠিক আঁকা যায়, না তাহাদিগের চঞ্চল ছায়া হৃদয়ে পতিত হয়? সে ছায়া কেমন মনোরম, সকলে ঠিক বুঝিতে পারে না। আঁকিতে গেলে তুলিকায় ঠিক তাহার বর্ণ আসে না। ভাব জড়িত হইয়া যায়; চিত্র বিচিত্র হইয়া পড়ে। চিত্র যতদূর আসে, তরুণ লেখক তাহাই কল্পনায় পূর্ণ করিয়া লন; ভাবেন, তাহাই অম্বুরূপ ছায়া। সমালোচক ইহার কি বুঝিবেন? তিনি সেই সমস্ত অম্বুছায়ার অম্বুরূপ চিত্র মনোমধ্যে কল্পনা করিতেই অসমর্থ। তাঁহার নিকট সকলই জড়িত এবং বিশৃঙ্খল বোধ হয়। তিনি সমুদায় চিত্র দোষপূর্ণ বলিয়া কলঙ্কিত করেন। তাঁহার এই গঞ্জনায় কত তরুণ কবি হৃদয়বেদনায় ব্যথিত হইয়া আর কল্পনা-পথে ভ্রমণ করিতে সাহসী হন না। সেরূপ ব্যথিত না হইলে তাহাদিগের তরুণকালের ভাবসমূহ ক্রমশঃ হয় ত বিস্তারিত হইত, হৃদয়ে

কবিত্বের স্ফূর্ত্তি হইত এবং তরুণ চিন্তা ও কল্পনা ক্রমশঃ পরিস্ফুটতা লাভ করিত। কিন্তু অনেকে হয় ত কঠিন সমালোচনার তীব্র বাক্যে এরূপ বিমর্দ্দিত হইয়া যান যে, আর কবিতার নামোল্লেখ করিতেও চাহেন না।

কবির হৃদয় কেমন কোমল পদার্থ, তাহা সমালোচকগণ বুঝেন না। না বুঝিয়া তাঁহারা অতি তীক্ষ্ণ বিষাক্ত বাণ বর্ষণ করেন। সেই বাণে কত সুকুমারহৃদয় তরুণ কবি চিরদিনের জন্য নিহত হইয়াছেন। এইরূপ বাণ 'কাউপারের' এবং 'কার্কহোয়াইটের' কোমল হৃদয়ে বর্ষিত হয়। বিশুদ্ধরুচি, ভাবপূর্ণ কাউপার সেই বাণের ব্যথায় পাগল হইয়া যান। কার্কহোয়াইটের হৃদয় এরূপ কোমল পদার্থ ছিল যে, সে হৃদয়-কুসুম বিকশিত-প্রায় হইতেছিল, এমন সময়ে এক প্রচ্ছন্ন দেশ হইতে বিদ্রূপ-বাণ তৎপ্রতি বর্ষিত হইল। কার্কহোয়াইট সেই যে ভগ্ন-হৃদয় এবং ভগ্নোদ্যম হইলেন, আর তিনি উঠিতে পারিলেন না। তাঁহার হৃদয়কমল কোরকেই ভগ্নবৃন্ত হইয়া পড়িয়া গেল। লর্ড বাইরণও যখন একখানি ক্ষুদ্র কাব্য লইয়া প্রকাশ্যে উদিত হন, তখন সমালোচকগণ অতি সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে বাইরণকেও চিনিতে পারেন নাই। না পারিয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিলেন। কিন্তু যে তেজ বাইরণের হৃদয়ে ছিল, তাহা সহসা নিবিবার নহে। বাইরণ উঠিলেন, উঠিয়া তীব্রতর বাণে সমালোচকগণকে পরাস্ত করিলেন। ইহার ফল এই দাঁড়াইল, বাইরণ মনুষ্যদ্বেষী হইলেন এবং তাঁহার উচ্চতর মানসিক শক্তিনিচয় এক তিক্ত রসে বিষাক্ত হইয়া গেল। কিন্তু অগ্নি কিছুতেই চাপা রহিল না।

সমালোচন-কার্য্য নিরপেক্ষ-ভাবে প্রচারিত হইলেও যে দোষ

ঘটিবার সম্ভাবনা, তাহাই উল্লেখ করিলাম। কিন্তু সমালোচনা নিরপেক্ষ-ভাবে সম্পন্ন হওয়া বড়ই সুকঠিন। সমালোচকগণ প্রায়ই পক্ষপাতী হইয়া পড়েন। পক্ষপাতী সমালোচনার যে কত দোষ, তাহা বর্ণনাতীত। যে সমস্ত উৎকৃষ্ট গুণে বিলাতী সমালোচকের ভূষিত হওয়া আবশ্যক, পোপ এবং এডিসন তাহা উল্লেখ করিয়াছেন *। কিন্তু কয়জন সমালোচককে সে সমস্ত গুণে ভূষিত দেখা যায়? সমালোচন-কার্য্য যেরূপ দুরূহ ব্যাপার, তাহা অনেকেরই জ্ঞান নাই, অথচ বলিতে গেলে, এমন লোক নাই, যিনি সমালোচনা করিতে সাহসী না হন। বড় বড় লেখকের উপর সকলেই এক একবার বিচারাসনে বসিয়া মনের অহঙ্কার পূর্ণ করিতে চান। বিদ্যা-বুদ্ধি যেমন তেমন হউক, সমালোচনস্থলে দুই এক কথা বলিতে কেহই সঙ্কুচিত হন না। কিন্তু সেই দুই এক কথায় যে কতদূর অপকার সাধিত হয়, তাহা তাঁহারা বুঝেন না।

শুদ্ধ তর্ক এবং বিচারপূর্ণ প্রস্তাবের সমালোচনা অনেক পণ্ডিতে সুসম্পন্ন করিতে পারেন। কিন্তু যে সমস্ত প্রস্তাবের বিচার সমালোচকের রুচি, কবিত্বানুভাবকতা এবং কল্পনাশক্তির উপর নির্ভর করে, তাহা পণ্ডিত কর্ত্তৃক সুসম্পন্ন হওয়া বড় সুকঠিন বিষয়। তর্ক এবং বিচারের সঙ্গতি ও অসঙ্গতি অনেক লোকেই বুদ্ধিবলে বুঝিতে পারেন। কিন্তু যাহার বিচারে বুদ্ধির কার্য্য অতি অল্প, তাহার বিচার করিতে সাধারণ লোকে সমর্থ নহেন। শেক্সপিয়ার এবং মিল্‌টনের কবিত্ব লোকে বহুকাল বুঝিতে পারেন নাই বলিয়া তাঁহারা বহুকাল অনাদৃত হইয়াছিলেন। কোন নবীন লেখকের

* Vide Spectator No. 291 and Pope's Essay on Criticism.

রচনা অথবা প্রস্তাব প্রথম প্রকাশিত হইলে অনেকেই তাহা অবজ্ঞা করিয়া উড়াইয়া দেন। লোকের সেই অবজ্ঞাভাবের মধ্যে যত-প্রকার প্রচ্ছন্ন ভাব থাকে, তাহার সকল প্রকাশিত হইলে সেই অবজ্ঞাকারীদিগের উপরেই অবজ্ঞা জন্মে। যাঁহারা সুখ্যাতি করেন, তাঁহাদিগের মধ্যেও অনেক অসার লোক থাকেন। কেহ কেহ অখ্যাতি করা ভাল দেখায় না বলিয়া সুখ্যাতি করেন, কেহ কেহ বা অখ্যাতি করিবার বিচারশক্তি নাই বলিয়া অথবা অপর কোন গুহ্য কারণ বশতঃ সুখ্যাতি করেন। অনেকে বিদ্বেষী হইয়া হয় ত নিন্দা করেন। সমালোচনার কার্য্য এইরূপই প্রায় সর্ব্বত্র সম্পন্ন হয়। গিবন তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ ইতিহাস লিখিয়া পাঁচ জন বন্ধু বান্ধবকে দেখাইলে সকলেই তদীয় গ্রন্থ সম্বন্ধে দুই চারি কথা বলিয়াছিলেন। গিবন বলেন, লোকের এই সমস্ত উক্তি শুনিয়া আমি মনে মনে না হাসিয়া থাকিতে পারিতাম না। "অনেকে আমার খাতিরে প্রশংসা করিতেন, অনেকে অহঙ্কারে পূর্ণ হইয়া বিস্তর দোষ বাহির করিতেন।" কবি টম্‌সনের বন্ধুগণও তাঁহার তরুণ বয়সের কবিতাবলির মধ্যে দোষ ভিন্ন আর কিছুই দেখেন নাই, অথচ এই কবিতাবলির মধ্যে তাঁহার উৎকৃষ্ট শীতঋতু-বর্ণনও পরিদৃষ্ট হয়। সমালোচকগণ যখন আবার কোন নূতন বিষয় অথবা নূতন প্রণালী দেখেন, তখন তাঁহারা বিচার-মূলীয় সাদৃশ্যের অভাবে অথবা কুসংস্কার-প্রভাবে এরূপ ধন্দিত হইয়া যান যে, তাঁহারা ঠিক বিচার করিতে না পারিয়া সেই নূতন বিষয় অথবা প্রণালীর উপর কেবল গালি বর্ষণ করেন। রেন্‌লডস্ যখন ইতালীয় চিত্র-প্রণালীতে ব্যুৎপন্ন হইয়া গৃহে প্রত্যাগত হইয়া সেই প্রণালীমত একখানি চিত্র আঁকিলেন, তাঁহার পূর্ব্ব শিক্ষক হড্‌সন্ সেই

চিত্রখানি দেখিয়া বলিলেন, "রেনল্ডস্, তুমি পূর্ব্বে যখন ইংলণ্ডে ছিলে, তখন ত এতদপেক্ষা ভালরূপে চিত্রিত করিতে পারিতে!" আর একজন চিত্রকর যিনি নেলারের চিত্রকে সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট চিত্র বলিয়া জ্ঞান করিতেন, তিনি ঐ ইংলণ্ডের র‍্যাফেল্‌কে নিতান্ত অবজ্ঞাবাক্য উক্তি করিয়াছিলেন। বেকনের দার্শনিক প্রস্তাব সকল বহুদিন লোকে বুঝিতে পারে নাই। তদীয় জীবিতকালে তদ্বিরচিত ইতিহাস এবং তাঁহার নানাবিষয়ক প্রবন্ধগুলিরই সমাদর হইয়াছিল। ধূমকেতুসম্বন্ধে কেপ্‌লার যখন তাঁহার প্রস্তাবসকল প্রথম প্রচারিত করেন, পণ্ডিতেরা তাঁহাকে গাঁজাখোর বলিয়া উপহাস করিয়াছিলেন। কোপার্নিকস, পণ্ডিতের এই প্রকার বিদ্রূপভয়ে, আপনার গ্রন্থাবলি প্রায় ত্রিশ বৎসর ধরিয়া গোপনে রাখিয়াছিলেন, কোন মতে প্রচার করিতে সাহসী হন নাই। অধ্যাপক সিজেস্‌বেকের বিদ্রূপে লিনিয়স্ একদা উদ্ভিদ্‌বিদ্যার শাস্ত্রালোচনা পরিত্যাগ করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। চিকিৎসাবিদ্যার পরমোন্নতিসাধক সুবিখ্যাত সিডিন্‌হাম্ কলেজে অধ্যাপকের পদ হইতে বহিষ্কৃত হন*।

ইতিহাসের সমালোচনা যে নিরপেক্ষ ভাবে সম্পন্ন হওয়া একেবারে অসম্ভব, একথা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। আজ পর্য্যন্ত নিরপেক্ষ ঐতিহাসিক প্রস্তাব পরিদৃষ্ট হয় নাই। হ্যালাম্, তোমারও লেখনীতে কলঙ্ক স্পর্শিয়াছে!

অনেক সমালোচককে নিতান্ত উপহাসপ্রিয় বলিয়া অনুমান হয়। তাঁহারা বোধ করি মনে করেন, হাস্য ও বিদ্রূপ না করিতে

---

* For more instances, see Disraeli's Literary Character, chapters vi and vii.

পারিলে সমালোচনকার্য্য সুসম্পন্ন হয় না। উপহাস-প্রিয়তা বিচারকের একটি দোষ বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে, কিন্তু সাহিত্য-সংসারে সে নিয়ম খাটে না কেন, তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। যিনি নিতান্ত উপহাসপ্রিয়, তিনি সকল প্রকার প্রসঙ্গ লইয়াই রহস্য করিয়া বসেন। অতি গম্ভীর প্রসঙ্গ হইতেও তিনি উপহাসের বিষয় খুঁজিয়া বাহির করেন, এবং যে স্থলে কোন দোষ নাই, সে স্থলও উপহাসগুণে দোষ বলিয়া লোকের নিকট প্রতীয়মান করেন। এরূপ আমোদ নিতান্ত দোষার্হ বলিতে হইবে। সমালোচকের এরূপ দোষ থাকা নিতান্ত নিন্দনীয়। এ প্রকার সমালোচকেরা সর্ব্ববিধ গ্রন্থকারেরই মাথা খাইয়া বেড়ান। আজি-কালি বঙ্গদেশে এরূপ সমালোচকের অভাব নাই। আশ্চর্য্য এই, রঙ্গপ্রিয় পাঠকগণ ইহাঁদিগেরই স্পর্দ্ধা বাড়াইয়া দিতেছেন।

এক্ষণে বোধ হয় প্রতিপন্ন হইয়াছে যে, প্রতিভার পথ-প্রদর্শন-কার্য্যে এবং গ্রন্থের বিচার-কার্য্যে সমালোচনা কত অশুভ ফল সমুৎপাদন করিয়াছে। নবীন লেখকের উৎসাহ ভঙ্গ করিয়া ইহা সাহিত্য-সংসারে বিলক্ষণ ক্ষতি করিতেছে। এমন কি, সমালোচনা যে কাব্যের প্রশংসা করে, তাহারও সৌন্দর্য্যের হ্রাস হয়। সে কাব্যের সৌন্দর্য্যের নবীনত্ব যায়। পাঠক পড়িতে পড়িতে কেবল সমালোচন-প্রদর্শিত সৌন্দর্য্য মাত্র উপলব্ধি করেন। সে সৌন্দর্য্যও একজন দেখাইয়া দিয়াছেন বলিয়া তাহার উপলব্ধিতে তত আনন্দ বোধ হয় না। সে সৌন্দর্য্য আর নূতন বোধ হয় না; কবিত্বও পুরাতন বোধ হইলে তাহার আদর কমে। অন্যবিধ নূতন সৌন্দর্য্য বাহির করা দুষ্কর হয়। কারণ, সে কাব্যকে অন্য আলোকে আর দেখিতে পারা যায় না। দেখিতে গেলেই সেই সমালোচনপ্রোক্ত

পুরাতন ভাব মনে আইসে। এই প্রশংসাবাদ আবার অধিকতর হইলে লোকের মনে বিপরীত ফল হয়। লোকে ততদূর প্রশংসা সহিতে পারে না। সুতরাং খুঁজিয়া খুঁজিয়া কাব্যের ছিদ্র অন্বেষণ করিতে যায়। উহার ফল এই দাঁড়ায়, প্রশংসা করিয়া যাহার আদর বৃদ্ধি করিতে পারা যায়, তাহার ক্রমশঃ পাকচক্রে অনাদর ঘটিয়া উঠে। এই প্রকারে অনেক অনেক উৎকৃষ্ট কবিও হতাদর হইয়া পড়েন। তাঁহাদিগের প্রতি লোকের ভক্তি কমিয়া যায়। কিন্তু যে সকল মহাকবির আজিও সমালোচনা লিখিত হয় নাই, তাঁহাদিগের প্রতি মানবের ভক্তি চিরকাল অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। তাঁহারা আজিও সকলের মনে সমান পূজ্য হইয়া রহিয়াছেন। বাল্মীকি ও কৃষ্ণদ্বৈপায়নের এই ভাগ্য। যে কাল হইতে আধুনিক সমালোচনা তাঁহাদিগকে স্পর্শ করিবে, সেই কাল হইতে তাঁহারা মানবের বিচারস্থানীয় হইবেন। এক্ষণে তাঁহারা মানবের ভক্তিভাজন হইয়া রহিয়াছেন। বিচারস্থানীয় হইলেই তাঁহাদিগের দোষ-গুণ লইয়া নানা অখ্যাতি ও সুখ্যাতি প্রচারিত হইবে। তখন মানব আর তাঁহাদিগকে ভক্তি করিবেন না, তাঁহাদিগের বিচারক হইয়া দাঁড়াইবেন। কতকগুলি লোক তাঁহাদিগের পক্ষপাতী হইবেন, আর কতকগুলি তাঁহাদিগের বিপক্ষে দাঁড়াইবেন। বিচারকের পদে অভিষিক্ত হইয়া এক্ষণে মানবকুল অনেক সাহিত্যসুখ বিনষ্ট করিয়াছেন। প্রাচীন কালের মত গ্রন্থকারগণও এখন আর হৃদয় খুলিয়া অবারিতভাবে লিখিতে পারেন না; এখন তাঁহাদিগের লেখনী কাঁপিতে থাকে, তাঁহারা একবার লিখিয়া সাতবার বিচার করিয়া দেখেন। এই বিচারে অনেক সরল ভাব ও সৌন্দর্য্য বিনাশ প্রাপ্ত হয়। ভয়ে হৃদয়ের

এখন সম্পূর্ণ স্ফূর্ত্তি হয় না। সুতরাং তাহার ফলস্বরূপ গ্রন্থসকলও এখন তত উৎকৃষ্ট হইয়া উঠে না। কিন্তু প্রাচীনকালে যখন ঋষিগণের মনে এরূপ ভয়ের কিছুই ছিল না, তখন তাঁহারা কেমন সরল অন্তরে হৃদয় খুলিয়া সুস্বর সঙ্গীতে গান গাহিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা জানিতেন, আমাদিগের এই গান সকলেই ভক্তিসহকারে শুনিবেন। যাহাতে সকলের মনে ভক্তির উদয় হয়, তখন তাঁহারা এরূপ প্রগাঢ়ভাবে সঙ্গীতের রচনা করিতেন। তাঁহারা জানিতেন, আমরা পৃথিবীর উপদেশক ও গুরু; পৃথিবীর বিচারপ্রার্থী, বাদী বা প্রতিবাদী নহি। তাঁহারা জানিতেন, আমাদিগের পক্ষসমর্থনার্থ কোন সমালোচকের আবশ্যকতা হইবে না। আমাদিগের বাক্য আপনার গুণ আপনি গাহিবে। ব্যাস ভাবিতেন, আমি বাল্মীকির মত কিরূপে লোকের ভক্তিভাজন হইব। লোকের মনে ভক্তি সঞ্চারের জন্য তাঁহারা ব্যগ্র হইতেন। এখন ইচ্ছা হয়, আবার সেই কাল আইসে, যখন আমরা কৃতাঞ্জলিপুটে ভক্তি-সহকারে বটবৃক্ষমূলে কোন বাল্মীকির গান শুনিতে বসি; গান শুনিয়া মোহিত হই; এবং মোহিত হইয়া তাঁহাকে পূজা করিতে করিতে উঠিয়া আসি। রামচন্দ্র এইরূপে কত বৎসর বনবাসের দুঃখ হরণ করিয়াছিলেন। তাঁহার বনবাসও স্বর্গতুল্য বোধ হইয়াছিল। তিনি প্রত্যহ ঋষিগণের সহবাসে যে আনন্দ ভোগ করিতেন, অযোধ্যার স্বর্ণ-সিংহাসনেও তৎপরে সেরূপ সুখ আর ভোগ করিতে পারেন নাই।

সমালোচনা ও প্রতিভা।

সমালোচনায় যে প্রতিভার উদ্রেক হয় না, তাহার প্রমাণ ও

পড়িয়াই রহিয়াছে। পূর্ব্বকালে যখন কবিকুল-চূড়ামণিগণ উদিত হইয়াছিলেন, তখন সমালোচনা কোথায় ছিল? বাল্মীকি ও ব্যাসের পূর্ব্বে অলঙ্কারশাস্ত্রের বিদ্যমানতা সপ্রমাণ হয় না। কবিগণ প্রতিভা-প্রভাবে যে সমস্ত সুশোভন সৃষ্টিকাণ্ড এবং সুদৃশ্যনিচয় রচনা করিয়া গিয়াছেন, সমালোচকগণ কি তাহার কিছু সহায়তা করিয়াছিলেন? কবিগণ কেবল প্রতিভার যাদুবলে মুহূর্ত্ত-মধ্যে আলাদিনের রাজপ্রাসাদ-সকল সৃজন করিয়াছেন—যাহার সুন্দর সৃষ্টি-কৌশল আজিও বিদ্যমান রহিয়াছে, আজিও তাঁহাদিগের আশ্চর্য্য সৃষ্টি-শক্তির পরিচয় দিতেছে। আরিষ্টটেল্, আরিষ্টার্কাস্ এবং লঞ্জাইনসের বহুকাল পূর্ব্বে গ্রীসের উৎকৃষ্ট কবিগণ Rhapsodists দেশে দেশে গান গাহিয়া বেড়াইতেন। তাঁহারা সমালোচনার ধার ধারিতেন না, সমালোচনার তীক্ষ্ণ-দৃষ্টির ভয় রাখিতেন না, এবং আলঙ্কারিকগণের সাধুবাদেরও প্রত্যাশা করিতেন না। তাঁহারা যেখানে যাইতেন, প্রকৃতির সৌন্দর্য্যে এবং গাম্ভীর্য্যে মোহিত হইয়া সঙ্গীত-ধ্বনিতে জগৎ পূর্ণ করিতেন। ধীর মহীধরের প্রকাণ্ডতায় তাঁহারা প্রকৃতির বল ও গাম্ভীর্য্য দেখিতেন, গগনের প্রসারে প্রকৃতির বিস্তীর্ণতা দেখিতেন, স্থির জলাশয়ের মধ্যে তরুলতার সৌন্দর্য্য দেখিতেন, এবং মেঘমালার সুবর্ণ-ছবিতে প্রকৃতির রমণীয়তা অনুভব করিতেন। প্রকৃতির মহাকাব্য-গ্রন্থ তাঁহাদিগকে অলঙ্কারের নিয়মাবলি শিক্ষা দিয়াছেন। তাঁহারা প্রকৃতির বীণাধ্বনি শুনিয়া যে সুমধুর রবে গান গাহিয়া গিয়াছেন, তাহাতে চিরদিন জগৎ মোহিত হইয়া আছে। সেই প্রকৃতির বরপুত্রগণ যাহাদিগকে আপনাদিগের কবিতা শুনাইতেন, তাহারাই মোহিত হইত, মোহিত হইয়া ভাবিত, ইঁহারা দৈববলেই এমন

সুধাস্বরে গান গাহিতে পারেন। তাঁহারা যেখানে যাইতেন, সেইখানেই আনন্দধ্বনি ঢালিয়া দিতেন, সকলেই তাঁহাদিগের সমাদর করিত। তরুণ-বয়স্কেরা তাঁহাদিগের গান শুনিতে শুনিতে অশ্রুবর্ষণ করিত, বৃদ্ধগণ ক্ষণিকের জন্য বয়সের নির্ব্বীর্য্যতা পরিহার করিয়া যৌবনরাগে একবার উৎসাহিত হইতেন। সকলেই তাঁহাদিগের এই জন্য সম্মান করিত যে, তাঁহাদিগেরই মুখে বীর-গণের যশ, বীরের বীরত্ব প্রচার করিতে তাঁহারাই সমর্থ, তাঁহারাই সর্ব্বজাতির গৌরববৃদ্ধি করেন, ধর্ম্মের জয় ঘোষণা করেন, সাধুপথে মনকে আকর্ষণ করেন, সৎকীর্ত্তিকলাপ পৃথিবীময় প্রচার করেন, এবং পূর্ব্বকালের ইতিহাস ও জ্ঞান কেবল তাঁহারাই অবগত আছেন। যে ধনে তাঁহারা সম্পন্ন ছিলেন, গ্রন্থকোষে সে ধন রক্ষিত হয় নাই। সাধারণ জনগণের স্মৃতিমন্দিরে তাহা চিররক্ষিত হইত। লোকে অতি যত্নে তাহা দিবারাত্র রক্ষা করিত। কতকাল ধরিয়া এইরূপ পূর্ব্বকবিগণের ধন সম্পত্তি রক্ষিত হইয়াছিল। তাঁহারাও লোকের মুখে মুখে তাহা রক্ষা করিয়া সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। পুরুষানুক্রমে কতকাল ধরিয়া প্রাচীন কাব্য-নিচয় মুখে মুখে চলিয়া আসিয়াছে। কতকাল ধরিয়া তরুণবয়স্কেরা আশ্চর্য্য হইয়া পিতামহের কাছে তাহা শ্রবণ করিয়াছেন। প্রাচীনকালের এই মহার্ঘ কাব্যনিচয় কোন পূর্ব্বপদ্ধতিক্রমে রচিত হয় নাই। রামায়ণে, মহাভারতে, এবং ইলিয়দে যে বিচিত্র সৃষ্টিকৌশল, যে চমৎকার কল্পনা এবং যে মনোহর চিত্রাবলি পরিদৃষ্ট হয়, এক্ষণকার মার্জ্জিত-রুচি-সম্পন্ন এবং অলঙ্কার-পরিশুদ্ধ কাব্যাবলিতেও তাহা লক্ষিত হয় না। বাস্তবিক, এই প্রাচীন কাব্যনিচয়ের যাহা যাহা ধর্ম্ম বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে, তাহাই এক্ষণকার কাব্যশাস্ত্রের নিয়মরূপে

পরিগণিত হইয়াছে। পরবর্ত্তী সমালোচকগণ সেই নিয়মের অনুসরণ করিয়া অন্য কাব্যের পরীক্ষা করিতে যান। ইদানীন্তন কবিগণ সেই প্রাচীন কবিগণের অনুকরণ করিতে যান। প্রাচীন কবিগণ যে প্রকৃতির আদর্শ ধরিয়া নিজ নিজ কাব্যাবলি রচনা করিয়া গিয়াছেন, আশ্চর্য্য এই, ইদানীন্তন কবিগণ সেই প্রকৃতিকেও তুচ্ছ করিয়া প্রাচীন কাব্যসমূহের আদর্শে নিজ নিজ কাব্য লিখিয়া থাকেন। যেন একদিন প্রকৃতি ভ্রান্তিমূলক হইতে পারে, তথাপি এই প্রাচীন কাব্যসমূহ সেরূপ হইতে পারে না। এমন কি, তাঁহাদিগের দোষাবলিও গুণরূপে পরিগণিত হইয়াছে। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই, পূর্ব্বরচিত অলঙ্কার-শাস্ত্র কি এই প্রাচীন কবিগণের প্রতিভাকে উদ্রিক্ত করিয়া দিয়াছিল, না তাহা স্বতই বিস্ফুরিত হইয়াছে? প্রাচীন কবিগণের উৎকৃষ্ট প্রতিভা এবং চমৎকার কল্পনা যে স্বতই বিস্ফুরিত হইয়াছে, তাহার আর সন্দেহ নাই। স্বতই বিস্ফুরিত হইয়া তাহার যে ফল ফলিয়াছে, এই মার্জ্জিত আলঙ্কারিক সময়ের ফল, সেরূপ হইতে দেখা যায় না।

য়ুনানী দৃশ্যকাব্যও স্বতই বিস্ফুরিত হইয়াছে। এস্কাইলস ইউরিপাইডিস, সফোক্লিশ প্রভৃতি গ্রীশের উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট নাটককারগণ সকলেই এরিষ্টটলের পূর্ব্বে উদয় হইয়াছিলেন। ইংরাজী সাহিত্যেও এইরূপ ঘটিয়াছিল। ডেনিস, রাইমর, জনসন প্রভৃতি সমালোচকগণের বহুকাল পূর্ব্বে শেক্সপিয়ারের দৃশ্যকাব্য-সমুদায় বিরচিত হয়। এরিষ্টটেল প্রভৃতি সমালোচকগণের গ্রন্থাবলি তিনি যে কখন অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, এমন প্রতীত হয় না। যদি অধ্যয়ন করিয়া থাকেন, তবে যে তাঁহাদিগের গ্রন্থনির্দ্দিষ্ট কোন নিয়মের বশীভূত

না হইয়া নিজ কাব্যাবলি রচনা করিয়াছিলেন, ইহা আশ্চর্য্য বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। তাঁহার পূর্ব্বে কুইণ্টিলিয়ন্ ও হোরেস্, লঞ্জাইনস্ ও এরিষ্টটেলের থাকা আর না থাকা, সমান হইয়াছিল। তাঁহাদিগের গ্রন্থাবলি যদি তিনি পড়িয়া থাকেন, সে অধ্যয়নে কোন ফল দর্শে নাই। তিনি আপনার জন্য এক নূতন পথ আবিষ্কার করিয়া লইয়াছিলেন। অলঙ্কার-শাস্ত্র তদীয় প্রতিভার বিস্ফুরণ পক্ষে কিছুই সহায়তা করে নাই। যদি তাঁহার প্রতিভার বিস্ফুরণ পক্ষে কেহ কিছু সহায়তা করিয়া থাকে, তবে মার্লো প্রভৃতি তদীয় পূর্ব্বনাটককারগণ একদিন সে সম্মান পাইলেও পাইতে পারেন। কিন্তু অলঙ্কার-শাস্ত্রে ও সমালোচনায় যে তাঁহার প্রতিভার কিছুই স্ফূর্ত্তি হয় নাই, তাহাতে আর অণুমাত্র সন্দেহ নাই। যুনানী বিয়োগান্ত-নাটককারগণ এবং শেক্সপিয়ার যে সমস্ত চিত্র আঁকিয়া গিয়াছেন, কোন সমালোচক তাহার বাহ্য রেখা পূর্ব্বে অঙ্কিত করেন নাই। এই সমস্ত চিত্র এবং তাঁহাদিগের পারিপার্শ্বিক দৃশ্যাবলি সেই নাটককারগণের ভাবময়ী সৃষ্টি। তাঁহারা এই সকল সৃষ্টিকাণ্ড রাখিয়া গেলে পরে সমালোচক তাঁহাদিগের কৌশল এবং গুণাগুণ পর্য্যালোচনা করিতে লাগিলেন।

তবেই সমালোচনা-দ্বারা প্রতিভার স্ফূর্ত্তি হওয়া দূরে থাক, তদ্দ্বারা প্রতিভা মার্জ্জিত এবং সৎপথে নিয়োজিতও হয় না। কারণ, প্রতিভা চিরকাল নিজ পথ নিজেই আবিষ্কার করিয়া কত শত সুবর্ণময় প্রদেশ লোক-লোচনের সমক্ষে ধারণ করিয়াছে। যে নিয়মে এবং যে পথে প্রতিভা চলে, তাহা অন্য কেহ নির্দ্দেশ করিয়া দিতে পারে না। কবির হৃদয়ে যে সৌন্দর্য্যের বীজ রোপিত আছে, তাহা সময়ক্রমে নিজেই কুসুমিত হইয়া পড়ে। অগ্নি হইতে

ধূম যেমন সহস্র তরঙ্গরঙ্গে সুন্দরভাবে উত্থিত হয়, প্রকৃত কবি-কল্পনার অসংখ্য ভাবসমূহ এবং সৃষ্টিকাণ্ড সেইরূপ মোহনীয় বেশে স্বতই উদিত হইয়া থাকে। কবি যাহা দেখেন, সমালোচকের সাধ্য কি যে, তাহা অনুমান করিয়া আনেন? কবি যে কল্পনাবলে স্বর্গের উপর স্বর্গ সৃষ্টি করেন, সমালোচকের সামান্য কল্পনায় তাহার কি পরিমাণ হয়? সমালোচক সে দৃষ্টি কোথায় পাইবেন, যে দৃষ্টি-প্রভাবে কবি মানব-প্রকৃতির অতি গূঢ়তম বিষয়-সকল আলোকিত করিয়া দেন, যে দৃষ্টি স্বর্গের দিকে উত্থিত হইয়া ইন্দ্রধনুর রঞ্জিত বর্ণে এবং মেঘমালার সুন্দর আকারে স্থাপিত হয়, যে দৃষ্টি-প্রভাবে কবি এমন কত শত আশারঞ্জিত সুবর্ণময় দেশ, কত নূতন নূতন জগৎ আবিষ্কার করেন,—ঐ তারামণ্ডিত গগনক্ষেত্র যাহা মানব-চক্ষু হইতে আচ্ছাদিত করিয়া রাখিয়াছে? কবির কল্পনা-দর্পণে যে সমস্ত নিত্য এবং চিরস্থায়ী রাজ্যের ছায়া আসিয়া পতিত হয়, সমালোচক কি তাহা দেখিতে পান? কবি যে সকল চিত্র অঙ্কিত করিয়া দেন, সমালোচক কেবল তাহারই সহিত অন্য চিত্রের তুলনা করিয়া দেখিতে পারেন মাত্র। বর্ত্তমান দেখিয়া সমালোচক ভবিষ্যৎ গণনা করিতে বসেন। কিন্তু প্রতিভা সে গণনায় আবদ্ধ থাকিবার নহে। সমালোচক যে ভবিষ্যৎ গণনা করিয়া দেন, প্রতিভা হয় ত সে দিক্ দিয়াও যান না। সমালোচক ইলিয়দ দেখিয়া বলিয়া দিলেন যে, ভবিষ্যৎ মহাকাব্য-সমুদায় ইলিয়দের নিয়মে প্রস্তুত হইলে সুন্দর হইবে। কিন্তু যে সমালোচক রামায়ণ ও মহাভারত দেখিয়াছেন, তিনি বলিবেন, ভারতের নিকট ইলিয়দ অতি সামান্য কাব্য; সকল মহাকাব্য রামায়ণ এবং মহাভারতের মত হওয়া আবশ্যক; নহিলে তাহা মহাকাব্য বলিয়া গণ্য হইবে

না। হোমর, ব্যাসের নিয়মে চলেন নাই। ইঁহারা স্বতন্ত্রভাবে স্বতন্ত্র দেশে বিভিন্ন পথে বিভিন্ন প্রকার সৃষ্টি-কৌশল প্রকাশ করিয়াছেন। ব্যাসের বর্ত্তমানে হোমরের ভবিষ্যৎ নিয়মিত হয় নাই। আবার হোমর যে নিয়মে চলিয়াছিলেন, য়ুনানী বিয়োগান্ত-নাটককারগণ সে নিয়মে দৃশ্যকাব্যসমূহ বিরচিত করেন নাই। তাঁহাদিগের কাব্যপ্রণালী বিভিন্ন নিয়মে চালিত হইয়াছিল। এরিষ্টটেল বলিয়া উঠিলেন, সকল বিয়োগান্ত কাব্য সফোক্লিশের ছাঁচে প্রস্তুত হইলে তবে সুন্দর হইবে। তিনি অনুমান করিতে পারেন নাই, শেক্সপিয়ার এবং কাল্‌দেরণ যে প্রণালীতে নাটক লিখিবেন, তাহাও সুন্দর হইবে। সফোক্লিশের বর্ত্তমানে কাল্‌-দেরণের ভবিষ্যৎ অনুমিত হয় নাই। এরিষ্টটেলের সৃষ্টি সফোক্লিশের নিয়মের বহির্ভূত হইতে পারে নাই। কিন্তু লোপডিভেগা এবং কাল্‌দেরণ, সফোক্লিশের নিয়মে প্রচলিত হন নাই। তাঁহাদিগের প্রতিভা এক এক স্বতন্ত্র পথ আবিষ্কার করিয়াছিল। কিছুকাল পূর্ব্বে ইংলণ্ডের সকল সমালোচনপত্রে এই নিয়ম স্থিরীকৃত হয় যে, ইতিহাস কখন উপন্যাসের সহিত মিশিতে পারে না। ইতিহাস এবং উপন্যাস, ইহারা স্বতন্ত্র পথে চলিবে। কিন্তু স্কট্‌ যখন ওয়েভার্লীর একখানি সরল উপন্যাস সুন্দরভাবে বর্ণিত করিলেন, তখন সমা-লোচকের নিয়ম চিরদিনের জন্য একেবারে বিভিন্ন হইল। স্কট্‌ অনায়াসে উপন্যাসের সহিত ইতিহাসের বিবাহ দিলেন। সমা-লোচকগণ আশ্চর্য্য হইয়া স্কটের প্রতিভার প্রশংসা করিতে লাগি-লেন। তদবধি সহস্র সহস্র উপন্যাস ওয়েভার্লীর ছাঁচে প্রস্তুত হইতে লাগিল। সমালোচক কি অনুমান করিতে পারিয়াছিলেন, স্কটের প্রতিভা কোন্‌ পথে চলিবে? স্কট্‌ একদিন জেমস্‌কে

(স্কটের গ্রন্থ প্রকাশক) জিজ্ঞাসা করিলেন, "জেমস্, আমার 'লর্ড অব্ দি আইলসে'র বিষয় লোকে কি বলে?" জেমস্ কথা কহিলেন না। স্কট্ আবার বলিলেন, "কেন জেমস্, আজ তুমি নীরব হইয়া রহিয়াছ? বল লোকে কি বলে, আমার কাছে তোমার গোপন কি? অথবা আমি বুঝিতে পারিতেছি, কিরূপ হইয়াছে; আচ্ছা, তার জন্য ভাবনা কি? তুমি কি মনে করিয়াছ, আমি সব ছাড়িয়া দিব? এ পথে সুবিধা হইল না, আমি আর এক নূতন পথ বাহির করিব।" স্কট্ যে নূতন পথ কল্পনা-চক্ষে বাহির করিলেন, তাহা যাদুবিৎ টমাস্ দি রাইমার এবং মাইকেল স্কট্ও যাদুবলে অনুমান করিতে সমর্থ হন নাই।

প্রতিভাসম্পন্ন লোক যাহা রচনা করেন, তদ্দ্বারা সাহিত্যে অনেক সৃষ্টি সম্ভূত হয়। সেই সৃষ্টিদ্বারা সমালোচকগণ পরিচালিত হন এবং সেই সৃষ্টির রস সমাজকে আর্দ্র করিয়া ফেলে। তদ্দ্বারা সমাজে যে ফল উৎপন্ন হয়, তাহাই সমাজকে কিয়ৎপরিমাণে সংগঠিত করে। কি ইতিহাস, কি কাব্য, কি চিন্তাপূর্ণ প্রবন্ধ, কি দর্শন, কি বিজ্ঞান, তাঁহারা যে বিষয় গ্রহণ করেন, সেই বিষয়েই তাঁহাদের হৃদয়াবেগ, ভাবরাশি, চিন্তা ও মানসিক সৃষ্টি এক এক নবপ্রণালী-ক্রমে প্রবাহিত হয়। ভগবান্ কপিলের সৃষ্টি, পতঞ্জলি-দেবের সৃষ্টির সহিত সমান নহে, অথচ দুইজনেই সাংখ্যমত প্রচার করিয়া গিয়াছেন। তদ্রূপ নানাবিধ বেদশাখা-সৃষ্টির প্রভিন্নতা। তদ্রূপ কণাদ অক্ষপাদের সহিত, শঙ্কর পূর্ণপ্রজ্ঞের সহিত, গিবন্ মেকলের সহিত, ব্যাস বাল্মীকির সহিত, কালিদাস ভবভূতির সহিত, বিভিন্ন হইয়া গিয়াছেন। কিন্তু সকলেই নূতন নূতন আদর্শের সৃষ্টি করিয়া নূতন পথ বাহির করিয়াছেন। তাই পৌরাণিক কাব্যসমূহে আমরা

বহুবিধ আদর্শের সৃষ্টি দেখিতে পাই। সেই সেই আদর্শ ও পথ ধরিয়াই তাঁহাদের বিচার সিদ্ধ হয়। যাঁহার গ্রন্থাধ্যয়নে বা শ্রবণে যেরূপ ফল উৎপন্ন হয়, যিনি সেই ফলদ্বারা লোকের হৃদয় যেরূপ অধিকার করিতে পারেন, সাহিত্য-সংসারে তাঁহার স্থান ও মর্য্যাদা তদ্রূপ। কালক্রমে আবার এই ফলাফলের ভালমন্দের বিচার সিদ্ধ হয়। আর্য্যসাহিত্যে ঠিক তাহাই হইয়াছিল। আর্য্যসমাজ আর্য্য-সাহিত্যের ফলাফলের সাক্ষী। ফলাফলের কিরূপ সাক্ষী, তাহা আমরা "কাব্যচিন্তা"র "কাব্য বঙ্গসমাজে"-নামক প্রবন্ধে প্রদর্শন করিয়াছি।

সমালোচনার আবশ্যকতা ও নীতি।

প্রাচীন ভারতে যখন অহিন্দু সংস্কার-সকল আর্য্যগণের মনে প্রবিষ্ট হয় নাই, যখন সকলেই হিন্দু রীতিনীতি, হিন্দু আচার-ব্যবহার বিলক্ষণ বুঝিতেন, যখন তদ্বিষয়ে কোন কুসংস্কার মনে উদয় হইবার সম্ভাবনা ছিল না, তখন আর্য্যসাহিত্যের সমালোচনার তত প্রয়োজন হয় নাই। সকলেই গ্রন্থের অধ্যয়নফল ও সামাজিক ফল ধরিয়া বিচার করিতে সক্ষম ছিলেন এবং সেই বিচারে সুকবি-গণকে চিনিয়া লইতে পারিতেন। কোন গ্রন্থ ভাল হইয়াছে কি মন্দ হইয়াছে, তাহার ফলশ্রুতি দ্বারা তাহা অবধারিত হইতে পারিত। কিন্তু এক্ষণে আর সে কাল নাই, এক্ষণে ইংরাজীবিদ্যা আমাদিগকে বিভিন্ন অবস্থায় নিপাতিত করিয়াছে। সেই অবস্থায় আমাদের পূর্ব্বসংস্কার-সমুদায় বিপর্য্যস্ত হইয়া যাইতেছে। এ সময়ে আমাদের সাহিত্যের সমালোচনা আবশ্যক হইয়াছে। এক্ষণে সে কার্য্যে কোন্ কর্ণধারের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে? সেই কর্ণধার

আর্য্য-সমালোচক। আর্য্য-সমালোচক কি নীতিদ্বারা চালিত হইয়া গ্রন্থের তাৎপর্য্য গ্রহণ করিতেন? সেই নীতি এইরূপ বিবৃত হইয়াছে:—

"উপক্রমোপসংহারাবভ্যাসোঽপূর্ব্বতা ফলম্।
অর্থবাদোপপত্তীচ লিঙ্গং তাৎপর্য্যনির্ণয়ে॥"

শ্রীজীবগোস্বামিনঃ পরমাত্মসন্দর্ভধৃত-বচনম্।

পরম ভক্ত জীবগোস্বামী শ্রীমদ্ভাগবত ও শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার তাৎপর্য্য নির্ণয়ে বৃত হইয়া চিরপ্রসিদ্ধ আর্য্যরীত্যনুযায়ী এই সকল লিঙ্গের অনুগামী হইয়াছিলেন।

প্রথমতঃ গ্রন্থের উপক্রম বা আরম্ভ কিরূপ হইয়াছে তাহা দেখিতে হইবে। এই উপক্রমেই গ্রন্থকার নিজ গ্রন্থের প্রয়োজন অতি সরলভাবে বিবৃত করিয়াছেন কি না, তাহা বিচার্য্য। কারণ, তাহাই গ্রন্থের মূল প্রতিপাদ্য। যেমন রামায়ণের প্রতিপাদ্য রামায়ণের প্রারম্ভেই নারদোক্তিতে বিবৃত হইয়াছে, মহাভারতেরও প্রতিপাদ্য গ্রন্থের প্রারম্ভেই বেদবাক্যে ব্যক্ত হইয়াছে, গীতার প্রতিপাদ্য প্রথমাধ্যায়ে অর্জ্জুনোক্তিতেই প্রকাশিত হইয়াছে, তদ্রূপ গ্রীক্ মহাকাব্যের প্রতিপাদ্য হোমর ইলিয়দের প্রারম্ভেই বলিয়াছেন। মিণ্টনের Paradise Lost এও তদ্রূপ।

দ্বিতীয়তঃ দেখিতে হইবে গ্রন্থের প্রারম্ভে যাহা লিখিত হইয়াছে, উপসংহারে সেই প্রতিপাদ্য ঠিক প্রতিপন্ন হইয়াছে কি না।

তৃতীয়তঃ গ্রন্থের তাৎপর্য্য নির্ণয় করিতে হইলে দেখিতে হইবে, গ্রন্থমধ্যে কোন্ কথা আগাগোড়া ও পুনঃ পুনঃ পর্য্যালোচিত

হইয়াছে। ইহাই গ্রন্থের অভ্যাস। গীতার নিষ্কামধর্ম্ম এইরূপ গ্রন্থমধ্যে পুনঃ পুনঃ উল্লিখিত ও আলোচিত হইয়াছে।

চতুর্থতঃ দেখিতে হইবে গ্রন্থের অপূর্ব্বতা বা Originality—গ্রন্থের বিষয়, রচনা-প্রণালী, ভাষা প্রভৃতি কতদূর অপূর্ব্ব। ভাষায়, রচনায় এবং বিষয়ের দোষগুণ এই অপূর্ব্বতা-পরীক্ষাস্থলে বিচার্য্য হইয়া পড়ে। যদি ভাষা, রচনা এবং বিষয় অপূর্ব্ব না হয়, তাহা হইলে ত সেরূপ গ্রন্থের প্রকাশ নিষ্প্রয়োজন। শ্রীরাধার বিরহ ত অনেক বৈষ্ণব কবি গাহিয়াছেন, কিন্তু মাইকেলের "ব্রজাঙ্গনার" বিরহ-গীতি কি অপূর্ব্ব নহে? তাহার রচনা, ভাষা, ভাব—সকলই নূতন ও অপূর্ব্ব।

পঞ্চমতঃ গ্রন্থের "ফলম্" বা ফলশ্রুতি বিশিষ্টরূপে বিচার করা উচিত। কারণ, এই ফলশ্রুতির উপরেই গ্রন্থের প্রয়োজনসিদ্ধি নির্ভর করিতেছে। গীতা পাঠ করিয়া যদি গীতার ফলশ্রুতি না জন্মিয়া থাকে, তবে গীতাপাঠ বৃথা, এবং গীতা-রচনাও বৃথা। আমরা কি দেখিতে পাই না, এই গীতাপাঠের ফলস্বরূপ কত লোক সন্ন্যাসধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছেন? সন্ন্যাসধর্ম্মের অর্থ বনবাস নহে। প্রকৃত সন্ন্যাস বিশুদ্ধ আন্তরিক ব্যাপার। তাহাই গীতাপাঠের ফল। গীতাপাঠের ফল কর্ম্ম-সন্ন্যাস ও জ্ঞান।

ষষ্ঠতঃ গ্রন্থের অর্থবাদ। গ্রন্থখানি কিরূপ অধিকারীর অর্থ-সাধক এবং বাস্তবিক সেইরূপ অধিকারীর উপযোগী হইয়াছে কি না, তাহা বিচার্য্য। সেই অর্থবাদ গ্রন্থমধ্যে ব্যক্ত থাকিলে, সেই গ্রন্থের বিচার সেই অধিকারীর উপযোগিতা ধরিয়াই সিদ্ধ করিতে হইবে। যাহা স্ত্রীজাতি বা অজ্ঞজনগণের জন্য লিখিত, তাহা তদ্রূপেই বিচার্য্য। যাহা জ্ঞানিগণের জন্য রচিত, তাহা জ্ঞানিগণের

পক্ষে কতদূর উপযোগী—তাহা যে সামান্য জনগণের জন্য বা বালকের জন্য নহে—তাহা বিশেষরূপে বিচার করা উচিত।

সপ্তমতঃ সেই অর্থবাদ-মত গ্রন্থের রসাদির সঞ্চার এবং পরিপুষ্টি সাধিত হইয়া যথারীতিক্রমে উপক্রম হইতে উপসংহারে গ্রন্থ উপনীত হইয়াছে কি না, তাহা দেখিতে হইবে। গ্রন্থখানি যদি দার্শনিক বা যুক্তিপূর্ণ প্রস্তাবে সংগঠিত হইয়া থাকে, তবে দেখিতে হইবে, সেই প্রমাণ ও যুক্তির কিরূপ বিবৃদ্ধি সাধিত হইয়া তাহার উপসংহার করা হইয়াছে। গ্রন্থের এই প্রকার যুক্তিযুক্ত বিকাশ, বিবৃদ্ধি ও পরিপুষ্টিই তাহার উপপত্তি। এই উপপত্তি গ্রন্থের প্রারম্ভ হইতে উপসংহার পর্য্যন্ত রচনার পরস্পর সম্বন্ধ রক্ষা করিয়া ক্রমে রসের ঘনতা সাধন করে। ঘনতা সাধন করিয়া যথানিয়মে উপসংহারে উপনীত করে। তদ্দারাই গ্রন্থের অধ্যয়ন-ফল উৎপাদিত হয়। সেই ফলানুসারেই গ্রন্থ বিচার্য্য। গ্রন্থ পাঠের বা শ্রবণের ফল যদি কিছুই না হয়, তবে তাহার উপপত্তির বিশিষ্ট দোষ ঘটিয়াছে বুঝিতে হইবে। কি দার্শনিক গ্রন্থ, কি কাব্যাদি, কি বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ, কি অপরবিধ বর্ণনা বা যুক্তিপূর্ণ প্রস্তাব, যাহাই হউক না কেন, গ্রন্থখানি সুরচিত হইলে, তাহার অধ্যয়নফল ও ফলশ্রুতি (impression) অবশ্যই উৎপাদিত হইবে। সেই ফলশ্রুতি বা অধ্যয়ন-ফলদ্বারা গ্রন্থের ভালমন্দের বিচার। যে গ্রন্থরচনার রীতিদ্বারা ফল উৎপন্ন হইয়াছে, সেই রীতিদ্বারা অপরাপর সদৃশ গ্রন্থের বিচার না করিলে, সমালোচনা কি পরীক্ষা অবলম্বন করিবে? সেই অধ্যয়ন-ফল বা ফলশ্রুতি ভাল হইলে গ্রন্থখানিকে ভাল বলিতে হইবে, মন্দ হইলে মন্দ বলিতে হইবে, আর যদি অধ্যয়ন-ফল কিছু না হয়, তবে সেই গ্রন্থ-রচনা কিছুই হয় নাই—তাহা পণ্ডশ্রমমাত্র।

তবেই দেখা যাইতেছে, আর্য্যদিগের গ্রন্থরচনায় একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল;—সেই উদ্দেশ্য ফলশ্রুতি বা অধ্যয়ন-ফল। কি উপক্রম-উপসংহার, কি অভ্যাস, কি অপূর্ব্বতা, কি অর্থবাদ, কি উপপত্তি—গ্রন্থের সর্ব্বাংশেরই লক্ষ্য এই ফলশ্রুতি। যদি গ্রন্থ-প্রতিপাদ্য ফল উৎপন্ন হয়, তবেই গ্রন্থরচনার সাফল্যলাভ হইয়াছে, নতুবা নহে। বাগ্মীরা যে বক্তৃতা দেন, তাহা কি উদ্দেশে? কথকেরা যে কথা কন, তাহার উদ্দেশ্য কি? সকলেরই উদ্দেশ্য, কোন বিশেষ ফল উৎপন্ন করিবার জন্য। গ্রন্থসম্বন্ধেও সেই কথা প্রযুক্ত হয়। গ্রন্থ পড়িলাম, অথচ পাঠের ফল কিছু হইল না; সে গ্রন্থকে কি বলিব? সুতরাং অধ্যয়ন বা শ্রবণ-ফলই গ্রন্থরচনার প্রধান লক্ষ্য। অতএব, এই লক্ষ্য ধরিয়াই সকল গ্রন্থ ও প্রস্তাব বিচার করা উচিত।

এই অধ্যয়ন বা শ্রবণ-ফল মন্দ বলিয়াই বিলাতী সাহিত্যের 'ট্র্যাজিডি' এবং আসুরিক লোকচরিত্রপূর্ণ ইতিহাস-রচনা আর্য্য-সাহিত্যে পরিত্যক্ত হইয়াছে। তাহা বলিয়া আমরা অপরবিধ ইতিহাস এবং মহাজনগণের জীবনচরিতের নিন্দা করিতে পারি না। সে সকল গ্রন্থ বিস্তর আবর্জ্জনাপূর্ণ হইলেও সুপাঠ্য এবং তাহাদের অধ্যয়ন-ফল মন্দ নহে। আর্য্যসাহিত্যেও মহাজনগণের এবং ঋষিচরিত্রের সংক্ষিপ্ত আখ্যায়িকা পাওয়া যায়। সেরূপ আখ্যায়িকা-পাঠের ফল বিস্তর ও বিশুদ্ধ। বিলাতী সাহিত্যের মান বিলাতী সমাজে থাকিতে পারে; কারণ, সে সমাজের রীতিনীতি ও ধর্ম্মাধর্ম্মের বিচার স্বতন্ত্র। আর্য্যসমাজে বিভিন্ন রীতিনীতি এবং বিভিন্ন ধর্ম্ম প্রচলিত। ধর্ম্মনীতিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নীতি এবং সমাজরক্ষিণী শক্তি। সমাজনীতি তাহারই অনুগামিনী।

"সমাজ-তত্ত্বে" আমরা একথা বুঝাইয়াছি। সেই নীতিদ্বয়ের বিরোধী যাহা, তাহাই সমাজ-বিপ্লবকারী ও অধর্ম্ম-সাধক। কি সাহিত্য, কি ইতিহাস, কি কাব্য, কি দর্শন—বিদ্যার সমস্ত অঙ্গই ধর্ম্মনীতি এবং সমাজনীতির অনুকূল হওয়া চাই। যাহা অনুকূল নহে, তাহা তদ্বিরোধী, এজন্য পরিত্যাজ্য। বিলাতী সাহিত্য ও ইতিহাস আর্য্যসমাজের সংঘর্ষে আসাতে তাহা এক্ষণে ভিন্ন কষ্টিতে পরীক্ষিত হইতেছে। সেই কষ্টি অধ্যয়নফল বা ফলশ্রুতি। শেক্‌সপিয়ার হউন, মিল্টন হউন, যিনিই হউন না কেন, যাঁহার কাব্যের ফলশ্রুতি হিন্দু সমাজনীতি এবং ধর্ম্মনীতির বিরোধিনী হইবে, তিনি প্রকৃত হিন্দুর নিকট (বিকৃতমস্তিষ্কের নিকট নহে) তদুপযুক্ত সমাদর লাভ করিবেন। আবার যে সকল বাঙ্গালা গ্রন্থ সেই ছাঁচে ঢালা হইয়া প্রকাশিত হইতেছে, তাহাদেরও ফলশ্রুতি অনুসারে গুণাগুণের বিচার। তাই আজ বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসাবলির আদর ক্রমেই কমিয়া আসিতেছে। ইংরাজী ছাঁচে ঢালা বাঙ্গলার অপরাপর উপন্যাস ও কাব্যাদির দশাও যে তদ্রূপ হইবে, তাহাতে আর অণুমাত্র সন্দেহ নাই।

আর্য্যসাহিত্যে সমালোচনা নাই কেন?

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, সংস্কৃত আর্য্যসাহিত্যে সমালোচন-সাহিত্য এক প্রকার নাই বলিলেই হয়। কেন নাই, তাহা বোধ হয় এক্ষণে বিলক্ষণ প্রতীত হইতেছে। অধ্যয়ন বা শ্রবণ-ফল ধরিয়া যে সাহিত্যের কাব্যাদি সকল-গ্রন্থের বিচার, সে সাহিত্যের সমালোচনা ত পড়িয়াই রহিয়াছে। গ্রন্থ-পরীক্ষার এমন সহজ নীতি আর দ্বিতীয় দৃষ্ট হয় না। এই নীতিদ্বারা একেবারেই গ্রন্থের

গুণাগুণ অবধারিত হয়। গ্রন্থ-অধ্যয়ন বা শ্রবণের সমষ্টি-ফল যাহা, তাহাই গ্রন্থের সম্যক্ সমালোচনা। তদ্দ্বারা গ্রন্থের ভাল-মন্দের বিচার স্বতই সম্পন্ন হইয়া যায় এবং জানা যায়—"যাহার ফলশ্রুতি বা অধ্যয়ন-ফল ভাল, তাহাই ভাল গ্রন্থ; যাহার অধ্যয়ন-ফল মন্দ, তাহা মন্দ গ্রন্থ; এবং যাহার অধ্যয়ন-ফল কিছুই নাই, তাহা গ্রন্থই নহে।" রস সর্ব্ববিধ গ্রন্থেরই আছে। সেই রসের পরিপুষ্টি-সাধন হইলেই ফলশ্রুতি ঘটে। সমালোচনার এই মূলনীতি ইউরোপীয় সাহিত্যসমাজে প্রচারিত না থাকাতে, সে সমাজের সাহিত্য-সমালোচনাও সুনিয়মিত হইতে পারে নাই। তজ্জন্যই সে সমাজে সমালোচনার এত ধুমধাম ও বাড়াবাড়ি। কিন্তু এই সহজ নীতি আর্য্যসমাজে প্রচলিত ছিল বলিয়া সংস্কৃত আর্য্য-সাহিত্যে আর স্বতন্ত্রাকারে সমালোচন-সাহিত্যের আবশ্যকতা হয় নাই।

গ্রন্থের উপক্রম ও উপসংহার।

বিভিন্ন-বিষয়ক দোষ।

আর্য্যসাহিত্যে গ্রন্থসমালোচনার প্রথম নীতি এই যে, গ্রন্থখানি পড়িয়া দেখিতে হইবে, তাহার প্রারম্ভ কিরূপ এবং সেই প্রারম্ভ হইতে ক্রমান্বয়ে গ্রন্থের উপসংহারে উপনীত হওয়া গিয়াছে কি না। যদি এরূপ না ঘটিয়া থাকে, তবে গ্রন্থখানি সুপ্রণালী-সিদ্ধ হয় নাই। সমুদায় অংশকে সুপ্রণালী-ক্রমে এক সঙ্গে গাঁথার নামই গ্রন্থ। সেই অংশ বা অধ্যায়গুলি যদি বিভিন্নবিষয়ক হয়, তবে একত্র সংবদ্ধ হইয়া কোন বিশেষ ফলের সমুৎপাদন করিবে কিরূপে? কিন্তু অনেক গ্রন্থে তাহাও ঘটিয়া থাকে। অনেক ঔপন্যাসিক কাব্যে দেখিতে পাওয়া যায় যে, গল্পবিশেষের সূত্রপাত করা হইল বটে, কিন্তু সেই গল্পের প্রবর্দ্ধনে আর একটি স্বতন্ত্র গল্প সংযোজিত করিয়া দেওয়া হইল। তজ্জন্য সেই দুই গল্পের সংমিশ্রণে বইখানি খুব মোটা হইল বটে, কিন্তু তাহাতে তদুভয় গল্পের স্বাতন্ত্র্যহেতু রসভঙ্গ হওয়াতে তেমন ফলোদয় হইল না। এরূপ স্থলে কোন্‌টি প্রকৃত উপক্রম, তাহা ঠিক্ করা দুষ্কর। কোন কোন বিলাতী ঔপন্যাসিক কাব্যের এই দোষ। আমাদের বাঙ্গালা ভাষায় এক্ষণে সেই বিলাতী-ছাঁচে-ঢালা ঔপন্যাসিক কাব্যের অনুকরণ হওয়াতে বাঙ্গালা-সাহিত্যে উক্ত দোষ প্রবিষ্ট হইয়াছে। নিজে বঙ্কিমচন্দ্রও এ দোষ হইতে মুক্ত হইতে পারেন নাই। এই দোষে তাঁহার

"চন্দ্রশেখর" এবং "দুর্গেশনন্দিনী" দুষ্ট। চন্দ্রশেখরে শৈবলিনী এবং দলনীর স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র উপন্যাস দেখা যায়। এ কথা আমরা "কাব্য-সুন্দরী"তে প্রদর্শন করিয়াছি। তদ্রূপ "দুর্গেশনন্দিনী"র গল্প কতকদূর অগ্রসর হইলে আয়েষার কথা উপস্থিত হইল। আয়েষা ও ওসমানের গল্পটি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র কথা; তাহা গ্রন্থের উপক্রম হইতে উঠে নাই। ঘটনাক্রমে উপনীত করিয়া তাহা গাঁথিয়া দেওয়া হইয়াছে মাত্র। সেইরূপ সূত্রবদ্ধ হইয়া তাহা এতদূর বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে যে, তাহা কেবল যে একটি স্বতন্ত্র উপকথা হইয়া দাঁড়াইয়াছে এমন নহে, প্রধান কথাও অপ্রধান হইয়া গিয়াছে। হেমচন্দ্রের "বৃত্র-সংহার" কাব্যও এই দোষে দূষিত।

হেমচন্দ্রের বৃত্রসংহার।

"বৃত্রসংহারে"র প্রধান বিষয় বৃত্রাসুর-বধ। কিন্তু তাহা কল্পনার দোষে অপ্রধান হইয়া পড়িয়াছে। এই কল্পনার বৈচিত্র্য-সাধন জন্য কবি শচীহরণের আখ্যায়িকা তন্মধ্যে সংযোজিত করিয়াছেন। সেই আখ্যায়িকাই কাব্যের প্রথম ভাগ জুড়িয়া আছে। দ্বিতীয় ভাগেও কবি শচীকে বিড়াল-নাড়ানাড়ি করিয়াছেন। দানবপতি নিজ পত্নী ঐন্দ্রিলার সাধও আবদার মিটাইতে বড়ই ব্যস্ত; এত ব্যস্ত যে, তাঁহার রাজদ্বারে যে সংগ্রাম ও ঘোর যুদ্ধ উপস্থিত, তাহা যেন কিছুই নহে। ঐন্দ্রিলাও নির্ভাবনায় আপনার আবদার ও আদর লইয়াই আছেন। সুতরাং কাব্য মধ্যে এই ঐন্দ্রিলা, ইন্দুবালা ও শচী-ঘটিত আখ্যায়িকায় যত রস সঞ্চারিত হইয়াছে। কবি একবার করিয়া এই উপকথা লেখেন, আর একবার করিয়া

যুদ্ধ বর্ণনা করেন। সে যুদ্ধও কোন ঘটনা দ্বারা বিচিত্রিত হয় নাই। ঘটনার মধ্যে একবার ইন্দ্রের কৈলাসে গমন, দধীচি মুনির সহিত তাঁহার আশ্রমে সাক্ষাৎ এবং বজ্র প্রস্তুত করিবার উপলক্ষে বিশ্বকর্ম্মার কর্ম্মশালা-দর্শন। সেই তিন উপলক্ষেই প্রধান কল্পনার রসভঙ্গ হইয়াছে। কি কৈলাস-দর্শন, কি মুনির আশ্রম-দর্শন, উভয়েই শান্তিরসের আবির্ভাবে বীররসের ভঙ্গ। এই সকল বর্ণনা এবং শচী-ঘটিত আখ্যায়িকা বর্ণনার গুণে বরং কাব্যখানি সুন্দর বর্ণনাকাব্য রূপে পরিণত হইয়াছে। তাহাতে প্রধান কল্পনার কোনরূপে প্রগাঢ়তা সাধন করিতে পারে নাই। সুতরাং তজ্জন্য কাব্যরস ঘনীভূত না হইয়া বরাবরই ভঙ্গ হইয়া গিয়াছে। এক একবার দেবদানবের যুদ্ধ যেন ঝড় বহিয়া যাইতেছে। কাব্য মধ্যে কোন রসেরই পরিপুষ্টি হয় নাই। বরং শচী-ঘটিত আখ্যায়িকাই পাঠকের মন কিয়ৎ পরিমাণে অধিকার করে। আর সেই বর্ণনাগুলিই কাব্যের ফলস্বরূপ হৃদয়ে থাকিয়া যায়।

খুন ও কামজ-প্রেম।

বিলাতী আদর্শের আর এক মহা দোষ এই যে, সেই ছাঁচের ঔপন্যাসিক কাব্যের উপক্রম যেমন তেমন হউক না কেন, তাহা পরিণামে হত্যাকাণ্ডে আসিয়া পর্য্যবসিত হয়। হত্যাকাণ্ড লোকসমাজে প্রায় গোপনে কৃত হয়, স্বচক্ষে কেহ দেখিতে পায় না। কিন্তু উপন্যাস-ক্ষেত্রে তাহা ঘটে না, সেখানে পাঠকের কল্পনা-সমক্ষেই হত্যাকাণ্ড ঘটিয়া থাকে। এরূপ বীভৎস ব্যাপার-দর্শনে যে দোষ, সেই দোষে এক্ষণে আমাদের বাঙ্গালা সাহিত্য

প্লাবিত হইয়াছে। হত্যাকাণ্ডে পর্য্যবসিত করিতে হইলে কল্পনাকে তদুপযোগিনী করিয়া সাজাইতে হয়। কল্পনাকে পাপের ঘোর রাগে এবং রিপুর ঘোর আবেগে ভয়ানক করিয়া তুলিতে হয়। সুতরাং সে কল্পনায় কেবল পাপের প্রাবল্যই প্রদর্শিত হইতে পারে। যদি কোনখানে কিছু পুণ্যের বা ধর্ম্মের আলোক থাকে, তাহা পাপের ঘোর ঘটায় ও কালিমায় আচ্ছন্ন হইয়া পড়ে। এরূপ গ্রন্থপাঠের কুফল কিরূপ, তাহা আমরা "সাহিত্য-চিন্তা"য় বিস্তারিত-রূপে প্রদর্শন করিয়াছি। এজন্য বাঙ্গালায় বিলাতী প্রেমঘটিত যত উপন্যাস রচিত হইয়াছে, তন্মধ্যে অনেক গ্রন্থেই দুইটি জিনিষ পরিদৃষ্ট হয়—একটি স্ত্রীপুরুষের কামজ-প্রেমজাত নেশা, অন্যটি খুন। নেশা নহিলে খুনে আসিয়া পর্য্যবসিত হইবে কেন? সুতরাং নেশায় যাহার উপক্রম, খুনে তাহার উপসংহার।

"সাহিত্য-চিন্তা"য় আমরা প্রদর্শন করিয়াছি যে, কামজ প্রেম হয় রূপজ, না হয় গুণজ। সে প্রেমের ক্ষেত্র বিলাতী সমাজ,—হিন্দুসমাজ নহে। হিন্দু পরিবার-ক্ষেত্রে স্ত্রীপুরুষের কামজ প্রেমের স্থান নাই। কারণ, হিন্দুর বিবাহ কামজ বিবাহ নহে। কামজ প্রেম বড়ই অস্থায়ী;—তাহা প্রেমই নহে। একমাত্র গান্ধর্ব্ববিবাহ কামজ; তাহা কেবল ক্ষত্রিয়রাজকুলেই প্রচলিত ছিল বটে, কিন্তু সচরাচর ঘটিত না, কচিৎ কখন ঘটিত। সাধারণজনগণ মধ্যে তাহা প্রচলিত ছিল না। আসুর এবং রাক্ষস বিবাহও তদ্রূপ। পৈশাচ বিবাহ ভদ্রসমাজের জন্য নহে। কিন্তু এ সকল বিবাহ যখন বঙ্গসমাজে প্রচলিত নাই, তখন তাহাদের কথা বঙ্গ-সাহিত্য-আলোচনায় আসিতে পারে না। বঙ্গদেশীয় সাধারণ জনগণ মধ্যে যে হিন্দু বিবাহ-রীতি প্রচলিত আছে, তাহাতে কি রূপজ, কি

গুণজ, কোন প্রকার কামেরই সম্পর্ক নাই। যেহেতু হিন্দুসমাজে প্রেমের পর বিবাহ নহে, বিবাহের পর প্রেম। এজন্য কামজ প্রেমের অধিকার হিন্দু পরিবারক্ষেত্রের বাহিরে। তাই, আমরা হিন্দু সমাজ মধ্যে যে কামজ প্রেমের পরিচয় পাই, তাহা অধিকাংশ পাপ-পথে ও পাপাচারে। হিন্দুর পবিত্র পারিবারিক ক্ষেত্রে কামজ প্রেমের পরিচয় ও অবসর নিতান্ত বিরল। কখন ঘটনা-ক্রমে কোন বৈধ বৈবাহিক দাম্পত্য মিলন কামজ প্রেমজাত হয়। সেরূপ মিলন সচরাচর দৃষ্ট হয় না।

হিন্দু সংসারে বিরল বটে, কিন্তু এখনকার বাঙ্গালা সাহিত্যে বিরল নহে। এখনকার বাঙ্গালা ঔপন্যাসিক কাব্য এই কামজ প্রেমের পাপচিত্রে প্লাবিত। এই কামজ প্রেম অনেক কাব্যেই রূপজ এবং চক্ষের নেশা। কচিৎ কোন কাব্যে তাহা গুণজ। শুধু যে রূপজ এমন নহে, সর্ব্বস্থানে না হউক, অনেক স্থলেই আবার তাহা কোন হিন্দু বালবিধবার সৌন্দর্য্যজাত। সেই হত-ভাগিনীকে কুপথে আনিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা। কারণ, একজন বালবিধবাকে কুপথগামিনী করা যত সহজ, সধবাকে কুপথে আনা তত সহজ নহে। সেইজন্য বাঙ্গালা অনেক উপন্যাসেই দেখা যায়, কোন সুন্দরী বালবিধবাই শিকারস্থানীয় হইয়াছে। সেই শিকার জন্যই উপন্যাসের ঘটনাজালের বিস্তার। যেখানে সে পাপচেষ্টা সফল হয়, সেখানেও খুন; যেখানে না হয়, সেখানেও খুন। কারণ, খুন না আনিলে, উপন্যাসের উপসংহার হইবে কিরূপে? বিলাতী আদর্শের কৃপায় গ্রন্থোপসংহার করিবার এমন সহজ উপায় আর নাই। হয় বিষপান, বা হয় ছুরিকাঘাত; হয় পিস্তল ছোঁড়া, না হয় জলে ঝাঁপ দেওয়া; হয় আত্মহত্যা, না হয়

অন্তবিধ খুনে প্রায়ই এরূপ পাপপূর্ণ কাব্য-নাটক পর্য্যবসিত হইয়া থাকে। এই দ্বিবিধ উপকরণের ওড়নপাড়নে আধুনিক বাঙ্গালা সাহিত্যের অনেক উপন্যাসই সংগঠিত হয়। যেমন রেণল্ডের এক-খানি উপন্যাস পড়িলে প্রায় তাঁহার সমুদায় উপন্যাস পড়া হয়, তেমনি আমাদের বাঙ্গালা সাহিত্যের আধুনিক একখানি বিলাতী প্রেম-ঘটিত উপন্যাস পড়িলে, সেই শ্রেণীর অনেক উপন্যাস পড়া হয়। সেই কামজ প্রেমে উপক্রম, আর খুনে উপসংহার। প্রভেদ কেবল, ঘটনা লইয়া। যে গ্রন্থকারের কল্পনাশক্তি যেমন তেজস্বিনী, তাহার ঘটনাযোজন তদ্রূপ হয়। কিন্তু এইরূপ পাপচিত্র উজ্জ্বলবর্ণে আঁকিয়া এক্ষণে আমরা দেখাইতেছি, বঙ্গ-সমাজে বালবিধবাগণের সতীত্ব-রক্ষা কিরূপ দুঃসাধ্য ব্যাপার। কিন্তু বাস্তবিকই কি তাই? হিন্দু সমাজে অবলাগণের জাতি-কুল-মান যেরূপ সুরক্ষিত হয়, বিলাতী সমাজে সেরূপ হয় না। এ কথা আমরা "সমাজতত্ত্বে" বিশিষ্টরূপে প্রদর্শন করিয়াছি। তাই হিন্দুসমাজে ভদ্রনারীগণের পদস্খলন অত্যন্ত বিরল; কচিৎ কখন দুই একটা ঘটিতে দেখা যায়। ঘটিলে লোকে তাহা চাপা দেয়, পাছে প্রকাশ হইয়া পড়ে। সমাজে বিরল বটে, কিন্তু আমাদের বাঙ্গালা-সাহিত্যে বিরল নহে। অনেক কাব্য-নাটকেই তাই; যেন আমরা দেখাইতে চাই, আমাদের সমাজ সেইরূপ পাপাচারে পরি-পূর্ণ। চাপা দেওয়া দূরে থাক্, কল্পনা করিয়া পাপ-কথা প্রচার করি। সুতরাং সমাজে এরূপ কুদৃষ্টান্ত বিরলপ্রচার হইলেও, বাঙ্গালা সাহিত্যে তাহার বহুল প্রচার হওয়াতে সেই কুদৃষ্টান্তের কুফল এক্ষণে সর্ব্বত্রই পরিদৃষ্ট হইতেছে। অতএব এরূপ কাব্যনাটক আমাদের সমাজে প্রকাশিত এবং প্রচলিত করা যে কত অনিষ্টের কারণ, তাহা একবার ভাবিয়া দেখিলেই বিলক্ষণ অনুভূত হইতে পারে।

বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে কামজ প্রেম।

বঙ্কিমচন্দ্রের অনেক উপন্যাস এইরূপ কামজ প্রেমে আরব্ধ এবং খুনে ও আত্মহত্যায় পর্য্যবসিত হইয়াছে। তাঁহার উপন্যাসগুলির উপসংহার এরূপ বিষময় হইলে ত রক্ষা ছিল, অনেকের উপক্রম আরও ভয়ানক। "দুর্গেশনন্দিনী"র উপক্রম দেখ।

কবি দেখিয়াছেন, ইংরাজী সমাজে 'চর্চ্চেই' অনেক বিলাতী দাম্পত্য প্রেমের সূত্রপাত হয়। 'চর্চ্চে' স্ত্রীপুরুষে একসঙ্গে বারংবার যাতায়াতে যুবক যুবতীগণের প্রথমে দেখাদেখি, হাসাহাসি, এবং নানা ভাবভঙ্গির আরম্ভ হইয়া চক্ষের নেশা জন্মায়। ক্রমে সেই নেশা বর্দ্ধিত হইতে থাকে। বঙ্কিমচন্দ্র তাই দেখাদেখি, হিন্দুর দেবমন্দিরকে সেইরূপ 'চর্চ্চ' বানাইতে গেলেন, কিন্তু তিনি হয় ত তখন ভুলিয়া গিয়াছিলেন, হিন্দুর দেবমন্দির 'বিলাতী চর্চ্চ' নহে। হিন্দুর দেবমন্দিরে প্রত্যক্ষ দেবতা বর্ত্তমান। প্রত্যক্ষ দেবতার সমক্ষে কেমন এক ধর্ম্মভয় উদয় হয়, যাহা শূন্য 'চর্চ্চে' হয় না। কোন হিন্দু এ পর্য্যন্ত দেবালয়ে আসিয়া কখন 'পীরিতি' করিতে সাহসী হয় নাই। প্রত্যক্ষ দেবতার সম্মুখে কাহারও সে ভাব মনে আসে না। সেখানে সবাই স্তব-স্তুতিতে ও ফুলবিল্বদলে পূজায় নিরত। হিন্দুর দেবমন্দির বড়ই ভক্তিপূর্ণ স্থান, বড়ই পবিত্র। সেখানে কি বালিকা, কি বৃদ্ধা; কি সধবা, কি বিধবা; সকলেই গললগ্নীকৃতবাসা ও কৃতাঞ্জলি হইয়া একদৃষ্টে দেবতার কৃপালাভের জন্য একান্ত ভক্তিপূর্ণচিত্তে দেবারাধনায় প্রবৃত্ত। বিশেষতঃ স্ত্রীজাতি। সেরূপ পবিত্র স্থানের পবিত্রতা কলুষিত করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র সেই দেবালয়ে শৈলেশ্বরের সাক্ষাতে সেই স্ত্রীজাতির এক-জনকে নহে, দুইজনকে পাপ-প্রণয়ের সূত্রপাতে লিপ্ত করিয়াছেন।

এরূপ কল্পনায় কি হিন্দু মাত্রেই শিহরিয়া উঠেন না? হিন্দুর দেব-সাক্ষাতে পাপ-প্রণয়! হিন্দুর পবিত্রতা ভঙ্গ করিতে হিন্দু অকুণ্ঠিত!!

এ ত তবু পদে আছে; "বিষবৃক্ষ" আরও ঘৃণিত চিত্র। বিষবৃক্ষের ঠিক উপক্রম নহে, উপক্রম হইতে গ্রন্থ-কল্পনা একটু অগ্রসর হইয়াছে, তখন কেমন একটা পাপচিত্র আমাদের সমক্ষে উদিত হয়! কুন্দনন্দিনী নগেন্দ্রের কৃপাপাত্রী হওয়াতে অগ্রে গৃহে আনীত হইল। এ চিত্র বড়ই সুন্দর! কিন্তু তার পর সেই শরণাগত বালবিধবার প্রতি নগেন্দ্র কিরূপ পাপ-ব্যবহার করিলেন! গ্রন্থের উপক্রম যত বিশুদ্ধ, সেই বিশুদ্ধতার উপর যেন ততই কলঙ্কপাত করিবার জন্য হিন্দুর পবিত্র অন্তঃপুরের পবিত্রতা বিনষ্ট করা হইয়াছে। শরণাগত বালবিধবা যখন নগেন্দ্রের অন্তঃপুরের পবিত্র ক্ষেত্রমধ্যে আনীতা হইলেন, তখন আমরা জ্ঞান করিয়াছিলাম, তিনি নগেন্দ্রের প্রতিপাল্য কন্যা-স্থানীয়া হইবেন। কিন্তু কুন্দনন্দিনীর ভাগ্যে অন্যরূপ ঘটিয়া উঠিল। কুন্দ, নগেন্দ্রের রূপজ প্রেমের পাত্রী হইয়া পড়িলেন। নগেন্দ্রের গৃহপুর সেই পাপকলঙ্কিত কামজ প্রেমের লীলাভূমি হইল। ভগিনী কমলমণি কুন্দনন্দিনীর সজ্ঘটিকার কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন। কুলটা পাপানুরাগে একদা জলে ডুবিতে গিয়াছিল। সেই বিষ্ঠা চাপা দিবার জন্য নগেন্দ্র বিধবাবিবাহ করিবার প্রস্তাব করিলেন। সে কেবল ছলনামাত্র। পবিত্র পরিবার-মণ্ডলে সেই পাপপ্রেমের অভিনয় চলিতে লাগিল। সূর্য্যমুখীর অসহ্য হইয়া উঠিল। গৃহলক্ষ্মী সেই লক্ষ্মীছাড়া কীর্ত্তন দেখিয়া রাগে ও ঘৃণায় বাড়ী পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন।

দেবমন্দিরের পবিত্রতায় কলঙ্কপাত করিয়াও যেন কবি সন্তুষ্ট হন নাই। তাই তিনি লক্ষ্মীর আবাস-স্থানীয় হিন্দুর অন্তঃপুরের

পবিত্রতা-বিনাশ-চিত্র উজ্জ্বলবর্ণে চিত্রিত করিলেন। হিন্দুর অন্তঃপুরও দেবমন্দিরপ্রতিম এবং ততোধিক পবিত্র। তথায় গৃহবিগ্রহ পূজিত হন, গৃহলক্ষ্মী বাস করেন; ভাই ভগিনী ও গুরুজনেরা থাকেন। হিন্দু, তাঁহার পরিবার-মণ্ডলীকে চিরদিন অতি পবিত্র বলিয়া জানেন। পাপ-ব্যভিচারের অভিনয় হইলে সে পবিত্রতা ভঙ্গ হয়। তাই হিন্দু সেই পরিবার-ক্ষেত্রে কোন ব্যভিচারের সূত্রপাত হইলে অমনি তাহা প্রথমে যথোচিত শাসন করেন; শাসনে অশাসিত হইলে যাহাতে সেই ব্যভিচার গৃহপুর হইতে দূরীভূত হয়, তাহার বিশেষ চেষ্টা দেখেন। ঘরের পাপ লোকে বাহির করিয়া দেয়; না, সেই পবিত্র গৃহধামে কুন্দ-নগেন্দ্রের পাপপ্রেমের অভিনয়! ছি! এতদপেক্ষা ঘৃণিত চিত্র আর কি আছে! এরূপ পাপচিত্রের কুদৃষ্টান্ত অতি ভয়ানক। অল্পবুদ্ধি যুবকগণের কল্পনা এতদ্দ্বারা কি কলুষিত হয় না? ভদ্রসমাজে এইরূপ অপবিত্র চিত্র যে কত অনিষ্টের কারণ হইয়াছে, তাহা এক মুখে বলা যায় না। আমাদের তরলমতি যুবক যুবতীগণ এই ছবি পুস্তকে অঙ্কিত দেখিতেছেন এবং রঙ্গালয়ে অভিনীত হইতে দেখিতেছেন। এই প্রকার শত শত পুস্তকের পাপছবি সুপ্রচার করিবার জন্য পল্লীতে পল্লীতে এক্ষণে প্রকাণ্ড পুস্তকালয় স্থাপিত হইয়াছে। এরূপ গ্রন্থ, গ্রন্থালয় এবং রঙ্গালয়ের অভিনয় দ্বারা দেশীয় সমাজের যে প্রকার অনিষ্ট-সাধন হইতেছে, তাহার নিদর্শন এক্ষণে সর্ব্বত্র দেখা যাইতেছে। এতদপেক্ষা ঔপন্যাসিক কাব্যের উপক্রম কি অধিক ভয়ানক হইতে পারে? যাহার উপক্রম এত ভয়ানক, তাহার সমুদায় পাঠের ফল যে কত ভয়ানক, তাহা অনায়াসে অনুমিত হইতে পারে।

ব্রজাঙ্গনা ও গীতার উপক্রমোপসংহার।

পূর্ব্বে আমরা কুগ্রন্থের উপক্রম ও উপসংহারের আলোচনা করিয়াছি। এক্ষণে সুগ্রন্থের উপক্রম ও উপসংহারের আলোচনা করিব।

ব্রজাঙ্গনার উপক্রমোপসংহার।

হিন্দু পরিবারমণ্ডলে ও সংসারে যে দাম্পত্য-প্রেমের বিকাশ, তাহা, আমরা দেখাইয়াছি, ইন্দ্রিয়জ প্রেম নহে। যে সকল হিন্দু ভারতললনা সীতার আদর্শে সংগঠিত হইতেছেন, তাঁহাদের প্রেম ভক্তিমিশ্রিত। প্রেম ভক্তিমিশ্রিত হইতে গেলেই তাহা হয় সতীপ্রেম, না হয় ভগবৎপ্রেম হইবে; হয় সীতার আদর্শে, না হয় রাধিকার আদর্শে পরিণত হইবে। এজন্য হিন্দু উপন্যাস-ক্ষেত্রে যে প্রেমের পরিচয়, তাহা ঐ দুয়ের অন্যতর হওয়াতে সে প্রেম-পরিচয়ে ভক্তির উদয় হয়। দ্রৌপদী ও সত্যভামা যে এত তেজস্বিনী ছিলেন, তথাপি তাঁহাদের সতীপ্রেমে পতিভক্তির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শিত হইয়াছে। রুক্মিণী ও কুন্তীর প্রেমে ভগবদ্ভক্তি উছলিয়া পড়ে। গান্ধারী পতিভক্তির সহিত ভগবদ্ভক্তি অতি আশ্চর্য্যভাবে মিশাইয়াছিলেন। এ সকল প্রেমপাত্রীর চিত্র আমরা "সাহিত্যচিন্তা"য় প্রদর্শন করিয়াছি। সে সকল চিত্র দেখিলে তাঁহাদিগকে ভক্তি ও পূজা করিতে ইচ্ছা হয়। সুতরাং সে প্রেম-পরিচয়ে কোন কুফল দর্শিতে পারে না কিন্তু

বিলাতী ঔপন্যাসিক প্রেমের প্রকৃতি সেরূপ নহে, তাহা সম্পূর্ণ বিপরীত ফল সমুৎপাদন করে। সেই প্রেমাদর্শে আমাদের যে সকল বাঙ্গালা উপন্যাস এক্ষণে রচিত হইতেছে, তাহার আদিগুরু বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের উপক্রম এবং উপসংহার-পর্য্যালোচনায় আমরা কিরূপ অধ্যয়নফল পাই, তাহা আমরা পূর্ব্বে দেখাইয়াছি। কিন্তু সে আদর্শ ছাড়িয়া মাইকেল প্রভৃতি লেখকগণ আমাদের পৌরাণিক আদর্শে যে সকল কাব্যনাটক রচনা করিয়াছেন, তাহাদের অধ্যয়নফল কেমন সুমধুর ও সুন্দর, তাহা আমরা তাঁহার ব্রজাঙ্গনার পর্য্যালোচনায় দেখাইব। বঙ্কিম হিন্দু হইয়াও অহিন্দু চিত্র আঁকিয়াছিলেন, কিন্তু মধুসূদন খৃষ্টান হইয়াও হিন্দুভাবের সুন্দর ও পরিপাটী চিত্র সকল রাখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার "মেঘনাদ-বধে"র সীতা ও সরমার চিত্রদ্বয়ের কি তুলনা আছে? কত মধুরতায়, কত কোমলতায় তাহা পরিপূর্ণ! আবার ব্রজাঙ্গনা শ্রীরাধা এরূপ ভক্তিরসে পরিপূর্ণ যে, তাহা পড়িলে চিত্ত একেবারে আর্দ্র হইয়া যায় এবং কবির প্রতি আমাদের ততোধিক ভক্তি জন্মে। "ব্রজাঙ্গনা"য় আমরা যে প্রেমভক্তির পরিচয় পাই, তাহা ভগবৎ-প্রেমের পরাকাষ্ঠা।

রাসেশ্বরী শ্রীরাধার সহিত যখন শ্রীকৃষ্ণের রাসের রমণ শেষ হইয়াছে, তখন ব্রজলীলা শেষ হইয়াছে। তাই, কৃষ্ণ মথুরায় গেলেন; আর ব্রজে থাকিবার আবশ্যকতা কি? রাধিকা আধ্যাত্মিক প্রকৃতি—হিন্দুসাধকের ভক্তিময়ী মূর্ত্তি। মানুষের আধ্যাত্মিক প্রকৃতি এবং ভগবদ্ভক্তির যদি রূপ থাকে, তবে তাহা গোপী-প্রধানা শ্রীরাধায় প্রকটিত। রাধিকা ব্রজপুরবাসিনী ও বৃন্দাবনবিলাসিনী। তিনি মানুষের গোকুলরূপ ব্রজপুর হইতে বৃন্দাবনে আসিয়াছিলেন।

সাধক যখন ব্রজভাবে উপনীত হন, যখন তিনি সংসার-আসক্তি-রূপ যমুনা পার হইয়া থাকেন, তখন তিনি ব্রজবাসী হন। এই ব্রজধামে কেবল মুনিগণই সিদ্ধিলাভ করিয়া আসিতে পারেন। যখন তাঁহারা বাল্যভাবের সরলতায় উপনীত হইতে পারেন, তখন তাঁহাদের প্রকৃতি ভক্তিরূপিণী বাল্যসরলতা-পূর্ণ রাধারূপিণী হয়। ব্রজপুর এইরূপ বালভাবসম্পন্ন গোপ-গোপীগণে পূর্ণ *। সেখানে ভগবান্ সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষীভূত। প্রত্যক্ষীভূত কাহাদের কাছে? মুনিজনোচিত বালভাবপূর্ণ গোপালগণের কাছে এবং সরলতাপূর্ণ বালিকা গোপীগণের কাছে। তিনি তখন বালকৃষ্ণরূপে দেখা-সাক্ষাৎ দেন। বালকৃষ্ণ কেন? সরলচিত্ত বালকেরা যেরূপ সদানন্দ, বালকৃষ্ণ সেই সদানন্দের প্রতিমূর্ত্তি ধারণ করিয়া গোকুলের (দেবধামের) নন্দালয়ে অবস্থিত। তাই হিন্দু ভক্তিশাস্ত্রের ব্রজ-লীলার অর্থ মানুষের অধ্যাত্মধামে মানসপ্রত্যক্ষীভূত ভগবানের সহিত ভক্তের সাক্ষাৎ আনন্দময় বাল্যলীলা। সেই ভক্ত রাধিকা-রূপে শ্রীকৃষ্ণের রাসে ভগবানের সহিত যুক্ত হইয়াছেন। ভক্ত শ্রীকৃষ্ণের তন্ময়তা লাভ করিয়াছেন।

তথাপি অধ্যাত্ম জগতের নিয়ম এই, সকল সময় ভক্ত তন্ময়তায় প্রতিষ্ঠিত থাকিতে পারেন না। নিত্য তন্ময়তা লাভের পূর্ব্বে অনেক

---

* এই বালভাব কিরূপ, তাহা বেদান্ত দর্শনের ৩অ, ৪পা, ৫০ সূত্রের শাঙ্করভাষ্যে দ্রষ্টব্য। শ্রুতি বলিয়াছেন—"তস্মাৎ ব্রাহ্মণঃ পাণ্ডিত্যং নির্ব্বিদ্য বাল্যেন তিষ্ঠাসেৎ।"—ব্রাহ্মণ পাণ্ডিত্যলাভ করিয়া বাল্যভাবে স্থিতি করিবেন। পাণ্ডিত্য-লাভ করিয়া ব্রাহ্মণ পণ্ডিত হয়েন। গীতা বলেন—যিনি সমদর্শী, তিনিই পণ্ডিত। ৫। ১৮।

যায় ধ্যান ভঙ্গ হয়, যোগীদিগের ব্যুত্থান হয়। এই তন্ময়তারও পরিচয়ার্থ অভ্যাস-যোগ চাই। সেই যোগই শ্রীরাধার শত বৎসর বিরহ। নারদ তাঁহার ভক্তিসূত্রে বলিয়াছেন, এই বিরহেই ভক্তির পরাকাষ্ঠা লাভ হয়। পরাভক্তিতে উপনীত হইবার প্রধান উপায় বিরহ। যেমন বিরহে পতিপত্নীর দাম্পত্যপ্রণয়ের পরিপুষ্টিলাভ হয়, তদ্রূপ ভগবৎবিরহে ভক্তির পরিপুষ্টি সাধন হয়। ধ্যানভঙ্গে কৃষ্ণবিরহেই প্রধান যোগাভ্যাস। এই ধ্যানভঙ্গে ঈশ্বরসর্ব্বস্ব যোগীরা কৃষ্ণবিরহে একান্ত কাতর হইয়া পড়েন। কিরূপ কাতর হন, মহারাসে রাধিকার কাতরতায় তাহা বর্ণিত হইয়াছে।

রাধিকা এইরূপ বিরহকাতরা হইয়া শ্রীকৃষ্ণকে হারাইলে সহসা ক্ষণকালের জন্য শ্রীকৃষ্ণ স্বপ্নবৎ উদয় হইয়াছেন। সেইরূপ তন্ময়তা লাভ করিবামাত্রেই তিঁনি কি দেখিতেছেন? দেখিতেছেন;—

"নাচিছে কদম্বমূলে, বাজায়ে মুরলী রে
রাধিকারমণ।
চল, সখি, ত্বরা করি, দেখিগে প্রাণের হরি,
ব্রজের রতন।"
"মানস-সরসে, সখি, ভাসিছে মরাল, রে,
কমল-কাননে।
কমলিনী কোন্ ছলে, থাকিবে ডুবিয়া জলে,
বঞ্চিয়া রমণে?" ইত্যাদি

আমরা ব্রজাঙ্গনার বিরহ-বর্ণনার প্রারম্ভেই শ্রীরাধার ক্ষণকালের জন্য এইরূপ তন্ময় ভাবের পরিচয় পাই। দেখিতে পাই, তাঁহার ভগবদ্ভক্তির কতদূর পরিপুষ্টি সাধন হইয়াছে। একবার তন্ময়তা জন্মে, আবার যায়, আবার হয়। সেই বিরহ-বিধুরা, থাকিয়া

থাকিয়া, শ্রীকৃষ্ণকে এইরূপ দেখিতে পাইতেছেন। কবিও সেইভাবে মুগ্ধ হইয়া সেই কৃষ্ণ-স্বপ্নময়ী ভক্তিতে ডুব দিয়া বলিয়া উঠিলেন :—

"মধু কহে ব্রজাঙ্গনে, স্মরি ও রাঙা চরণে,
যাও যথা ডাকে তোমা শ্রীমধুসূদন।"

রাধিকার এই ধ্যানজ অবস্থা আমরা গ্রন্থের উপক্রমেই উপলব্ধি করিলাম। পরে সেই অবস্থারই ক্রমপুষ্টি গ্রন্থের প্রবৃদ্ধিতে ক্রমান্বয়ে সাধিত হইয়াছে। সাধিত হইলে রাধিকা গ্রন্থের উপসংহারে কিরূপ তন্ময়তার অধ্যাত্ম অবস্থায় উপনীত হইলেন? সেই অবস্থা এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে ;—

"সখি রে,—
বন অতি রমিত হইল ফুল ফুটনে!
পিককুল কল কল, চঞ্চল অলিদল
উছলে সুরবে জল, চললো বনে।
চললো জুড়াব আঁখি দেখি—মধুসূদনে!"

তিনি গ্রন্থের উপক্রমে সখীগণকে ত্বরা করিয়া শ্রীকৃষ্ণ-দর্শনে কেবল যাইতে বলিয়াছিলেন, কিন্তু উপসংহারে সেই শ্রীকৃষ্ণকে ধ্যানে দেখিতে পাইয়া বলিয়া উঠিলেন, সখি! আমি দেখিতেছি, শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাবে বন অতি রমণীয় হইয়াছে, সকলই শ্রীকৃষ্ণের রূপে মধুময় হইয়াছে, তিনিই পিকরূপে মধুরস্বরে গাহিতেছেন, অলিরূপে গুঞ্জরিয়া বেড়াইতেছেন, কালিন্দীর কৃষ্ণজলে সুরবে তরঙ্গায়িত হইতেছেন, সুতরাং নিকুঞ্জ কাননেও সেই রূপ দেখিয়া মানস-চক্ষু পরিতৃপ্ত করিব। যেমনি উপক্রম, তেমনি উপসংহার।

মাইকেল মধুসূদন পৌরাণিক কাব্য-নাটকে যেরূপ সফলতা লাভ করিয়াছেন, আমরা এমন কথা বলিতে চাহি না যে, সেইরূপ সফ-

লতা বাঙ্গালা ভাষায় পৌরাণিক কবিমাত্রই লাভ করিয়াছেন। পুরাণ অবলম্বনে কাব্য-নাটক লেখা বড় সহজ কথা নহে। পুরাণের ভক্তি-রস বজায় রাখা অতি কঠিন। পুরাণ সেই ভক্তিরস অনেকবিধ উপকরণে সঞ্চারিত করিয়া দেয়। অদ্ভুত ঘটনাবলির সহিত দেব-চরিত্র, ঋষিচরিত্র এবং সাধকচরিত্র অতি আশ্চর্য্য কৌশলে মিশাইয়া অতি সংক্ষিপ্ত বিবরণের ঘনীভূত রসে পুরাণ ভক্তি সঞ্চারিত করিয়া দেয়। এ সকল উপকরণ-বিরহিত হইলে সে রসের সঞ্চার হওয়া দুষ্কর। তজ্জন্য পুরাণের গাম্ভীর্য্য ও গৌরব রক্ষা করা বড়ই কঠিন। সেই গৌরব ও গাম্ভীর্য্য রক্ষা করিতে না পারিলে বিপরীত ফল ফলে। তাই দেখিতে পাই, অনেক লেখকই পৌরাণিক খণ্ডব্যাপার লইয়া বাঙ্গালায় উপন্যাস বা কাব্য-নাটক লিখিতে গিয়া পুরাণকে একেবারে মাটী করিয়া ফেলিয়াছেন। তাহাতে বিলাতী প্রেম ও বিলাতী ন্যায়ান্যায়বিচার মিশাইতে গিয়া পুরাণের গৌরব বিনষ্ট এবং রসভঙ্গ করিয়াছেন। পৌরাণিক চিত্রসকল অনেক স্থলে বিলাতী হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সে যাহা হউক, এক্ষণে আর একখানি গ্রন্থের উপক্রম ও উপসংহার গৃহীত হইতেছে। আমরা শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা গ্রহণ করি-লাম।

গীতার উপক্রমোপসংহার।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার উপক্রম কোথায়? গীতার উপক্রম অর্জ্জুনের বাক্যে। কুরুক্ষেত্রে যখন অর্জ্জুনের সম্মুখে তাঁহার গুরুজনগণ আততায়িরূপে উপস্থিত, তখন সেই আততায়ীর বধার্থ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে রাজধর্ম্মানুযায়ী কোন দোষ নাই বটে, কিন্তু গুরুবধ করিলে ধর্ম্মশাস্ত্রানুসারী ঘোর পাতক আছে। অতএব, ব্যবহারশাস্ত্রের

অনুসারী হইতে গেলে যে, অর্জ্জুনকে ধর্ম্মশাস্ত্রানুসারে পতিত হইতে হয়। এরূপ সঙ্কটস্থলে তিনি কিরূপে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে পারেন? ব্যবহার-বিধি-প্রকরণে মনু বলিয়াছেন ;—

"গুরুং বা বালবৃদ্ধৌ বা ব্রাহ্মণং বা বহুশ্রুতম্।
আততায়িনমায়ান্তং হন্যাদেবাবিচারয়ন্॥
নাততায়িবধে দোষো হন্তুর্ভবতি কশ্চন।
প্রকাশং বাপ্রকাশং বা মন্যুস্তং মন্যুমৃচ্ছতি॥
মনুসংহিতা। ৮অ-৩৫০।৩৫১।

"গুরু, বালক, বৃদ্ধ, ব্রাহ্মণ বা বহুশ্রুতব্যক্তি আততায়িরূপে আগত হইলে, অন্য কোন আত্মরক্ষার উপায় না থাকিলে তাহাকে অবিচারে হনন করিবে। প্রকাশ্য বা অপ্রকাশ্য ভাবেই হউক, আততায়ি-বধে হন্তার কোনও দোষ হয় না; কারণ তাহাতে ক্রোধ ক্রোধকে সংহার করে।"

রাজ্যরক্ষা এবং লোকরক্ষার্থ অনেক স্থলে অনেক কার্য্য ধর্ম্মবিরুদ্ধ হইলেও রাজাদিগকে রাজ-ধর্ম্মানুযায়ী ব্যবহারশাস্ত্রের বিধি-অনুসারে চলিতে হয়। "শঠে শাঠ্যং সমাচরেৎ" এই বিধি অনুসারেই স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ কুরুক্ষেত্র-রণে অনেক শাঠ্যের উপদেশ দিয়াছিলেন। সেই জন্য লক্ষ্মণ ছদ্মবেশে ছলনা করিয়া ভেদনীতি অবলম্বনপূর্ব্বক যজ্ঞ-গৃহে নিরস্ত্র মেঘনাদকে বধ করিয়াছিলেন। সেই জন্যই যুধিষ্ঠির মিথ্যা-বাক্য-ছলে দ্রোণাচার্য্যকে বিপন্ন করিয়াছিলেন এবং অর্জ্জুন ব্রাহ্মণ-বধ করিয়াছিলেন। এ সমস্তই রাজনীতি। মনু বলিয়াছেন, এইরূপ রাজনীতি অবলম্বন করিলে তত দোষ নাই। দোষ নাই বলিতে এই মাত্র বুঝা গেল যে, লোকপালন করিতে হইলে এরূপ কার্য্য অবলম্বন করিতেই হইবে, নহিলে গুরুতর ধর্ম্ম যে লোকরক্ষা, তাহা সম্পন্ন

হয় না। সুতরাং ব্যবহারমতে এরূপ কার্য্য রাজদণ্ডে দণ্ডনীয় নহে। রাজদণ্ডে দণ্ডনীয় না হইলেও ধর্ম্মদণ্ডে অবশ্য দণ্ডনীয়। আততায়ী কে, তাহা স্মৃতিশাস্ত্রে এইরূপ উক্ত হইয়াছে :—

"অগ্নিদো গরদশ্চৈব শস্ত্রপাণির্ধনাপহঃ।
ক্ষেত্রদারহরশ্চৈব ষড়েতে আততায়িনঃ॥
বশিষ্ঠসংহিতা। ৩য় অধ্যায়।

প্রাণবধ করিবার অভিপ্রায়ে যে অগ্নি ও বিষ প্রদান করে, অথবা অস্ত্রধারণ করে, যে ধন, ভূমি, ও স্ত্রী হরণ করিতে আইসে—সেই ছয়জন আততায়ী।"

অতএব আচার্য্য দ্রোণ, পিতামহ ভীষ্ম প্রভৃতি যখন আততায়িরূপে আসিয়াছেন, তখন তাঁহাদিগকে বধ করাই বিধেয়। কিন্তু সেই বধ-হেতু যে পাতকের উৎপত্তি হইবে, সেই মহাপাপ হইতে পরিত্রাণের উপায় কি? এই কথা জিজ্ঞাসা করিয়া অর্জ্জুন গাণ্ডীব ত্যাগ করিলেন। গীতার এই উপক্রম। এই উপক্রমে দেখা যায় যে, অর্জ্জুন যে প্রশ্ন করিয়াছিলেন, তাহা সর্ব্বধর্ম্মেরই সাধারণ প্রশ্ন —মানুষ কিরূপে পাপ হইতে মুক্ত হইতে পারে? লোকসমাজে যত ধর্ম্মপ্রণালী প্রবর্ত্তিত আছে, সে সমস্তই মনুষ্যের পাপ হইতে মুক্তিলাভের পন্থা। গীতা এই প্রশ্নের উত্তর দিয়া বেদোক্ত মুক্তিপথই ব্যক্ত করিয়াছেন। সুতরাং গীতার উপক্রম যেমন সমগ্র মানবজাতির এক অত্যাবশ্যক মহা বিষয়,—মহা বিষয় কেন বলি—পরমার্থসাধক সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিষয়, তাহার উপসংহারও তেমনি মানবজাতির অবশ্যজ্ঞাতব্য পরম সম্পত্তি। গীতা অভ্যাস, অর্থবাদ এবং উপপত্তির এক অপূর্ব্ব রীতিক্রমে সেই পরম উপসংহারে উপনীত হইয়াছেন। সেইরূপ উপসংহারে উপনীত হইয়াছেন বলিয়া, গীতাপাঠের ফলও বিশিষ্টরূপে লভ্য হইয়াছে। সেই উপসংহার ও ফল গীতাশেষেই উক্ত হইয়াছে।

তদ্দ্বারাই প্রতিপন্ন হয়, যে গ্রন্থ যথারীতিক্রমে উপক্রম হইতে উপসংহারে উপনীত হয়, তাহার অধ্যয়ন ও শ্রবণফল বিলক্ষণ উপলব্ধ হয়'। অতএব, এই ফল ধরিয়াই সকল গ্রন্থ বিচার করা কর্ত্তব্য। গীতার মহা উপসংহার এই ;—

"ইতি তে জ্ঞানমাখ্যাতং গুহ্যাদ্ গুহ্যতরং ময়া।
বিমৃশ্যৈতদশেষেণ যথেচ্ছসি তথা কুরু॥
সর্ব্বগুহ্যতমং ভূয়ঃ শৃণু মে পরমং বচঃ।
ইষ্টোঽসি মে দৃঢ়মিতি ততো বক্ষ্যামি তে হিতম্॥
মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োঽসি॥
সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥"

"হে অর্জ্জুন! তোমাকে অতি গোপনীয় জ্ঞানোপদেশ দিলাম। এখন তুমি আমার উপদিষ্ট এই গীতাশাস্ত্র (জ্ঞানোপদেশ) সম্যক পর্য্যালোচনা করিয়া যাহা ইচ্ছা তাহাই কর। তদ্দ্বারা তোমার মোহ দূরীভূত হইবে। তুমি আমার একান্ত প্রিয়ভক্ত; সেইজন্য যাহা অত্যন্ত গুহ্য এবং নানা প্রকরণে কথিত হইয়াছে, তোমার হিতার্থ আমি তাহার সার সংগ্রহ করিয়া পুনরায় কহিতেছি :—

হে কৌন্তেয়! তুমি আমাতেই চিত্ত সমর্পণ কর, আমারই ভজনা কর, পূজা কর, নমস্কার কর, এবং সর্ব্বতোভাবে আমারই শরণাপন্ন হও, তাহা হইলে আমাকেই প্রাপ্ত হইবে। সর্ব্বধর্ম্মপরিত্যাগপূর্ব্বক কেবল আমার শরণাপন্ন হইলে আমি তোমাকে সর্ব্বধর্ম্মাধর্ম্মবন্ধনরূপ পাপ হইতে মুক্ত করিব। তুমি শোক করিও না; কারণ, তোমাকে কর্ম্মত্যাগ করিতে হইবে না, কেবলমাত্র কর্ম্মফল

ত্যাগ করিয়া কর্ম্ম করিলেই তোমাকে আর পাপ স্পর্শ করিবে না। এবম্ভূত ত্যাগই মুক্তির কারণ।"

তবে আর মানবজাতির শোকের কারণ কি? ইহাতে যে শুদ্ধ অর্জ্জুনের শোকের হেতু অপনীত হইয়াছে এমন নহে, এতদ্দ্বারা সমস্ত মানবজাতির মহাশোক-হেতু যে পাপ, তাহা হইতে পরিত্রাণের ধ্রুব অথচ মানুষের স্বভাবসিদ্ধ উপায় নিরূপিত হইয়াছে। মানুষ হস্তপদাদির সমস্ত ব্যাপারে লিপ্ত থাকিয়াও যদি এমন ভাবে কর্ম্ম করে যে, সে কর্ম্ম তাহার কর্ম্ম না হয়, তাহা হইলে তাহাকে ত আর সে কর্ম্মের ফলভোগ করিতে হয় না। সকলই ঈশ্বরের কর্ম্ম, আমার নিজের কর্ম্ম নহে, এই কর্ত্তব্যবুদ্ধি ও জ্ঞান স্বভাবসিদ্ধ না হইলে কর্ম্মফল-ত্যাগ সম্ভাবিত হইতে পারে না। ভৃত্য আদিষ্ট হইয়া কোন কর্ম্ম করিলে, যেমন সে কর্ম্মফল তাহার হয় না, যে আদেশ করে, তাহা সেই প্রভুকেই বর্ত্তে, তেমনি আমরা যদি কোন কর্ম্ম ঈশ্বরের আদেশজ্ঞানে সম্পন্ন করি, তাহাতে যদি আমাদের নিজ কর্ত্তৃত্বাভিনিবেশ কিছুমাত্র না থাকে, তবে তাহাতে আমাদিগকে পাপে লিপ্ত হইতে হইবে কেন? যখন মানুষ নিজ কর্ত্তৃত্ব ও অহঙ্কার পরিহার করিতে পারিয়াছেন, যখন তাঁহার আমিত্বজ্ঞান বিলুপ্ত হইয়াছে; ভক্তিযোগ, কর্ম্মযোগ এবং জ্ঞানযোগ দ্বারা ততদূর ঈশ্বরে ভক্তি ও আত্ম-সমর্পণ হইলে, কর্ম্মসন্ন্যাসহেতু সকলই ঈশ্বরের কার্য্য এমত জ্ঞান ও বুদ্ধি সঞ্জাত হইলে আর আমার কর্ম্ম রহিল কিরূপে? যদি আমার কর্ম্মই না থাকে, তবে আমার পাপপুণ্যও কিছুই নাই। এরূপ হইলেই ভগবান্ সকলকেই বলিতে পারেন:—

"অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ।"

গ্রন্থের অভ্যাস।

অভ্যাসের প্রকৃতি।

আর্য্যসাহিত্যের সমালোচন-রীতি বড় বাঁধাবাঁধি নিয়মে আবদ্ধ। অগ্রে গ্রন্থের উপক্রম ও উপসংহার দেখিতে হইবে। দেখিতে হইবে গ্রন্থের উপসংহার ঠিক উপক্রমেরই পরিণাম কি না? গীতার উপসংহার-সমালোচনায় তাহাই বিচারিত হইয়াছে। এই বিচার পরিসমাপ্ত হইলে দেখিতে হইবে, সেই উপক্রম ও উপসংহারমধ্যে গ্রন্থের সমুদায় কলেবরে সেই প্রক্রান্ত বিষয়ই বরাবর পর্য্যালোচিত হইয়াছে কি না? যদি সেই কলেবরমধ্যে পরকীয় বিষয় সন্নিবেশিত হইয়া থাকে, তবে তাহা সে গ্রন্থের অন্তরঙ্গ অঙ্গ হয় নাই। তদ্দ্বারা অনধিকারচর্চ্চা হইয়াছে। সেই অনধিকারচর্চ্চায় গ্রন্থের অসঙ্গতি-দোষ ঘটিয়াছে। সুতরাং গ্রন্থমধ্যে এমত সকল বিষয়ই পুনঃ পুনঃ আলোচিত হওয়া আবশ্যক, যদ্দ্বারা গ্রন্থের উপক্রমের ক্রমশঃ পরিবর্দ্ধন ও পরিণাম সাধিত হয়। এরূপে সাধিত হয়, যেন সেই পরিবর্দ্ধনের পরিণতিক্রমে গ্রন্থশরীর সৃষ্ট হইয়া উপসংহারে উপনীত হইয়া থাকে। এমত ভাবে সৃষ্ট, যেন অধ্যয়নে বরাবর প্রতীত হইতে থাকে, সে শরীর উপক্রমেরই বৰ্দ্ধিত ও পরিণত পূর্ণাবয়ব। গ্রন্থের এইরূপ বিন্যাস-সাধনে প্রক্রান্ত বিষয়ের যে পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি হয়, তাহারই নাম অভ্যাস। অভ্যাস উপক্রম ও উপসংহারের মধ্যে থাকিয়া গ্রন্থশরীরকে পূর্ণাবয়ব করিয়া

আনে বলিয়া তাহা উদ্ধৃত শ্লোকমধ্যে ঠিক উপক্রমোপসংহারের পরেই বসিয়াছে। রামায়ণ-মহাভারতের আলোচনায় এই অভ্যাসের প্রকৃতি আরও বিশদরূপে প্রদর্শিত হইতেছে।

রামায়ণ-মহাভারতে অভ্যাস।

যে গ্রন্থের উপক্রম অভ্যাসক্রমে উপসংহারে উপনীত হয়, তাহারই সুন্দর অধ্যয়ন-ফল জন্মে। সুগ্রন্থ মাত্রেরই যদি অধ্যয়ন-ফল হয়, তবে সেই ফলের গৌরব অনুসারে যে গ্রন্থের গৌরব হইবে, এ কথা ত পড়িয়াই রহিয়াছে। এজন্য আমরা দেখিতে পাই, সংস্কৃত আর্য্যসাহিত্যে বেদ, বেদান্ত, দর্শন, স্মৃতি, পুরাণ, কাব্য, অলঙ্কার, ইতিহাস প্রভৃতি সকল গ্রন্থেরই অধ্যয়ন-ফলের যেরূপ গৌরব আছে, অপর দেশীয় সাহিত্যের সেরূপ নাই। মানুষের ধর্ম্মই পরমার্থ, সুতরাং সেই পরমার্থের গৌরবেই সর্ব্বশাস্ত্র এবং কাব্যাদি গৌরবান্বিত। কালিদাসাদির কাব্যসকলও পৌরাণিক অর্থে সম্পন্ন। তাহাদের ফলশ্রুতি ধর্ম্মলাভ। সে সকল কাব্যাদিতে যে সমস্ত অধর্ম্মের সৃষ্টি আছে, সে সকল সৃষ্টি সেই ধর্ম্মেরই গৌরব-বৃদ্ধি করিয়াছে। রামায়ণের রাক্ষসী সৃষ্টি, মহাভারতের দুর্য্যোধনাদির সৃষ্টি, কেবল পুণ্য পক্ষকেই অধিকতর সমুজ্জ্বল করিয়া দিয়াছে। কিরূপে দিয়াছে? পুণ্য-পক্ষের পুনঃ পুনঃ আলোচনায় তাহা এত বিস্তৃত হইয়াছে যে, সেই বিস্তৃত-চিত্র-মধ্যগত পাপপক্ষীয় চিত্রের কলঙ্কপাতে সেই পুণ্যেরই বর্ণরাগ সমুজ্জ্বল হইয়াছে। রামায়ণ ও মহাভারতের উপক্রমে যে দাশরথিগণের এবং পাণ্ডবগণের বিবরণ, মহাকাব্যের বিশাল দেহ-মধ্যে সেই পক্ষেরই বিস্তৃতি ও পুনঃ পুনঃ আলোচনা। আবার উপসংহারে দেখ, সেই দাশরথিগণের এবং

পাণ্ডবগণেরই জয় এবং দীর্ঘকালীন ঘটনা-পূর্ণ রাজ্য-ভোগ। মধ্যে কেবল পাপ-পক্ষের লীলাখেলা প্রদর্শিত হইয়াছে। সেই লীলায় পাপের সহিত পুণ্যপক্ষের বলবিক্রমের ও বীর্য্যের মহাদ্বন্দ্ব। সেই দ্বন্দ্বে সেই বিক্রম ও বীর্য্যের বিরাট্ বিকাশে পাপ বিধ্বস্ত ও নিপতিত। এই দ্বন্দ্বে সেই পুণ্যপক্ষেরই প্রভাব দ্বিগুণবলে উজ্জ্বলতা লাভ করিয়া তাহাকেই পরিশেষে জয়শীল ও সমৃদ্ধিসম্পন্ন করিয়াছে। এস্থলে তবে কিসের পুনঃ পুনঃ আলোচনা দেখিতে পাই? উপক্রম হইতে উপসংহার পর্য্যন্ত বরাবরই সেই পুণ্যপক্ষেরই গৌরব বৃদ্ধি করা হইয়াছে। এইরূপ অভ্যাস দ্বারা গ্রন্থের এক বিশেষ বিষয়েরই বিস্তৃতি ও গৌরব-সাধন হয়। যাহার বিস্তৃতি ও গৌরব, তদ্দ্বারাই গ্রন্থপাঠের ফলাফল নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। সুতরাং গ্রন্থের সমালোচনকালে দেখা উচিত, গ্রন্থ মধ্যে কোন্ বিষয় বারংবার ও আগাগোড়া অভ্যস্ত হইয়াছে। সেই বিচারেই প্রতীত হয়, গ্রন্থপাঠের ফল মন্দ কি ভাল হইল। যদি মন্দ হয়, কেন মন্দ হইল; যদি ভাল হয়, কেন ভাল হইল;—তদ্দ্বারাই অনায়াসে প্রতীয়মান হয়। যে গ্রন্থের অধ্যয়ন-ফল মন্দ, তাহার বিচারে প্রতীত হইবে যে, অভ্যাস সেই গ্রন্থের পাপপক্ষ এবং মন্দ দিক্‌কে যত প্রবৃদ্ধ করিয়াছে, তাহার পুণ্যপক্ষ ও ভাল দিক্‌কে তত নহে। ফলে এই দাঁড়াইয়াছে যে, গ্রন্থের কলেবরে সেই পাপপক্ষই অধিকতর সমুজ্জ্বল হইয়া পুণ্যপক্ষকে নিষ্প্রভ করিয়া দিয়াছে। অতএব ধর্ম্মের গৌরব দেখান যদি গ্রন্থের উদ্দেশ্য হয়, তবে গ্রন্থের উপক্রমে সেই ধর্ম্মবীজই রোপণ করা উচিত। গ্রন্থের বিশালক্ষেত্রে সেই বীজের অঙ্কুর ও বৃক্ষোদ্গম দেখাইয়া তাহাই বিস্তৃত শাখায় পল্লবিত করা উচিত। তাহা না করিয়া যদি পাপবীজ প্রথমেই রোপণ করা হয়,

তবে সেই বীজই ক্ষেত্র-মাঝে বৃহৎ বৃক্ষরূপে পরিদৃশ্যমান হইতে থাকে। তাহার ফল অবশ্য বিষময় হয়। শেক্সপিয়ারের ম্যাক্‌বেথ নাটকে ঠিক এইরূপ ঘটিয়াছে।

অসাধারণ ধর্ম্মাদর্শ।

কিন্তু ধর্ম্মের গৌরব দেখাইতে গেলে কি আবশ্যক? ধর্ম্মকে অসাধারণ মূর্ত্তিতে দেখান আবশ্যক। আমরা মনুষ্য-সমাজ মধ্যে সচরাচর ধর্ম্মের যে সামান্য মূর্ত্তি দেখিতে পাই, তাহাতে ধর্ম্মের তত গৌরব দৃষ্ট হয় না। লোকসমাজে সচরাচর লোকে যেরূপ ধর্ম্মাচার করে, তাহাতে কেহ চমকিত হয় না। তদ্রূপ আবার সচরাচর লোকে যেরূপ পাপাচার করে, তাহাও তত ঘৃণার্হ নহে। অনেকেই সেরূপ করিয়া থাকে। অনেকেই মিথ্যা কথা বলে, অনেকেই চুরি করে। কিন্তু যখন মিথ্যা ব্যবহার ঘোর জুয়াচুরীতে এবং চুরী ডাকাতিতে পরিণত হইয়া বিশেষ অনিষ্টাপাত হয়, তখনই তাহা লোকের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তদ্রূপ পুণ্য কর্ম্ম। সামান্য সামান্য দান ধ্যান অনেকেই করিয়া থাকে। কিন্তু যখন সেই দান ধ্যান অসামান্য হয়, তখনই তাহা বিশেষরূপে লোকের চিত্তাকর্ষণ করে। কাব্যসংসারে তবে অসাধারণ পুণ্য চিত্রের সৃষ্টি চাই; পাপ স্বভাবতই ঘৃণার্হ, এজন্য পাপের প্রতি লোকের ঘৃণা উৎপাদন করা আবশ্যক হয় না। অসাধারণ পাপাচারের দৃষ্টান্ত সকল লিপিবদ্ধ করিয়া রাখাতে কি ফল? লোককে কি তদ্রূপ পাপাচার শিক্ষা দিতে হইবে, না তদ্রূপ পাপাচারের প্রতি লোকের ঘৃণা উৎপাদন করিতে হইবে? যদি সেরূপ ঘৃণা স্বাভাবিক না হইত, লোকে স্বভাবতই যদি ঘোর পাপকে ঘৃণা না করিত, যদি খুনের নামে লোকে

স্বভাবতই শিহরিয়া না উঠিত, তবে বটে দৃষ্টান্ত দেখাইয়া তৎপ্রতি ঘৃণা উৎপাদনের জন্য চেষ্টা করা উচিত হইত। বিশেষতঃ পাপের দৃষ্টান্ত লোকের চক্ষে যত না পড়ে, ততই ভাল। কারণ পাপের কেমন এক স্বাভাবিক আকর্ষণ-শক্তি আছে, যে জন্য পাপাচার দেখিতে দেখিতে অপরিণতবয়স্ক লোকে তদ্রূপ পাপাচারী হইতে শিখে। সর্ব্বদা পাপাচার দেখিতে দেখিতে তৎপ্রতি ঘৃণা অপনীত হইতে থাকে। যে সর্ব্বদা চোরের সহিত সহবাস করে, সে চোর হইয়া উঠে। পাপের সংসর্গ-দোষ যেমন ভয়ানক ও অনিষ্টকর, পুণ্যের সংসর্গগুণ তেমনই মঙ্গলকর ও আনন্দদায়ক। তজ্জন্য সাধুকার্য্যের দৃষ্টান্ত সকল লিপিবদ্ধ করিয়া রাখাই উচিত। সেই সাধুকার্য্যের মধ্যে যাহা কিছু অসাধারণ, তাহাই রক্ষণীয়। অসাধারণ ধর্ম্মসাধনা ও ধর্ম্মকর্ম্মের দৃষ্টান্ত রক্ষা করা উচিত। সেই সকল দৃষ্টান্ত সমাজে সর্ব্বদা ঘটে না বলিয়া দুর্লভ এবং তজ্জন্য রক্ষণীয়। রক্ষণীয় এই জন্য যে, সেরূপ দৃষ্টান্ত দেখিয়া অপরে তদ্রূপ সাধু হইতে শিখিবে। সেই সকল দৃষ্টান্ত যদি অতি উজ্জ্বলবর্ণে অঙ্কিত হয়, তাহা হইলে তাহা জীবিতাকার ধারণ করে। জীবিত রূপে তোমার কল্পনার সমক্ষে বিচরণ করিতে থাকে। তুমি যেন ভরতকে, লক্ষ্মণকে, যুধিষ্ঠিরকে ও রামকে চক্ষের সমক্ষে দেখিতে পাও। সীতা, সাবিত্রী ও দ্রৌপদী তোমাকে সতত জীবিত-পথে চালিত করে। গোপীভক্তিতে তোমার মন মোহিত হয়। তুমি ততদূর কৃষ্ণভক্তির আকাঙ্ক্ষা করিতে অভিলাষী হও। এই জন্য অসাধারণ সাধু দৃষ্টান্তসকল সাহিত্যক্ষেত্রে উজ্জ্বল বর্ণে চিত্রিত করিয়া রাখা একান্ত আবশ্যক।

ধর্ম্মশিক্ষা দেওয়াই যদি কাব্যনাটকাদির সর্ব্বোচ্চ শিক্ষা হয়, তবে কিরূপে সেই শিক্ষা দিতে হইবে? গীতা বলিয়াছেন :—

"সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥"

অতএব, সর্ব্বরূপ পাপ হইতে মুক্ত হইবার একমাত্র উপায় সর্ব্বদা ভগবানের শরণাপন্ন হইয়া থাকা। যিনি ভগবানের একান্ত শরণাপন্ন হইয়া ভক্তিপথে বর্দ্ধিত হইতে থাকেন, তিনিই পাপ হইতে মুক্ত হইতে পারেন। সুতরাং ভগবদ্ভক্তিতে প্রবৃদ্ধ হইয়া ঈশ্বরের দিকে আকৃষ্ট না হইতে পারিলে পাপ হইতে মুক্ত হইবার অন্য উপায় নাই। সেই ধর্ম্মের আকর্ষণে ভক্তিবৃদ্ধি করাই প্রধান কার্য্য। সে কার্য্য সুসিদ্ধ করিতে হইলে ধর্ম্মের মনোহর রূপকে বিশিষ্টরূপে দেখা উচিত। দেখিয়া সেই ধর্ম্মপথের পথিক হইতে হইবে। ধর্ম্মপথের পথিক হইয়া ঈশ্বরের শরণাপন্ন হইতে হইবে। অতএব শুধু পাপ-পথের দণ্ডভোগ দেখিয়া সে পথ পরিবর্জ্জন করিলে হইবে না, তৎসঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্মপথ অবলম্বন করিতে হইবে। ধর্ম্মপথ অবলম্বন করিতে হইলে সাধুসঙ্গ একান্ত আবশ্যক। জীবিত সাধুগণের সংসর্গ যাঁহারা লাভ করিতে পারেন, তাঁহাদের অদৃষ্ট বড়ই প্রসন্ন। কিন্তু সাহিত্যানুরাগীর পক্ষে আর একপ্রকার সাধুসঙ্গ আছে। সে সাধুসঙ্গ সাহিত্য-ক্ষেত্রের অসাধারণ সাধুগণের আদর্শ-চরিত্র। সেই আদর্শ-চরিত্রের চিত্রসকল কল্পনার সমক্ষে সর্ব্বদা জাগরূক রাখিলে সাধু-সংসর্গের ফললাভ করিতে পারা যায়।

অভ্যাস ও অধ্যয়ন-ফল।

এই অসামান্য ধর্ম্মাদর্শের চিত্রাবলি আমাদের পুরাণে এবং পৌরাণিক কাব্য-নাটকে। সেই আদর্শের সূত্রপাতে সেই কাব্য-নাটকের উপক্রম। সেই উপক্রম যতই বর্দ্ধিত হইতে থাকে, ততই সেই সূত্রপাতে উত্তরোত্তর উজ্জ্বল হইতে উজ্জ্বলতর বর্ণরাগ পড়ে। পড়িয়া

উপসংহারে তাহা সঞ্জীবিত লোকচরিত্ররূপে প্রতীয়মান হয়। রামায়ণের উপক্রমে যে সীতা জনকালয় হইতে অযোধ্যায় রাজপুরে আনীতা হইলেন, রামের বনবাসকালে সেই সীতা-চরিত্র কতক কতক উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। তৎপরে অশোক-কাননে তাহা আরও উজ্জ্বলতর প্রভায় প্রদীপ্ত হইল। সে সীতা এমনি স্বর্গীয় ভাবে দেবপ্রতিম হইলেন যে, তিনি অগ্নিতেও দগ্ধ হন নাই। অগ্নিতে তাঁহার স্বর্ণরেখা আরও উজ্জ্বলতা লাভ করিল। যাহা এমনি দেবপ্রতিম, তাহা অবশ্যই রক্ষণীয়। তাই রামচন্দ্র তাঁহাকে যত্নে রাজগৃহে লইয়া গিয়া রাজলক্ষ্মী-রূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়া রাখিলেন। কি! সে সীতারও অঙ্গে লোকে কলঙ্কপাত করে! তাই রামচন্দ্র তাঁহার দীপ্তি আরও প্রভাসিত করিবার জন্য তাঁহাকে বনবাস দিলেন; চুপি চুপি জনকালয়ে পাঠাইলেন না। সেই বনবাসে সীতার জীবিত উজ্জ্বলচিত্র আরও বিশুদ্ধতা লাভ করিয়া উঠিল। তখন সে সীতা কি? জগতের আরাধ্যা স্বর্ণময়ী প্রতিমা—যে স্বর্ণময়ী প্রতিমাকে স্বয়ং নারায়ণ রামচন্দ্র স্বর্ণ-সিংহাসনে বসাইয়া প্রতিদিন পূজা করিতেন। সেই স্বর্ণময়ী প্রতিমা রামায়ণের অধ্যয়ন-ফল। রামায়ণের অধ্যয়ন-ফল-রূপে সেই স্বর্ণময়ী প্রতিমা চিরদিন লোকের হৃদয়-সিংহাসনে অধিষ্ঠিত থাকিয়া চিরপূজ্য হইয়া রহিয়াছে।

রামায়ণের অধ্যয়ন-ফল যে স্বর্ণময়ী প্রতিমা, তাহা কিরূপে গ্রন্থ-মধ্যে প্রবৃদ্ধ হইয়াছিল? অযোধ্যাকাণ্ডে তাহার উপক্রম, গ্রন্থের অভ্যাসক্রমে সেই উপক্রম ক্রমশই প্রবৃদ্ধ হইয়া উঠিয়া উপসংহারে এক স্বর্ণময়ী জীবিত প্রতিমারূপে রামায়ণের অধ্যয়ন-ফলস্বরূপ লোকের মনে চিরস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে।

এই অভ্যাস-গুণে যেমন সাধুচরিত্রের শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হয়, তেমনি

অসাধু লোক-চরিত্রে গাঢ় হইতে গাঢ়তর কলঙ্কপাত হয়। ম্যাক্‌-বেথ নাটকের প্রারম্ভে আমরা যে লেডি ম্যাক্‌বেথের উপক্রম দেখি, তাহা গ্রন্থের অভ্যাসবশতঃ এতই প্রবৃদ্ধ হইয়াছে যে, নাটক মধ্যে দুই একটি সাধুচিত্র থাকিলেও সেই লেডি ম্যাক্‌বেথের ঘোর কালি-মায় সকল আভা বিলীন হইয়া গিয়াছে। বিলীন হইয়া এমন মিলা-ইয়া গিয়াছে যে, অবশেষে গ্রন্থের উপসংহারে সেই লেডি ম্যাক্‌-বেথের চিত্রই প্রভাসিত হইয়া লোকের মনে চিরস্মরণীয় হইয়া রহি-য়াছে। সুতরাং তাহাই সেই নাটকের অধ্যয়ন-ফল-স্বরূপ হইয়াছে। সেই অধ্যয়ন-ফল গ্রন্থের অভ্যাসক্রমে উৎপন্ন হইয়াছে।

এই অভ্যাস-দোষে অনেক গ্রন্থের অধ্যয়ন-ফল অতি কদর্য্য হইয়া দাঁড়ায়। বঙ্কিমচন্দ্রের বিষবৃক্ষের উপক্রম তত মন্দ নহে। কিন্তু কুন্দকে নগেন্দ্র লাভ করিয়া যখন গৃহে আসিলেন, তখন হইতে তাঁহার কুপ্রবৃত্তি দেখা দিল। কুন্দও নগেন্দ্রের রূপে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার প্রেমাকাঙ্ক্ষিণী হইল। সেই পাপ-প্রেমের অভিনয় অভ্যাস-বশতঃ ক্রমশই প্রবর্দ্ধিত হইয়া গ্রন্থখানিকে বিষময় করিয়া তুলিল। আবার এরূপও দেখা যায়, গ্রন্থের উপক্রমে পাপচিত্র এবং অভ্যাসেও সেই পাপচিত্রেরই প্রবৃদ্ধি; এত প্রবৃদ্ধি যে তাহাই ক্রমশঃ পাঠকের হৃদয়াধিকার করিয়া ফেলে। সে গ্রন্থের শেষভাগে যদি সামান্যতঃ পুণ্যচিত্র অঙ্কিত হয়, এবং সে পুণ্যচিত্রের তত বৃদ্ধি-সাধন না হয়, তবে তাহার অধ্যয়ন-ফলে সেই পাপাধিকারই প্রবল হইয়া দাঁড়ায়। ম্যাক্‌বেথ-নাটকের এই দশা। শেষভাগের সামান্য পুণ্যচিত্রে কি ম্যাক্‌বেথের অধ্যয়ন-ফলের কিছু ব্যতিক্রমে ঘটিয়াছে? না তাহা পয়োমুখ বিষকুম্ভবৎ হইয়া রহিয়াছে? সুতরাং গ্রন্থের অভ্যাসের দোষ-গুণে তাহার অধ্যয়ন-ফলের দোষগুণ সমুৎপন্ন হইয়া থাকে। উপক্রম

ভাল হইলেও হয় না, যদি অভ্যাসে পাপেরই প্রবৃদ্ধি-সাধন হইয়া থাকে, তবে অধ্যয়ন-ফলে সেই পাপই প্রবল হইয়া দাঁড়াইবে। তদ্দারা ধর্ম্ম-লাভের অত্যল্পই সম্ভাবনা। অতএব, গ্রন্থের সমালোচন-কালে এই অভ্যাসেরই বিচার করিয়া তাহার দোষগুণ নির্ণয় করা উচিত।

এই অভ্যাসগুণে গ্রন্থসকল কিরূপে পূর্ণাবয়বে সম্পূর্ণ হইয়া আইসে? গ্রন্থমধ্যে অনেক অংশ ও অধ্যায় থাকিতে পারে, সেই অংশে ও অধ্যায়ে বিভিন্ন বিষয়ের অবতারণা হইতে পারে, উপন্যাস একের পর অপর ঘটনাসকল দলে দলে উপনীত করিতে পারে, পাত্র ও পাত্রীগণকে সমুপস্থিত করিতে পারে, কিন্তু অভ্যাস সেই সমস্ত গ্রন্থাংশ ও অধ্যায়, সেই ঘটনাজাল এবং পাত্র ও পাত্রীগণকে একই সূত্রে আবদ্ধ করিয়া, একই গ্রন্থব্যাপারে সংযুক্ত করিয়া গ্রন্থের সম্পূর্ণ অবয়ব সম্পন্ন করিয়া আনে। যেমন গঙ্গার তরঙ্গে শত শত নদী আসিয়া মিশিলেও গঙ্গা একই প্রবল ধবল স্রোতে প্রবাহিত হইয়া সেই সমুদয় জলরাশিকে মিশাইয়া লইয়া নিজ বক্ষে ধারণ পূর্ব্বক কখন নাচিতে নাচিতে, কখন প্রবল তরঙ্গ-তুফানে কত দেশ ধ্বংস করিতে করিতে, কত তরণীকে ভাসাইতে ভাসাইতে, কত শব-রাশি বক্ষে লইয়া বিপুল জলৈশ্বর্য্যে সমুদ্রে আসিয়া মিলিত হয়, তদ্রূপ অভ্যাস-প্রভাবে গ্রন্থ, নানা রসাশ্রিত অঙ্গসকলকে একই প্রধান রসে প্রবাহিত করিয়া উপসংহারের ফলমুখী করিয়া আনে। এরূপ করিতে পারিলেই গ্রন্থের অধ্যয়নফল সম্ভবিতে পারে। কিন্তু সেই অভ্যাসে দোষ ঘটিলে সমগ্র গ্রন্থ একেবারে নীরস ও মাটী হইয়া যায়। এ কথা আমরা "রাজর্ষি"-নামক একখানি উপন্যাস-সমালোচনায় সমর্থন করিব।

রবীন্দ্রনাথের রাজর্ষি।

মুখপাত ভাল দেখিয়া যদি কোন গ্রন্থকে ভাল বলিতে হয়, তবে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর-প্রণীত "রাজর্ষি"-নামক গ্রন্থখানি নিশ্চিতই ভাল। যেরূপ উপকরণে ইহার প্রথম ভাগ রচিত, তদ্রূপ উপকরণে যদি ইহার দ্বিতীয় ভাগ গঠিত হইত, তাহা হইলে গ্রন্থখানি অতি উপাদেয় সামগ্রী হইত। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ আমরা সেরূপ উপাদেয় সামগ্রী লাভে বঞ্চিত হইয়াছি। যাহা হউক, গ্রন্থের প্রথম ভাগ ক্ষুদ্র বটে, কিন্তু সেই ক্ষুদ্র আয়তনে একটি ক্ষুদ্র উপন্যাস প্রায় সম্পূর্ণ হইয়াছে। ক্ষুদ্র আয়তন মধ্যে যাহা সম্পূর্ণ হয়, তাহা প্রায় নাটকীয় গুণে অলঙ্কৃত হইয়া পড়ে। ইহার প্রথম ভাগে তাহাই ঘটিয়াছে। কি দৃশ্য-যোজনা, কি ঘটনা-সংস্থান, কি হৃদয়-বেদনা, সর্ব্বাংশেই এ ভাগকে নাটকীয় রসে পরিপূর্ণ করিয়াছে। বালিকা 'হাসি' এ নাটকের প্রথম সূচনা করিয়া দিল। বালিকার তরল হৃদয় ভুবনেশ্বরীর নরবলি-রুধির-স্রোতে সহসা শিহরিয়া উঠিল। সেই শিহরণ যেন তাড়িত-গুণে রাজার হৃদয়কে শিহরিয়া দিল। সেই শিহরণ বালিকার মজ্জায় মজ্জায় আঘাত করিল। বালিকা রোগাক্রান্ত হইয়া অনন্ত শয্যায় বিসর্জ্জিতা হইল। তদবধি রাজার মনে বিষম বেদনা বোধ হইল। তাঁহার হৃদয়দ্বার একদা খুলিয়া গেল। একটি বসন্তকুসুম তাঁহার হৃদয়ে প্রথম প্রস্ফুটিত হইল। সহসা যেন বসন্তানিল হৃদয়ে প্রবাহিত হইল। হৃদয়-তরঙ্গ ফিরিয়া গেল। তাহার স্রোত বিপরীত দিকে বহিল। আজ তিনি যেন আর এক রাজ্যে আসিয়া পড়িলেন। এ চমক এত

সহসা ঘটিল যে, তাহাতে নাটকীয় ভাবের বিলক্ষণ উপলব্ধি হয় এইরূপ হৃদয় পরিবর্ত্তনে তিনি যেন এক মধুময় প্রেমরাজ্য দেখিতে পাইলেন। সেই হৃদয়ে একদা রাজ্যমধ্যে বলিদান উঠাইয়া দিলেন।

একদিন রাজার হৃদয় যেরূপ হঠাৎ ফিরিয়া গিয়াছিল, সেরূপ কয়জন লোকের কয়দিন ঘটে? কিন্তু আমাদের রাজার এক দিন এরূপ ঘটিয়া থামে নাই। প্রেম একবার হৃদয়ে প্রবেশ করিলে, তাহাকে ক্রমেই প্রসারিত করিতে থাকে। গোবিন্দমাণিক্যের হৃদয় তদ্রূপ ক্রমশই প্রসারিত হইয়াছিল। তিনি যখন রাজ্যত্যাগী সন্ন্যাসী হইয়া লোকালয়ের বাহিরে পর্ব্বতশিখরে বসিয়া নির্জ্জনের সুখ ও পবিত্রতা, এবং পার্ব্বত্য দেশের শোভা সম্ভোগ করেন, এমন সময় দেখিলেন "নির্জ্জনে ধ্যানপরায়ণা প্রকৃতি যে স্নেহধারা সঞ্চয় করিতেছে, সজনে লোকালয়ের মধ্যে তাহা নদীরূপে প্রেরণ করিতেছে—যে তাহা গ্রহণ করিতেছে, তাহার তৃষ্ণা নিবারণ হইতেছে; যে করিতেছে না, তাহার প্রতিও প্রকৃতির কোন অভিমান নাই। গোবিন্দমাণিক্য কহিলেন, আমিও আমার এই বিজনে সঞ্চিত প্রেম সজনে বিতরণ করিতে বাহির হইব, এই বলিয়া তাঁহার পর্ব্বতাশ্রম ছাড়িয়া তিনি বাহির হইলেন।" এক্ষণে রাজার হৃদয়রাজ্য কিরূপ প্রসারিত হইয়াছে, গ্রন্থকার তাহার এইরূপ ছবি আঁকিলেন—"পূর্ব্বে যে পৃথিবীকে মাঝে মাঝে মাতৃহীনা বলিয়া বোধ হইত, সেই পৃথিবীকে আনতনয়না চিরজাগ্রত জননীর কোলে দেখিতে পাইলেন। পৃথিবীর দুঃখ শোক দারিদ্র্য, বিবাদ, বিদ্বেষ দেখিলেও তাঁহার মনে আর নৈরাশ্য জন্মিত না। একটিমাত্র মঙ্গলের চিহ্ন দেখিলেই তাঁহার আশা সহস্র অমঙ্গল ভেদ

করিয়া স্বর্গাভিমুখে প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিত। আমাদের সকলের জীবনেই কি কোন না কোন দিন এমন এক অভূতপূর্ব্ব নূতন প্রেম ও নূতন স্বাধীনতার প্রভাত উদিত হয় নাই, যে দিন সহসা এই হাস্যক্রন্দনময় জগৎকে এক সুকোমল নবকুমারের মত, এক অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য প্রেম ও মঙ্গলের ক্রোড়ে বিকসিত দেখিয়াছি! যে দিন কেহ আমাদিগকে ক্ষুব্ধ করিতে পারে না, কেহ আমাদিগকে জগতের কোন সুখ হইতে বঞ্চিত করিতে পারে না, কেহ আমাদিগকে কোন প্রাচীরের মধ্যে রুদ্ধ করিয়া রাখিতে পারে না, যে দিন এক অপূর্ব্ব বাঁশি বাজিয়া উঠে, এক অপূর্ব্ব বসন্ত জাগিয়া উঠে, চরাচর চির-যৌবনের আনন্দে পরিপূর্ণ হইয়া যায়!"

এইরূপ একদিন গোবিন্দমাণিক্যের হৃদয়ে যখন প্রথম বসন্ত উদয় হইয়াছিল, তখন তিনি রাজাদেশ প্রচার করিলেন যে, যে রাজ্যমধ্যে বলি দিবে, তাহার নির্ব্বাসন হইবে। এ কথা শ্রবণমাত্র রাজ-পুরোহিত রঘুপতি অতিমাত্র ক্রুদ্ধ হইলেন। রাজ্যের যে তিন বল থাকে,—ধর্ম্মবল, অর্থবল ও লোকবল,—রাজ-পুরোহিত তাহার অন্যতম। তাঁহার হাতে ধর্ম্মবল। রাজার মন ফিরাইবার জন্য চেষ্টা করিয়া যখন তিনি বিফল হইলেন, তখন তিনি রাজারই বিপক্ষে নিজ বল প্রয়োগ করিতে কৃতসংকল্প হইলেন। রাজ্যমধ্যে এখন দুইটি বলের দ্বন্দ্ব বাঁধিল। এক দিকে ধন ও জন-বলে বলীয়ান্ রাজা, অন্যদিকে ধর্ম্মবলে বলীয়ান্ রাজ-পুরোহিত। এ দ্বন্দ্ব বড় সাধারণ দ্বন্দ্ব নয়। পুরোহিত নিজ বলে সমগ্র প্রজামণ্ডল ক্ষেপাইয়া তুলিলেন। তিনি ভীরু-স্বভাব ও দুর্ব্বলমতি রাজভ্রাতা নক্ষত্ররায় এবং সেবক জয়সিংহকে নিজ অভিসন্ধিসাধনের উপায়স্বরূপ স্থির করিয়া কোন মতে

রাজাকে সরাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। এই ঘোর দ্বন্দ্ব বাঁধিলে রাজাও নিজ আদেশ রক্ষার জন্য স্থির ও অচঞ্চল রহিলেন। তিনি কিছুতে বিচলিত হইবার পাত্র নহেন। যদিও অন্তরে অন্তরে মনুষ্যের প্রেমে তাঁহার হৃদয় গলিয়াছিল, কিন্তু বাহিরে তিনি আগ্নেয়গিরির ন্যায় অটল রহিলেন। শুধু অটল নহে, তিনি কেবল প্রেম-অস্ত্র দিয়া যেরূপে রঘুপতির বাণসকল ব্যর্থ করিতে লাগিলেন, তাহাতে তাঁহার চরিত্রকে গাম্ভীর্য্য ও মহত্ত্বে পরিপূর্ণ করিল। তিনি তাঁহার সাধু উদ্দেশ্যের সৎ সাহসে পূর্ণ হইয়া অতি তেজস্বী হইয়া উঠিলেন। তিনি নির্ভীক হৃদয়ে শত্রুসমক্ষে সহসা উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে স্তব্ধ করিতেন। তাঁহার নিভৃতালয়ে জয়সিংহ তাঁহাকে কাটিতে আসিয়া, শিশুর সহিত তাঁহার প্রেমক্রীড়ায় পরাভূত এবং তাঁহার বিশ্বস্তচিত্ততা ও প্রশান্ত ভাবদর্শনে পরাস্ত হইয়া নিষ্কোষিত অসি দূরে নিক্ষেপ করিল। যে ভ্রাতৃস্নেহে তাঁহার হৃদয় পরিপূর্ণ ছিল, সেই স্নেহে ভ্রাতাকে বদ্ধ করিয়া তাঁহাকে প্রতিকূলাচরণ হইতে নিবৃত্ত করিলেন। এ সকল দৃশ্যাভিনয়ে পাঠকের হৃদয় নিশ্চয়ই সমবেদনায় উদ্বোধিত হয়। পাঠক নাটকীয় রসে পরিপূর্ণ হন।

গ্রন্থের প্রথম ভাগ যে কিরূপ উৎকৃষ্ট হইয়াছে, তাহা আমরা প্রদর্শন করিলাম। এই মুখপাত ভাল দেখাইয়া গ্রন্থকার যেন আমাদের ক্ষুধা আরও উদ্রিক্ত করিয়া দিলেন। সে ক্ষুধা নিবারণ হইল না, ইহাই আমাদের দুঃখ।

গ্রন্থের প্রথমভাগ সমাপ্ত হইলে আমরা এক ভিন্ন রাজ্যে আসিয়া পড়িলাম। এখানে আর এক নূতন দেশ—নূতন দেশে নূতন লোক। বলিতে গেলে দ্বিতীয়ভাগ হইতে আমাদের আর

এক নূতন উপন্যাস আরম্ভ করিতে হইল। অনেক উপন্যাসেরই প্রারম্ভ ভাগ তত সরস হয় না, তাহাতে রসের ঈষৎ সঞ্চারমাত্র হইতে থাকে। অভ্যাসগুণে ক্রমে গ্রন্থ সম্পূর্ণরূপে সরস হইয়া পড়ে। এ গ্রন্থে ঠিক তাহার বিপরীত ঘটিয়াছে। ইহার প্রথম-ভাগ অত্যন্ত সরস, তার পর অভ্যাস-দোষে গ্রন্থ ক্রমশঃ নীরস হইয়া পড়িয়াছে। যেস্থলে রঘুপতির সহিত নক্ষত্ররায় নির্ব্বাসিত হইল, বলিতে গেলে, সেই স্থলেই গ্রন্থ এক প্রকার শেষ হইয়াছে। তার পর, গ্রন্থ ক্রমশঃ নীরস হইয়া আসিয়াছে। তার পর, প্রায় দুইশত পৃষ্ঠায় চক্ষু বুলাইয়া জানিলাম কি না, রঘুপতি মন্ত্রণা করিয়া নক্ষত্ররায়কে ত্রিপুরার সিংহাসনে বসাইবার চেষ্টা করিলে, গোবিন্দ-মাণিক্য সে সিংহাসন পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হইলেন। দুই কথায় এটুকু বলিয়া দিলেই যথেষ্ট হইত। তজ্জন্য গ্রন্থকে অনর্থক এত বিস্তৃত করিবার প্রয়োজন ছিল না। যদি দেখিতে পাইতাম, এই বিস্তারিত ক্ষেত্র মধ্যে ঔপন্যাসিক পাত্রগণের অধিকতর চরিত্র-স্ফূর্ত্তি হইয়াছে, অথবা গ্রন্থ ক্রমশই সরস হইয়াছে, তাহা হইলে আমাদের শ্রম সফল হইত। রঘুপতির নির্ব্বাসন হইতে গোবিন্দ-মাণিক্যের সিংহাসন-ত্যাগ পর্য্যন্ত রাজর্ষি-চরিত্রে একটিমাত্রও রেখাপাত হয় নাই। আমরা যেখানে রাজাকে রাখিয়া আসিয়াছিলাম, সেইখানেই তাঁহাকে পরিত্যাগ করিলাম। রাজার হৃদয়ে যে প্রেমাঙ্কুর প্রস্ফুরিত হইয়াছিল, কই সে অঙ্কুর আর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইল না! রাজকার্য্যের দুই বৎসরে তাঁহার প্রেমের বিস্তার কিছুই হয় নাই। তাঁহার সংসারের দিকে চাই, দেখি, তাঁহার পুত্র নাই, কলত্র নাই, দাস দাসী নাই, ভ্রাতৃজায়া নাই, রাজপরিবারের কেহই নাই। পরিবার-ক্ষেত্রেই মানুষের প্রেমরাজ্য ক্রমশঃ প্রস্ফুরিত

হইতে থাকে। গোবিন্দমাণিক্যের সে ক্ষেত্র মরুভূমিপ্রায় ছিল। ধার-করা একটি পালিত শিশুমাত্রে কি আমাদের সমুদায় পারিবারিক স্নেহ ও বৃত্তি সন্তৃপ্ত করিতে পারে? তিনি পারিবারিক ক্ষেত্র কিছুই কর্ষিত করেন নাই। আবার দেখুন, গোবিন্দমাণিক্য প্রথমভাগে যেরূপ চরিত্রদৃঢ়তা, সৎসাহস, দৃঢ়প্রতিজ্ঞা, অপক্ষপাতিতা, ঔদার্য্য প্রভৃতি গুণের পরিচয় দিয়াছিলেন, তার পর দুই বৎসর রাজকার্য্য পরিচালনে কি তাহার কিছুরই স্ফূর্ত্তি হয় নাই? গ্রন্থকার ঘটনাবলিকে এরূপে সাজাইতে পারেন নাই, যাহাতে তিনি সে সকল গুণের অধিকতর পরিচয় দিবার স্থল পান। ঘটনা-যোজনায় তাঁহার সৃষ্টিশক্তি অতি দীন। শুদ্ধ রাজর্ষি সম্বন্ধে আমরা বলি না। রঘুপতির বুদ্ধিকৌশল, কুচক্রিতা, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, দৃঢ়-সংকল্প ও অধ্যবসায় প্রভৃতি গুণ আমরা প্রথমভাগে যেরূপ দেখিয়াছিলাম, দ্বিতীয়ভাগে তাহার অধিক দেখি নাই। দ্বিতীয়ভাগে রঘুপতি নিজ অভিসন্ধি সাধন জন্য যত কৌশল করিয়াছিলেন, সে সমস্ত কৌশলই বিফল হইয়াছিল। তিনি কেবল রাজপ্রদত্ত অর্থবলে কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন। কৌশল যদি অকৃতকার্য্য হয়, তবে কি প্রয়োগকারীকে তত কৌশলী বলা যায়? যে কৌশল সফল না হয়, সে কৌশলপ্রয়োগে লোকে অনেক সময় হাস্যাস্পদ হইয়া পড়ে। মোগল-শিবিরে রঘুপতিও কিয়দংশে হাস্যাস্পদ হইতে-ছিলেন, এমন সময় অর্থবল তাঁহাকে রক্ষা করিল। আর, দুর্ব্বল-মতি ভীরুস্বভাব, অসারচিত্ত ও বিলাসী নক্ষত্ররায়কে পরিচালনে যে সামান্য কৌশলের পরিচয় হইয়াছিল, তাহাতে রঘুপতির বিশেষ বাহাদুরি হয় নাই, এবং তাঁহার চরিত্রও কিছু উন্নত হয় নাই।

দ্বিতীয়ভাগে কেবল নক্ষত্ররায়ের চরিত্র কিছু পরিস্ফুট হইয়াছে। নক্ষত্ররায় এবং গোবিন্দমাণিক্য উভয়ই রাজপুত্র, উভয়েরই হস্তে রাজৈশ্বর্য্য। নক্ষত্র সেই ঐশ্বর্য্য আপনার ইন্দ্রিয়-সেবায় ব্যয় করিয়া একজন ঘোর বিলাসী হইয়াছিলেন, কিন্তু গোবিন্দমাণিক্য সেই ঐশ্বর্য্যধামে ও সেই ভোগ এবং প্রলোভনপূর্ণ সংসারে কেমন প্রশমিতচিত্তে ঋষির ন্যায় ত্যাগী ও নির্লিপ্ত হইয়া এক উৎকৃষ্ট চরিত্রের অভিনয় করিতেছিলেন, তাহা গ্রন্থকার যদি পাশাপাশি দেখাইতে পারিতেন, তাহা হইলে পাপচিত্রের কলঙ্ক এবং পুণ্যচিত্রের পবিত্রতা শতাংশে বর্দ্ধিত হইত। এ গ্রন্থে এ দুয়ের কিছুই হয় নাই। নক্ষত্ররায়ের বিলাসচিত্র দ্বিতীয় ভাগের নগ্নক্ষেত্রে একাকী দাঁড়াইয়া আছে। তাহার পার্শ্বে ঋষিচরিত্র অঙ্কিত নাই। তাহার পাপচিত্রের মলিনতা পুণ্যচিত্রে বর্দ্ধিত হয় নাই। এরূপে এ পাপচিত্র দেখাইবার প্রয়োজন কি ছিল? এ চরিত্র এত উচ্চ নহে যে, ইহার গরিমা প্রকাশ করিতে হইবে। ফলতঃ এ চিত্র অতি সামান্য। গ্রন্থকার এ চিত্র আঁকিতে গিয়া সহরের বড় মানুষের একটি বয়াটে ছেলের একখানি ফটোগ্রাফ দিয়াছেন। তাহা ত আমরা দুবেলা দেখিতেছি। সে ফটোগ্রাফ আমাদের সম্মুখে ধরিয়া আর বেশি কি ফল হইবে?

গ্রন্থের নাম রাজর্ষি। সুতরাং এ গ্রন্থে রাজর্ষি-চরিত্রের সম্যক্ স্ফূর্ত্তি ও সু-অঙ্কিত চিত্রেরই সকলে প্রত্যাশা করিয়া থাকেন। যে রাজ-ভোগ ভোগের চূড়ান্ত, জনকরাজ সেই রাজভোগ মধ্যে অবস্থিত হইয়া অনাসক্ত ও ত্যাগী ঋষিচরিত্র সংগঠন করিয়াছিলেন, এবং সেই ভোগের মধ্যে নিতান্ত নিঃস্পৃহ ভাবে সমুদায় রাজ-কার্য্য সম্পাদন করিতেন। যে অনুমান জনকের কল্পনা পূর্ণ

করিয়াছে, সেই অনুমান রাম-রাজত্বেরও কল্পনা পূর্ণ করিয়াছে। রাম-চন্দ্রকে ব্যাস মহাভারতে ব্রহ্মার মুখ দিয়া "রাজর্ষিধর্ম্মা" বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন ; শুনিয়াছি সেই রাজর্ষিপ্রতিম রামের রাজ্য বড় সুখের রাজ্য ছিল। রাজর্ষি রাম তাহা কিরূপে এত সুখময় করিয়াছিলেন, রামায়ণে যদিও তাহার বিশেষ ঐতিহাসিক বিবরণ নাই, কিন্তু কাব্য-বিভ্রমগুণে, সেই কাব্যের ঘটনাবলি-অঙ্কিত সরস চিত্রে আমাদের কল্পনা এত পূর্ণ হয় যে, আমরা অনুমানে যেন রাম-রাজত্বের সুখানুভব করিতে পারি। এই সমালোচ্য গ্রন্থেও আমরা নীরস ঐতিহাসিক বিবরণ খুঁজি নাই, কিন্তু রাজর্ষির ঔপন্যাসিক চিত্র দেখিতে চাহিয়াছিলাম। গ্রন্থকার যাঁহাকে রাজর্ষি বলিয়াছেন, তাঁহার চরিত্র প্রথমে তিনি যেরূপে আঁকিলেন, তাহাতে বড়ই আশা হইয়াছিল, বুঝি পরে রাজর্ষিচরিত্র দেখিতে পাইব। কিন্তু হায়, সে আশা বৃথা! গ্রন্থকার এমন ক্ষেত্র বিন্যস্ত করিতে পারেন নাই, যে ক্ষেত্রে তিনি রাজর্ষির গুণাবলির ক্রীড়া দেখাইতে পারেন ; কিরূপ গুণের সমাবেশ হইলে একজন রাজা রাজর্ষি হইতে পারেন, গ্রন্থকার তাহা দেখাইতে পারেন নাই। পূর্ব্বকালে এই ভারতবর্ষে অনেকে রাজমুকুট ধারণ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু রাজর্ষি কয়জন ছিলেন? ঋষির চরিত্র ব্রাহ্মণ-অঙ্গে সাজিয়াছিল, রাজার চরিত্র ক্ষত্রিয়-অঙ্গে শোভা পাইত। ব্রাহ্মণ-ঋষির গুণাবলি ক্ষত্রিয়রাজ-অঙ্গে সমাবিষ্ট হইলে, রাজা যদি প্রধান প্রধান রাজগুণ বিসর্জ্জন দিয়া সম্যক্‌ভাবে ব্রাহ্মণ-ঋষি হইয়া পড়েন, তাহা হইলে কি তাঁহাকে রাজর্ষি বলিব? না, যে ব্রাহ্মণ দ্রোণা-চার্য্যের মত ক্ষত্রিয়ধর্ম্মে শোভিত হইয়া নিজে ব্রাহ্মণের গুণাবলি বিসর্জ্জন দেন, তাঁহাকে ঋষি বলিব? তবে যিনি ঋষির ধর্ম্ম ও

রাজার ধর্ম্ম একত্র ধারণ করিতে পারেন, যিনি এই দুঃসাধ্য ব্রতে সিদ্ধ হইতে পারেন, তিনি যে একজন অসাধারণ রাজা, তাহার আর অণুমাত্র সন্দেহ নাই। এরূপ রাজা কেবল ভারতেই জন্মিয়াছিল। এরূপ রাজা, রাজগণের চূড়ামণি ও আদর্শ। এরূপ রাজা লাভ করা, এই জন্য অত্যন্ত দুর্লভ। ঋষি, ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠ; রাজা, ক্ষত্রিয়ের শ্রেষ্ঠ। রাজর্ষি, এই দুই শ্রেষ্ঠতার মিলন। পূর্ব্বকালে রাজর্ষির অঙ্গে ঋষি ও রাজার গুণাবলি কেমন একত্র মিশিয়াছিল, তাহা অনুমান করিতেও একটু আনন্দ আছে। এরূপ গঙ্গা-যমুনার মিলন-দৃশ্য বড়ই সুন্দর। আমরা মনে মনে ভাবিয়াছিলাম, রাজর্ষির গ্রন্থকার বুঝি সেই সুন্দর মিলন-দৃশ্য দেখাইবেন—ঔপন্যাসিক ক্ষেত্রে একটি মনোমত রাজর্ষি-চিত্র গড়িয়া দিবেন। রাজর্ষি বলিলেই আমাদের মনে যে এক প্রকার অভূতপূর্ব্ব ভক্তিরসের সঞ্চার হয়, আজ বুঝি সেই ভক্তিরসের আস্পদ লাভ করিব। কিন্তু গ্রন্থকার যাঁহাকে রাজর্ষি বলিয়াছেন, তাঁহাকে দেখিয়া আমাদের সে ভক্তির উদয় হয় নাই। রাজর্ষির কোন্ গুণ গোবিন্দমাণিক্যের চরিত্রে পাওয়া যায়? তিনি কি জাপক ছিলেন, না যাজ্ঞিক ছিলেন, না ব্রহ্মবিৎ ও জ্ঞানী ছিলেন? এইরূপ থাকিয়া তিনি কি ত্যাগী ঋষি-চরিত্রে রাজগুণ মিশাইয়াছিলেন? তিনি কি বীরের অঙ্গে ঋষির শান্তভাব মিশাইয়াছিলেন? তিনি একজন সাধু ও সদাশয় লোক বলিয়া গণ্য হইতে পারেন। কিন্তু সাধু ও সদাশয় লোক হইলেই কি ভাল রাজা হইতে পারে? সাধু লোকেই যে ভাল রাজা হইতে পারে, এরূপ সচরাচর ঘটে না। গোবিন্দমাণিক্যই এ কথার জাজ্বল্যমান প্রমাণ। যে রাজ-অঙ্গে প্রধান প্রধান রাজগুণেরই সমাবেশ নাই, তিনি কিরূপে রাজ-

আদর্শ রাজর্ষি নামে সম্মানিত হইতে পারেন? গোবিন্দমাণিক্য রাজা ছিলেন সত্য, কিন্তু প্রধান প্রধান রাজগুণ তাঁহাতে কি ছিল? প্রজারঞ্জন করা রাজার যে প্রধান ধর্ম্ম, সেই ধর্ম্মই তাঁহার ছিল না। তিনি কেমন প্রজারঞ্জন করিয়াছিলেন, এই দেখুন গ্রন্থকার তাহা নিজ মুখেই পরিচয় দিতেছেন ;—

"পূর্ব্বদ্বার দিয়া সৈন্যসামন্ত লইয়া নক্ষত্রমাণিক্য রাজধানীতে প্রবেশ করিলেন। কিঞ্চিৎ অর্থ ও গুটিকতক অনুচর লইয়া পশ্চিমদ্বারাভিমুখে গোবিন্দমাণিক্য যাত্রা করিলেন। নগরের লোক বাঁশি বাজাইয়া ঢাক ঢোলের শব্দ করিয়া হুলুধ্বনি ও শঙ্খধ্বনির সহিত নক্ষত্ররায়কে আহ্বান করিল। গোবিন্দমাণিক্য যে পথ দিয়া অশ্বারোহণে যাইতেছিলেন, সে পথে কেহই তাঁহাকে সমাদর করা আবশ্যক বলিয়া বিবেচনা করিল না। দুই পার্শ্বের কুটীর-বাসিনী রমণীরা তাঁহাকে শুনাইয়া শুনাইয়া গালি দিতে লাগিল। ক্ষুধায় ও ক্ষুধিত সন্তানের ক্রন্দনে তাহাদের জিহ্বা শাণিত হইয়াছে। পরশু গুরুতর দুর্ভিক্ষের সময় যে বৃদ্ধা রাজদ্বারে গিয়া আহার পাইয়াছিল এবং রাজা স্বয়ং যাহাকে সান্ত্বনা দিয়াছিলেন, সে তাহার শীর্ণ হস্ত তুলিয়া রাজাকে অভিশাপ দিতে লাগিল। ছেলেরা জননীর কাছ হইতে শিক্ষা পাইয়া বিদ্রূপ করিয়া চীৎকার করিতে করিতে রাজার পিছন পিছন চলিল। দক্ষিণে বামে কোন দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া সম্মুখে চাহিয়া রাজা ধীরে ধীরে চলিতে লাগিলেন।"

কেবল বাকি ছিল তবে কুলার বাতাস দিয়া তাঁহাকে বিদায় করা। এই তাঁহার প্রজারঞ্জনের চিহ্ন! গ্রন্থকার বলিতে পারেন যে, গোবিন্দমাণিক্য নরবলি রহিত করিয়াছিলেন বলিয়া প্রকৃতি-বর্গের এত বিরাগভাজন হইয়াছিলেন, দেশমধ্যে দুর্ভিক্ষ ঘটাতে

সেই বিরাগ দ্বিগুণ বর্দ্ধিত হইয়াছিল, সুতরাং প্রজাকুল তাঁহাকে সেই দুর্ভি:ক্ষর কারণ জানিয়া অভিশাপ ও গালি বর্ষণ করিয়াছিল। এ কথা ঠিক হইলেও হইতে পারে। কিন্তু গ্রন্থকার কি ইতিহাস লিখিতেছিলেন; না কাব্য গড়িতেছিলেন? রাজর্ষিচরিত্র গড়া যদি তাঁহার অভিপ্রেত হয়, তবে ত তিনি গ্রন্থভাগ্যকে অবশ্য অন্যরূপেও দেখাইতে পারিতেন। হিন্দুকল্পনা রামের পুণ্য রাজত্ব-কালে রাজ্যমধ্যে কোন দৈব দুর্ঘটনা অনুমান করিতে পারে নাই। জনকরাজের রাজ্যমধ্যেও কোন অশান্তি ঘটে নাই। আমাদের রাজর্ষির রাজ্যে অশান্তি প্রবেশ লাভ করিল কেন? গ্রন্থকার এ কল্পনা না করিলেই ভাল হইত। আবার দেখুন, যে দেশে নর-বলি হইত, সেই নরবলি নিবারণ হইলে কি সে দেশের সমস্ত লোক ক্ষেপিয়া উঠে, না ঠিক ইহার বিপরীত ঘটে? আমাদের অনুমান হয়, সে দেশের অনেক লোকেই সন্তুষ্ট হইবে। তা যদি হয়, তবে প্রজাকুলের যে ভাগ সন্তোষলাভ করিয়াছিল, তাহাদের সন্তোষের পরিচয় কই? আর রাজ-পুরোহিতের উত্তেজনায় যে ভাগ রুষ্ট হইয়াছিল, রাজর্ষির নিজগুণে এবং রাজত্বের সুখবিধানে, তাহারা সে রোষ ভুলিয়া যায় নাই কেন? গোবিন্দমাণিক্য যদি ভাল করিয়া প্রজারঞ্জন করিতে জানিতেন, যদি প্রজাকুলের কেবল সুখ ও শান্তি দেখিতেন, তাহা হইলে অবশ্য তাহাদের অনুরাগভাজন হইতেন। তাহারা সকল ভুলিয়া গিয়া তাঁহাকে অনুক্ষণ আশী-র্ব্বাদ করিত। নরবলি নিবারণ হওয়াতে প্রকৃতিবর্গ যদি এতই ক্ষেপিয়া থাকে, তবে তাহারা সেই বলি নক্ষত্রের সময়ে পুনঃ স্থাপিত করে নাই কেন? আবার ভুবনেশ্বরীর মন্দির ধুমধামে পূর্ণ হয় নাই কেন? রঘুপতির আশা মিটে নাই কেন? সে যাহা হউক,

যে রাজার রাজ্যে প্রজাকুল সুখে না থাকে, এবং রাজার মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী না হয়, সে রাজ্য কি রাজর্ষির রাজ্য? যে রাজার রাজ্যে প্রজার শান্তি নাই, তাহা কি রাজর্ষির রাজ্য হইতে পারে? হিন্দু-কল্পনা এমন অনুমান করিতে পারে না।

প্রজারঞ্জনে গোবিন্দমাণিক্য কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন, তাহা প্রদর্শিত হইল। এক্ষণে আর একটি প্রধান রাজ-গুণের কথা বলিব। রাজ্য ও প্রজাকুলকে রক্ষা করা রাজার আর এক প্রধান ধর্ম্ম। সে ধর্ম্মে গোবিন্দমাণিক্য কেমন ভূষিত ছিলেন, তাহা নক্ষত্রমাণিক্য কর্ত্তৃক রাজ্য-আক্রমণ-সময়ে প্রকাশিত হইয়াছে। তিনি তখন ধীরে ধীরে রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া পলাইয়া গেলেন। যে রঘুপতি ও নক্ষত্ররায়কে দুই বৎসর পূর্ব্বে প্রবল দর্পে আট বৎসরের জন্য রাজ্য নির্ব্বাসন-দণ্ড বিধান করিয়াছিলেন, আজি কি বলিয়া সেই কাল পূর্ণ হইবার পূর্ব্বেই তাহাদিগকে রাজ্য মধ্যে তিনি প্রবেশ করিতে দিলেন? কই, এখন তাঁহার সে তেজস্বিতা ও বলদর্প কই? সে দৃঢ়তা ও ন্যায়পরায়ণতা কই? রাজার কি এই ধর্ম্ম! গোবিন্দ যে প্রেম-অস্ত্রে পূর্ব্বে শাণিত অসিতে প্রতিরোধ করিয়াছিলেন, এখনও তিনি প্রথমে সেই প্রেম-অস্ত্র—ভ্রাতৃস্নেহের সেই কোমল অস্ত্র—প্রয়োগ করিতে অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু যখন দেখিলেন, সে অস্ত্র নিষ্ফল, তখন তিনি বিনা রক্তপাতে রাজ্য ত্যাগ করিয়া গেলেন। এরূপ কার্য্যে গৌরব ও মহত্ত্ব আছে বটে, কিন্তু রাজার পক্ষে নহে। এ কার্য্যে সাধুর গৌরব আছে বটে, কিন্তু রাজার পৌরুষ নাই। সিংহাসনের পথ কুসুমাস্তীর্ণ নহে। কেবল দুগ্ধফেননিভ শয্যায় শায়িত থাকিয়া রাজমুকুট ধারণ করা যায় না। এইরূপ শয্যায় শায়িত থাকিয়া

একদিন বঙ্গাধিপ এইরূপ সময়েই রাজবাটীর পশ্চাদ্দ্বার দিয়া পুরুষোত্তমে পলাইয়া গিয়াছিলেন। এইরূপ সময়ে রাজা গোবিন্দমাণিক্য নগরের পশ্চিম দ্বার দিয়া আস্তে আস্তে বনবাসে গেলেন। বঙ্গাধিপ যবনের নৃশংস কবলে দেশকে সমর্পণ করিয়া গিয়াছিলেন, গোবিন্দমাণিক্যও তদ্রূপ ত্রিপুরা-রাজ্য একজন অসার বিলাসীর হস্তে পরিত্যাগ করিয়া গেলেন। যে বাহুবলে একদা তিনি দণ্ডবিধান করিয়াছিলেন, আজ সে বাহুবল কোথায়? তিনি কি বলিয়া রাক্ষসের হস্তে সন্তানদিগকে সমর্পণ করিয়া গেলেন! ইহাতে কি তাঁহার প্রেম পরিতৃপ্ত হইল! রাজা কি তখন এই অসিপূর্ণ রক্তময় সংসার ত্যাগ করিয়া বনবাসের প্রেমরাজ্যে যাইতেছিলেন? যদি তাহাই হয়, তবে কি তাঁহার একবার ভাবিয়া দেখা উচিত ছিল না যে, তাঁহার অবর্ত্তমান অবস্থায় ত্রিপুরার দশা কি হইবে? তিনি যাইলে যে ত্রিপুরা কেবল ক্রন্দনে পূর্ণ হইবে! সে ক্রন্দন যদি তিনি নিবারণ করিতে পারিতেন, তাহা হইলে তাঁহার কি গৌরব ও মহত্ত্ব হইত না? সে ক্রন্দন নিবারণ করা কি তাঁহার কর্ত্তব্য ছিল না? সে ক্রন্দন নিবারণ করিতে পারিলে কি তিনি সুখী হইতেন না, তাঁহার প্রেমের পরিতৃপ্তি সাধন হইত না? তিনি একদিকে দেশকে ক্রন্দনে ভাসাইয়া গেলেন, অন্য দিকে তাঁহার প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ দুই দশটা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সৎকার্য্য করিতে গেলেন। ত্রিপুরা-রাজ্যের ক্রন্দন-রোল কি একবারও তাঁহার সন্ন্যাসাশ্রমে প্রবেশ করে নাই? যদি সে ক্রন্দনধ্বনি তাঁহার সন্ন্যাসাশ্রমের শান্তিভঙ্গ করিয়া থাকে, তবে তিনি কি বলিয়া স্থির হইয়াছিলেন? কিরূপে তিনি হৃদয়-বেদনা শান্ত করিয়াছিলেন? কিরূপে তাঁহার প্রেমের ব্রত পালিত

হইতেছিল? গ্রন্থমধ্যে এ সমস্তার মীমাংসা কোথায়? যে রাজা প্রজা-রঞ্জন করিতে অসমর্থ, রাজ্য ও প্রজাকুলকে রক্ষা করিতে অক্ষম, তিনি কিরূপ রাজা? যাঁহাতে প্রধান প্রধান রাজগুণ ও ঋষিধর্ম্ম নাই, তিনি কিরূপে আদর্শরাজ রাজর্ষি হইতে পারেন? রাজর্ষিরা কি গোবিন্দ-মাণিক্যের ন্যায় একজন কাপুরুষের মত রাজ্য ও প্রজাকুলকে ভাসা-ইয়া দিয়া চলিয়া যান? জনকরাজ কি রাজ্য ত্যাগ করিয়া গিয়া-ছিলেন? না তিনি রাজ্যে অবস্থান করিয়া রাজদণ্ড বহন পূর্ব্বক রাজছত্রে শোভিত হইয়া রাজর্ষি নামে সম্মানিত হইয়াছিলেন? মহাত্যাগী শ্রীরামচন্দ্রও কি রাজত্বকালে প্রিয়তমা সীতা সতীকে বনবাস দিয়া প্রজারঞ্জন করেন নাই? যদি বল, রাজা হইয়া রাজ-সিংহাসন পরিত্যাগ করিতে পারিলে রাজর্ষি হওয়া যায়, তবুও গোবিন্দমাণিক্য রাজর্ষি নহেন। তিনি রঘুপতির জ্বালায় কিছু-কালের জন্য সিংহাসন ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন মাত্র, সে ত্যাগ তাঁহার স্বেচ্ছাকৃত নহে। তিনি পরে আবার সেই সিংহা-সন গ্রহণ করিয়াছিলেন। সন্ন্যাসক্ষেত্রে তাঁহার অনেক দূর জ্ঞান ও চরিত্রবিকাশ হইতেছিল বটে, কিন্তু তখন তিনি আর রাজা নাই। সন্ন্যাসক্ষেত্রে তিনি যেরূপ কার্য্য করিয়াছিলেন, তাহা সন্ন্যাসীর কার্য্য, রাজার কার্য্য নহে; সুতরাং তাহা রাজর্ষির কার্য্য নহে। সে কার্য্যে তাঁহার প্রেমের বিকাশ হইতেছিল বটে, কিন্তু তাহাতে রাজগুণের কিছুমাত্র বিকাশ হয় নাই। যদি বিকাশ হইয়া থাকে, গ্রন্থকার তাহা দেখাইলেন কই? সন্ন্যাসক্ষেত্র হইতে ফিরিয়া আসিয়া তিনি পুনরায় রাজ্যগ্রহণ করিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু কিরূপে রাজর্ষির ন্যায় রাজ্য করিয়াছিলেন, তাহা ত গ্রন্থকার দেখাইলেন না। যেখানে তাহা দেখাইবার অবসর হইল, গ্রন্থকার

সেখানে একেবারে পট প্রক্ষেপ করিয়া দিলেন। রাজর্ষির চরিত্র তিনি কোনখানে আঁকিতে পারিলেন না। না সিংহাসনত্যাগের পূর্ব্বে, না তাহা পুনর্গ্রহণের পর। সুতরাং রাজর্ষির চিত্র সম্যক্ রূপে অসম্পূর্ণ রহিল। আমরা এ গ্রন্থে একজন সামান্য সাধু লোকের চরিত্র চাই না, রাজর্ষির চরিত্র চাই।

উপন্যাসের মন্ত্রণা-কল্পনার দোষে অপরাপর পাত্রগণেরও চরিত্র স্ফূর্ত্তি পায় নাই। সুলিখিত উপন্যাসের গুণ এই যে, তাহাতে অভ্যাস-গুণে ঘটনাস্ফূর্ত্তির সহিত উপন্যাস ক্রমে সরস হইতে থাকে। যে উপন্যাসের প্রারম্ভে পাত্রগুলির কেবল বাহ্য রেখা পড়ে, সেই উপন্যাসের কলেবর-বৃদ্ধির সহিত পাত্রগণের চিত্রফলক ক্রমশঃ বর্ণ-গৌরবে পুরিয়া উঠিতে পারে। অযোধ্যাকাণ্ড পর্য্যন্ত, বলিতে গেলে, রামায়ণের একভাগ শেষ হইয়াছে। সেখানে আমরা দশরথ, কৈকেয়ী প্রভৃতির চরিত্র এক প্রকার শেষ করিয়াছি। কিন্তু ঐ চরিত্রগুলি যেমন শেষ হইল, অন্য কতিপয় চরিত্রের কেবল প্রারম্ভমাত্র দেখিলাম। রাম, লক্ষ্মণ, সীতা, ভরত প্রভৃতি চরিত্রের অঙ্কপাত মাত্র দেখিলাম। ক্রমশঃ এই পাত্রগণের চরিত্র-গৌরব বাড়িতে লাগিল। শুদ্ধ ইহাদিগের নয়, উপন্যাস-বিকাশের সহিত সুগ্রীব, হনুমান্, বিভীষণ প্রভৃতি অনেক নূতন নূতন পাত্রেরও উদয় হইল। শুদ্ধ উদয় নয়, তাহাদিগের সহিত পরিচয় হইল এবং ঘনিষ্ঠতা বাড়িল। এতদূর ঘনিষ্ঠতা জন্মিল যে, তাহাদিগকে তন্ন তন্ন করিয়া বিশদরূপে দেখিতে পাইলাম। কিন্তু এ গ্রন্থে কি তাহা ঘটিয়াছে? এ গ্রন্থের প্রথমে আমরা যে সকল চরিত্র লইয়া উপন্যাস আরম্ভ করি, সেই রঘুপতি, রাজর্ষি জয়সিংহ ও নক্ষত্ররায়ের বিষয় লইয়া আমরা দেখাইয়াছি, গ্রন্থকার

তাহাদিগের চরিত্র গ্রন্থের দ্বিতীয়ভাগে কিরূপ প্রস্ফুটিত করিয়াছেন। দ্বিতীয়ভাগে অনেক নূতন লোকের সহিত আমাদের আলাপ পরিচয় হইল। কিন্তু তাহাদিগের ভাগ্য উপন্যাসের সহিত অধিক সংশ্লিষ্ট হয় নাই। তাহাদের চরিত্রাঙ্কনও এত উচ্চ দরের ও ভাস্বর নহে যে, তাহাতে পাঠকের চিত্ত অধিকার করিতে পারে। তাহারা ছায়ার মত আসিল, ছায়ার মত চলিয়া গেল। তাহাদের চিত্র মনে কিছুই অঙ্কিত হইল না।

এ গ্রন্থে পাত্রগণের যেরূপ চরিত্র-দোষ ঘটিয়াছে, তাহা আমরা বলিলাম। এক্ষণে আর একটী প্রধান দোষের কথা বলিয়া প্রস্তাব সমাপ্ত করিব। গ্রন্থে রসের খেলা খুব কম। এ গ্রন্থের একমাত্র রস হিংসা। এই হিংসার খেলা একবারমাত্র বাড়িয়াছিল। গ্রন্থের প্রারম্ভে এই হিংসা জোর করিয়া উঠিয়াছিল। রঘুপতির বিদ্বেষভাব যত প্রতিরুদ্ধ হইতেছে, জয়সিংহ ও নক্ষত্ররায় তাহা যতই বিফল করিতেছে, পাঠকের মনে তাহাদের ঘাত-প্রতিঘাত ততই লাগিতেছে। ঘাত-প্রতিঘাতেই রসের বৃদ্ধিসাধন হয়। কিন্তু যে উপাখ্যানে ঘটনার বিরোধ নাই, যাহাতে প্রকৃতির সহিত প্রকৃতির সংগ্রাম নাই, হৃদয়ের বিপক্ষে হৃদয়ের যুদ্ধ নাই, তরঙ্গ তুফান নাই, সে উপাখ্যান নিতান্ত রসহীন। রঘুপতি সংকল্প করিতেছে, কিন্তু তাহার সংকল্প প্রতি হাতে যেমন বিফল হইতেছে, অমনি তাহার হৃদয়ে প্রতিঘাত লাগাতে সেই হৃদয় আবার কেমন নিজ সংকল্প সিদ্ধির উদ্দেশে ধাবিত হইতেছে,—এই উদ্যোগে এবং এই হৃদয়ের খেলাতে পাঠকেরও হৃদয় একটু নাচিয়াছিল। কিন্তু সে নৃত্য ও তরঙ্গ রঘুপতির নির্ব্বাসনে শেষ হইল। সেই যে শেষ হইল, আর দেখা দিল না। তাহার পর রঘুপতি বুদ্ধি ও

অর্থবলে গোবিন্দের সহিত সংগ্রাম বাধাইবার চেষ্টা করিলেন মাত্র। সে সংগ্রাম বাধিল না। সুতরাং গ্রন্থ একেবারে নীরস হইয়া পড়িল। বিল্বন ঠাকুরকে গ্রন্থকার একটু তুলিতেছিলেন, কিন্তু বিল্বনের সমর-চেষ্টা বিফল হওয়াতে তিনিও মন হইতে ছায়ার মত অদৃশ্য হইলেন। গ্রন্থ যেমন একটু সরস হইতেছিল, অমনি তাহা শুকাইয়া গেল। নির্ব্বাসনের পর গোবিন্দমাণিক্যের বিরুদ্ধে রঘুপতির উদ্যোগে কিছুই রসের খেলা নাই। অথচ এই উদ্যোগই গ্রন্থের অধিক ভূমি অধিকার করিয়াছে। সুতরাং গ্রন্থের অধিকাংশই নীরস হইয়া পড়িয়াছে।

গ্রন্থের উপসংহার কিরূপ হইয়াছে, তাহার আলোচনা এ প্রস্তাবের অধিকারভুক্ত নহে, এমন্ত সে বিষয় হইতে বিরত হইলাম। কিন্তু যে পর্য্যন্ত সমালোচনা হইল, তদ্দ্বারা প্রতীত হইতেছে যে, গ্রন্থের অভ্যাস-দোষ বশতঃ তাহার অধ্যয়নফলেও বিস্তর দোষ ধরিয়াছে। বাঙ্গালা সাহিত্যে এখন এইরূপ দোষগ্রস্ত অনেক নাটক-নভেল প্রকাশিত হইতেছে। তন্মধ্য হইতে আমরা কেবল একখানি একজন প্রসিদ্ধ লেখকের গ্রন্থ বাছিয়া লইয়া বিস্তারিত সমালোচনায় তাহার অভ্যাস-দোষ দেখাইলাম। এই দোষ বশতঃ এ গ্রন্থের যেমন অধ্যয়নফল দূষিত হইয়াছে, তদ্রূপ সেই সকল নাটক-নভেলেরও অধ্যয়নফল দূষিত। সুতরাং অধ্যয়ন-ফলের এইরূপ দোষ ঘটিলে গ্রন্থের অভ্যাস পরীক্ষা করিলেই প্রতীত হইবে, তাহার সংগঠনই একান্ত দূষণীয় হইয়াছে।

গ্রন্থের অপূর্ব্বতা।

অভ্যাস-ক্রমে অপূর্ব্বতার উদয়।

গত প্রস্তাবে আমরা সাহিত্যে অভ্যাসের ফল প্রদর্শন করিয়াছি। সেই অভ্যাস দ্বারাই প্রক্রান্ত বিষয়ের রসের প্রগাঢ়তা সাধিত হয়। বিষয় যাহাই হউক না কেন, তাহাতে রসের সঞ্চার না করিতে পারিলে চিত্তাকর্ষণ হয় না; শুদ্ধ চিত্তাকর্ষণ নহে, সেই চিত্তকে আর্দ্র করিতে না পারিলে কোন ফল ফলে না। তাই, আর্য্য-সাহিত্য রসের ক্ষেত্র; কারণ, সে সাহিত্যের প্রধান নীতি ফলশ্রুতি। কি দার্শনিক প্রস্তাব, কি বৈজ্ঞানিক বিষয়, কি বিচার-পূর্ণ প্রবন্ধ, কি চিন্তাময় সন্দর্ভ, কি আখ্যায়িকা, কি কাব্য, কি অলঙ্কার, কি ইতিবৃত্ত, কি জীবনচরিত, গ্রন্থের বিষয় যাহাই হউক না কেন, গ্রন্থকার যদি এমন করিয়া গ্রন্থ রচনা করিতে না পারেন, যদ্দ্বারা চিত্তাকর্ষণ জন্মে, তবে সে গ্রন্থ লেখার ফল কি? চিত্তাকর্ষণ করিয়া সেই আকর্ষণকে ক্রমে বর্দ্ধিত করিতে হইলে আলোচ্য বিষয়কে বারংবার এরূপে আলোচিত করা আবশ্যক, যদ্দ্বারা রসের ক্রমশই আধিক্য সাধিত হইতে পারে। তাই আমরা দেখিতে পাই, এমন যে অধ্যাত্মবিষয়ক গীতা, তাহাতে কেমন এক নিষ্কাম ধর্ম্মের স্রোত বরাবর প্রবাহিত হইয়াছে, এরূপে সেই ধর্ম্ম বিষয়ান্তরেও আবৃত্ত হইয়াছে, যদ্দ্বারা চিত্ত সেই নিষ্কামধর্ম্মের গৌরবে পরিপূর্ণ হইতে থাকে। অথচ গীতা কিছু উপন্যাস নহে।

কিন্তু উপন্যাস না হইলে কি হইবে, তাহাতে অভ্যাসক্রমে কাব্যরস সঞ্চারিত হওয়াতে সেই রসে মন আর্দ্র হইয়া যায়। এই অভ্যাস-বশতই আর্য্য-সাহিত্যের সকল গ্রন্থের রসাকর্ষণ আছে। রসা-কর্ষণবশতই তৎপাঠে বিশেষ ফললাভ হয়।

আর একখানি গ্রন্থ ধর। আমরা পূর্ব্ব প্রস্তাবে দেখাইয়াছি, রামায়ণে সীতা-চরিত্র বারবার এরূপে আলোচিত হইয়াছে, যদ্দ্বারা সেই চরিত্রের সর্ব্বদেশ সুন্দর প্রকাশিত হওয়াতে সীতা এক অপূর্ব্ব সতীনারীরূপে সৃষ্ট হইয়াছেন। সেই অপূর্ব্বতা হেতু সীতা চরিত্র অপরাপর সতীচরিত্র হইতে প্রভিন্ন হইয়া গিয়াছে। সীতা সতী বটে, কিন্তু সতী দময়ন্তী নহেন, সাধ্বী সাবিত্রী নহেন, সতী ভবানী নহেন। অভ্যাসগুণে ইহারা বিভিন্ন ধরণের সতী। দুইটি আম্রবৃক্ষ সদৃশ বটে, কিন্তু ঠিক সমান বা এক নহে; উভ-য়েরই পার্থক্য আছে। সেই পার্থক্যই প্রতি বৃক্ষকে নব বেশ প্রদান করে। তদ্রূপ অভ্যাস যেরূপে এক সতী নারী হইতে অন্য সতীর পার্থক্যসাধন করে, তাহাই প্রতি নারীর অপূর্ব্বতা। অপূর্ব্বতা নূতনত্ব দেয়, অভ্যাস এমন রসের সঞ্চার করে, যদ্দ্বারা তাহা সদৃশ লোকচরিত্র হইলেও সেই সমজাতীয় ও সদৃশ বৃক্ষকে এরূপে পল্ল-বিত, বিস্তারিত এবং সুশোভিত করিয়া আনে যে, প্রতি বৃক্ষেরই নব বেশ সম্পাদিত হয়। শুদ্ধ নব বেশ নহে, প্রত্যেক বৃক্ষের ফলের আস্বাদন পর্য্যন্ত বিভিন্ন হয়। দুই গাছের আম্রের কি সমান তার হয়? একই বৃক্ষের কলম হইলেও হয় না। তদ্রূপ অভ্যাস-দ্বারা সতী নারীর চরিত্র এরূপে সৃষ্ট হয় যে, কার্য্যকালে প্রত্যেকের পার্থক্য বিশিষ্টরূপে দেখা দেয়। অথচ সকলেই সতীত্বের পরিচয় দেন। সুতরাং অভ্যাস হইতে অপূর্ব্বতা উৎপন্ন হয় বটে, কিন্তু

তাহা এক সম্পূর্ণ নূতনের উদ্ভব। এজন্ত আমাদের উদ্ধৃত বচনে অভ্যাসের পরই অপূর্ব্বতা বলিয়াছে।

নূতনই অপূর্ব্ব।

অতএব, অভ্যাস গ্রন্থের উপক্রমকে বিবৃদ্ধ করিয়া আনিয়া অপূর্ব্বতায় উপনীত করে। এজন্য গ্রন্থের বিষয়কে নূতন করিতে হইলে, তাহার মূলে নূতনত্ব থাকা চাই। সীতা সাবিত্রী আমূল নূতন স্ত্রীচরিত্র বলিয়া গ্রন্থের অভ্যাসক্রমে সেই চরিত্রের উন্মেষে নূতনত্ব প্রদর্শিত হইয়াছে। রামের বনবাস-কালে সীতার চরিত্র প্রথম মুকুলিত হয়। সেই স্থানেই রামচন্দ্র তাঁহাকে বনবাসগমনে যতই প্রতিকূল বচন বলিতে লাগিলেন, ততই তাঁহার পতির অনুগমন ও বনবাস-ইচ্ছা বলবতী হইতে লাগিল। সীতা জনকালয়ে যেরূপ উচ্চাঙ্গের শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, সীতা তাহার সুন্দর পরিচয় দিলেন। সীতার বাল্য পতি-অনুরাগ, স্ত্রীর কর্ত্তব্যপরায়ণ বুদ্ধি, সীতার শাস্ত্রজ্ঞান ও বুদ্ধিমত্তা সকলই এককালীন দেখা দিয়াছিল। রামচন্দ্র পতিব্রতার অনুরাগবলে, স্থির বুদ্ধিমত্তায় ও ধীরতায় পরাস্ত হইয়া সীতার বলবতী ইচ্ছার প্রতিবিরোধী হইতে পারিলেন না। সেইখানেই সীতা প্রথম দেখা দিয়াছিলেন। তদ্রূপ সাবিত্রীচরিত্রের মূলে আমরা এক নূতন ধরণের সতী নারী দেখিতে পাই। সেই নারী পিতৃ-আজ্ঞায় দেশে দেশে ভ্রমণ করিয়া যে পতিকে মনে মনে বরণ করিলেন, কোন গুরুজন তাঁহাকে সে প্রতিজ্ঞা হইতে বিচলিত করিতে পারেন নাই। ধর্ম্মনিষ্ঠার এই মহাপ্রতিজ্ঞা-বলই তাঁহাকে আজীবন স্বধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিতা করিয়া রাখিয়াছিল। সেই দৃঢ় নিষ্ঠাগত প্রতিজ্ঞাবল-দ্বারাই তিনি মৃত্যুমুখ হইতে পতিকে ফিরাইয়া

আনিয়াছিলেন এবং তদ্দ্বারাই তিনি বনবাসকালে কি অন্ধ শ্বশুর, কি দুঃখিনী শ্বশ্রূ, কি স্বামী, সর্ব্বজনকেই সম্যক্ পরিতুষ্ট করিয়া তাঁহাদিগকে ঐশ্বর্য্যপদে আনিতে পারিয়াছিলেন। সাবিত্রীচরিত্রের প্রথম মুকুল তাঁহার বিবাহের পূর্ব্বেই দেখা দিয়াছিল। মুকুলেই দেখা গিয়াছিল, সীতা-সাবিত্রীচরিত্র কিরূপ কুসুমে প্রস্ফুটিত হইবে। সেই মুকুলেই বিসদৃশ কুসুমের চিহ্ন দেখা গিয়াছিল। ইহাই অপূর্ব্বতা।

আশ্চর্য্য এবং অতি উৎকৃষ্টও অপূর্ব্ব।

এই অপূর্ব্বতা শুধু নূতনের সৃষ্টি ও বিকাশ করিয়া ক্ষান্ত নহে। নূতন হইলেই যে বিস্ময়জনক হইবে, ইহা জানা কথা। নূতন দস্যুতা যেমন আশ্চর্য্য, নূতন রকমের ধর্ম্মানুষ্ঠানও তেমনি আশ্চর্য্য। কিন্তু অপূর্ব্বতা চাহে, শুধু নূতন ও আশ্চর্য্য হইলে হইবে না, তাহা অতি উৎকৃষ্ট হওয়া চাই; এত উৎকৃষ্ট যে, সেই উৎকর্ষ যেন অসামান্য হইয়া অপূর্ব্বতার সঞ্চার করে। সেই অসাধারণ উৎকর্ষকে সুন্দররূপে দেখাইতে হইলে, সেই অপূর্ব্ব উৎকর্ষের চারি পার্শ্বে সামান্য সামান্য উৎকৃষ্ট দৃশ্যের সমাবেশ করিতে পার, কিংবা অপূর্ব্ব উৎকর্ষের বর্ণগৌরব দিবার জন্য পাপের অতি নিকৃষ্ট ব্যাপার বা ছবিও আঁকিতে পার, তাহাতে বরং সেই অপূর্ব্ব উৎকর্ষের বর্ণরাগ আরও উজ্জ্বল হইয়া উঠিবে। কেবল দেখা উচিত, সেই অপূর্ব্ব উৎকর্ষ যেন পাপের ঘোর ঘটায় ও কালিমায় অনুজ্জ্বল ও মলিন হইয়া না পড়ে। ব্যাস ঘোর ঘটায় দুর্য্যোধনাদির চরিত্র আঁকিয়াছেন বটে, কিন্তু সে সকলই পাণ্ডবদিগকে আরও সমুজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছে।

বিলাতী বাস্তবিক সামান্য (Realistic.) আদর্শের দোষ।

যাহা অতি উৎকৃষ্ট, তাহাই অপূর্ব্ব। সামান্য সামান্য উৎকর্ষ অপূর্ব্বতার সঞ্চার করে না। এজন্য আর্য্যসাহিত্যে সামান্য সামান্য উৎকর্ষ তত ধর্ত্তব্য হয় না। সামান্য সামান্য উৎকর্ষ কেবল অতি উৎকৃষ্টকে উজ্জ্বল করিয়া দিবার জন্য গৃহীত হয়। নহিলে স্বতন্ত্ররূপে সামান্য উৎকর্ষ পরিত্যাজ্য। বিলাতী সাহিত্যে কিন্তু এরূপ দেখা যায় না। বিলাতী সাহিত্য অনেক স্থানেই সামান্যকে চিত্রিত করিয়া চিত্রনৈপুণ্যের গৌরব লইতে চায়। সামান্যকে সুচিত্রিত করিতে পারিলে তুমি উত্তম চিত্রকর বলিয়াই পরিচিত হইতে পারিলে; কিন্তু তোমার চিত্রিত বিষয়ের গৌরব কোথায়! বিলাতী সাহিত্য শুধু সামান্যকে স্বতন্ত্ররূপে চিত্রিত করিতে ভালবাসে এমন নহে, যাহা কিছু নূতন, তাহা ভাল হউক বা মন্দই হউক, তাহাও চিত্রিত করিয়া দেখাইয়া গৌরব লইতে চাহে। সেই নূতন যৎসামান্য হইলেও ক্ষতি নাই। কেবল নূতন বলিয়া বিলাতী চিত্রকরের নিকট তাহার গৌরব এবং তজ্জন্য চিত্রযোগ্য। আর্য্যসাহিত্য এরূপ সামান্য নূতনকে পরিত্যাগ করে। কিন্তু বিলাতী নাটক-নভেল, ইতিহাস ও জীবনচরিত কেবল সামান্য বিবরণে পরিপূর্ণ হইয়া সেই সাহিত্যকে রাশি রাশি ছাইভস্মে স্তূপাকার করিয়া তুলিয়াছে।

অতি উপাদেয়ও অপূর্ব্ব।

যাহা অতি উৎকৃষ্ট, তাহা অপূর্ব্ব বটে, কিন্তু সাহিত্য-ক্ষেত্রে সেই অতি-উৎকর্ষ আর এক গুণে ভূষিত হওয়া আবশ্যক। সে গুণ

উপাদেয়তা। যাহা অতি উপাদেয়, তাহাই অপূর্ব্ব। অতি উপাদেয় কি? অতি মধুর, অতি মিষ্ট, অতি কোমল, অতি সরল, অতি সুন্দর, অতি মনোজ্ঞ, অতি ওজস্বী চিত্তরঞ্জক। চিত্তরঞ্জন করা আর্য্য-সাহিত্যেরও উদ্দেশ্য, কিন্তু বিলাতী সাহিত্যের ন্যায় চিত্তরঞ্জন নহে। বিলাতী সাহিত্যে চিত্তরঞ্জকমাত্রই উপাদেয় বলিয়া বিবেচিত হয়। আর্য্যসাহিত্যে সেই চিত্তরঞ্জকের সহিত অতি উৎকৃষ্টের একাধারে মিলন চাই, তবে সেই চিত্তরঞ্জক অতি মধুর ওজস্বী ও উপাদেয় হইয়া অপূর্ব্ব রসের সঞ্চার করিবে। এ বড় কম কথা নহে। এই নিকষে পরীক্ষিত হইলে বিলাতী সাহিত্যের কয়খানি গ্রন্থ তিষ্ঠিতে পারে? কিন্তু এই নিকষে পরীক্ষিত হইয়া আর্য্যসাহিত্যে আজিও যে অল্পসংখ্যক গ্রন্থ জীবিত আছে, তাহা সুবর্ণবর্ণে সেই সাহিত্যকে ভূষিত করিয়াছে। বিলাতী আদর্শের অনুগামী হইয়া এক্ষণে বাঙ্গালা সাহিত্যে যে সকল গ্রন্থ বিরচিত হইতেছে, অনেকেই বলিতে চান, তাহা চিত্তরঞ্জক কি না? প্রবৃত্তি ও রুচিভেদে কাহারও কাহারও চিত্তরঞ্জক হইতে পারে, কিন্তু সহৃদয় জনগণের নহে। যাহা বিশুদ্ধ রুচিসম্পন্ন সহৃদয় জনগণের চিত্তরঞ্জক, তাহাই কেবল অতি উৎকৃষ্ট; সুতরাং চিত্তরঞ্জক গ্রন্থমাত্রই অতি উপাদেয় অপূর্ব্ব গ্রন্থ নহে। আমরা এক্ষণে এই নিকষে বাঙ্গালা সাহিত্যের গ্রন্থাবলীর পরীক্ষা করিতে চাই। অপূর্ব্বতার এই উপাদেয়তার লক্ষণ ধরিয়া বিচার করিলে অনেক গ্রন্থই অতি নিকৃষ্ট বলিয়া পরিগণিত হয়। নূতন বাঙ্গালা সাহিত্যে সেরূপ গ্রন্থের প্রশ্রয় দেওয়া উচিত কি না বিচার্য্য।

ভাষার অপূর্ব্বতা।

অতএব, অপূর্ব্বরূপে উপাদেয় গ্রন্থের বিষয় অতি উৎকৃষ্ট ও

বিশুদ্ধ হওয়া চাই এবং সেই অপূর্ব্ব উৎকর্ষ এরূপ রসাশ্রিত হওয়া চাই, যেন তাহা বিশুদ্ধ-রুচিসম্পন্ন সহৃদয় জনগণের চিত্তরঞ্জক হয়। এরূপ রসাশ্রিত গুণকেই আলঙ্কারিকেরা মাধুর্য্য, ওজস্বিতা ও প্রসাদগুণ কহেন। গ্রন্থকে সেরূপ মধুর রসের, বা ওজস্বিতার, কিংবা প্রসাদগুণের আধার করিতে হইলে তাহাকে এমন ভাষায় ভূষিত করিতে হইবে, যেন সে ভাষা শ্রবণমাত্রে সেই সেই গুণে চিত্তকে দ্রবীভূত করে। আর্য্যশাস্ত্রে এরূপ মধুর (Elegant) গুণ-সম্পন্ন রচনাকে বৈদর্ভী রীতি (Style) কহে। ওজস্বিনী গৌড়ীয় এবং প্রসাদগুণবিশিষ্টা পাঞ্চালী রীতি অনুযায়ী গ্রন্থও যে উপাদেয় হইবে না, এমন নহে, তবে তাহাতে সেই রীত্যনুযায়ী রসের সঞ্চার এবং ভাষার গুণ থাকা আবশ্যক। বৈদর্ভী রীত্যনুযায়ী কালিদাসের কাব্য-নাটকই যে কেবল উপাদেয় হইয়াছে এমন নহে, ওজস্বী ভবভূতিও সর্ব্বসাধারণকে মুগ্ধ করিয়াছেন।

প্রত্যেক ব্যক্তির যেমন মুখ ও কণ্ঠরব বিভিন্ন, তেমনি প্রত্যেকের কথা কহিবার রীতিও বিভিন্ন। একই ভাব বিভিন্ন লোকে বিভিন্ন কথায় ও বাক্‌ভঙ্গিতে প্রকাশ করিয়া থাকেন। তাই যদি হয়, তবে প্রতি লোকেরই ভাষা স্বতন্ত্র। অনেক লিখিতে লিখিতে এই ভাষা পাকিয়া আইসে। এজন্য আমরা দেখিতে পাই, প্রতি লেখকেরই ভাষা স্বতন্ত্র হইলেও পাকা লেখকদিগের ভাষা পড়িবামাত্র চেনা যায়। প্রতিভাসম্পন্ন লেখকদিগের ভাষা আরও পাকিয়া পাকিয়া সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র হইয়া পড়ে। বিশেষতঃ তাঁহাদিগের রচনা ও গ্রন্থসকল অপূর্ব্ব রসে ঢালা। সেই অপূর্ব্ব রসের সহিত ভাষারও অপূর্ব্বতাগুণে তাঁহাদিগের গ্রন্থাবলীকে অপূর্ব্ব প্রতিভার পরিচায়ক করিয়া তুলে। ভাষা পাকিয়া আসিলে ক্রমে

হয় তাহা বৈদর্ভী, না হয় তাহা ওজস্বী গৌড়ীয় রীতির আদর্শানুযায়ী হইয়া আইসে। ঐ ত্রিবিধ গুণানুযায়ী ভাষার পারিপাট্য ও উপযোগিতা সাধিত হইলে তবে গ্রন্থের উপাদেয়তা জন্মে। ঐ ত্রিবিধ গুণের আদর্শানুযায়ী ভাষায় রীতি বিভিন্ন হইয়া গেলেও প্রতি শ্রেণীস্থ প্রতি লেখকের ভাষার স্বাতন্ত্র্য ঘটে। স্বাতন্ত্র্য ঘটে প্রতি ব্যক্তির বিশেষ প্রকার বাক্‌ভঙ্গি ও ভাবব্যক্তিবশতঃ। তাই, আমরা দেখিতে পাই, এক মাধুর্য্য-গুণবিশিষ্ট ভাষা লেখকভেদে অসংখ্য প্রকার হইয়াছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ দেখ, বিলাতী Spectator-নামক সাময়িক পত্রের লেখকগণ। এডিসনের লেখার যে গুণ, সেই মধুর গুণে সেই সাময়িক পত্রের পোপ, ষ্টিল, পার্ণেল, ক্রম, টিকেল প্রভৃতি সকলেরই রচনা সুন্দর, মনোজ্ঞ ও উপাদেয় বটে, কিন্তু তবু তাঁহাদিগের মধ্যে প্রত্যেকেরই বিশেষত্ব আছে। কাহারও কিছু অল্প কথায় অধিক অর্থপূর্ণ শ্লেষবিশিষ্ট, কাহারও কিছু বিস্তারিত, কাহারও কিছু প্রগাঢ়, কাহারও কিছু প্রসাদগুণবিশিষ্ট, কাহারও লেখায় তত উচ্চনীচতা নাই, সমভাবসম্পন্ন, কাহারও অধিক কোমল, কাহারও অধিক সুন্দর; এইরূপে প্রত্যেক লেখকই নিজ নিজ ভাষায় বিভিন্ন হইয়া পড়িয়াছেন। বিভিন্ন হইলেও সকলেই পাকা লেখক, সকলেরই রচনায় উপাদেয়তা ও মাধুর্য্য আছে; তাই অতি মনোজ্ঞ হইয়া প্রত্যেকেই অপূর্ব্বগুণে ভূষিত হইয়াছেন। আবার Rambler প্রভৃতি ওজস্বী গুণশালী পত্র সম্বন্ধেও সেই কথা বলা যাইতে পারে। তাই "কাব্যাদর্শে" আলঙ্কারিক দণ্ডী গুণবান্ লেখকদিগের ভাষাকে এই দশ গুণে বিভক্ত করিয়াছেন :—

"শ্লেষঃ প্রসাদঃ সমতা মাধুর্য্যং সুকুমারতা।
অর্থব্যক্তিরুদারত্বমোজঃ-কান্তি-সমাধয়ঃ।"

আলঙ্কারিক ভাষায় "শ্লেষের" অর্থ—ঘনতা, "প্রসাদের" অর্থ—সরলতা, "সমতার" অর্থ—ভাষার উচ্চনীচতারহিত সাম্যভাব, "মাধুর্য্যের" অর্থ—ভাষা এবং অর্থের এমন সৌন্দর্য্য যদ্দ্বারা মন মুগ্ধ হয়; "সুকুমারতার" অর্থ—কোমলতা; "অর্থব্যক্তি" বলিতে এমত স্পষ্ট ভাবব্যক্তি বুঝায় যদ্দ্বারা সমুদায় অর্থ প্রকাশিত হইয়া পড়ে; "উদারতা" বলিতে অর্থপূর্ণতা বুঝায়; এরূপ অর্থযুক্ত ভাষা যে, তদ্দ্বারা প্রকৃত ভাব-ব্যক্তিরও অধিক বুঝায়; সমাসসমন্বিত ওজস্বী ভাষার জোর ও তেজ অত্যন্ত অধিক; তাষার "কান্তি"তে মন ক্রমে ক্রমে দ্রবীভূত হইতে থাকে এবং "সমাধি" গুণে ভাষা স্থানে স্থানে প্রগাঢ় বা শিথিল হইয়া অর্থেরও প্রগাঢ়তা এবং শিথিলতা প্রকাশ করিয়া থাকে।

ভাষার এই সকল গুণ কি ওজস্বী, কি মাধুর্য্যগুণশালী রচনা, উভয়েরই সম্পত্তি হইতে পারে। যাহারই সম্পত্তি হউক না কেন, প্রতি গুণবিশিষ্ট রচনায় তাহার পরিণতি ঘটিলে তবে প্রত্যেক লেখকের ভাষা অপূর্ব্ব ও উপাদেয় হয়। শুধু অপূর্ব্ব হইলে হইবে না, অপূর্ব্বতার সহিত উপাদেয়তা থাকা চাই। ভাষা অপূর্ব্ব হইতে পারে, কিন্তু উপাদেয় না হইলে সেরূপ অপূর্ব্বতা আমাদের উদ্ধৃত-বচনোক্ত অপূর্ব্বতা নহে। গ্রন্থ অপূর্ব্ব রসের আশ্রয়ভূমি হইলে সেই রস যে ভাষার স্রোতে বহিবে, তাহাও অপূর্ব্ব হওয়া আবশ্যক। এইরূপ উপাদেয়তাই অপূর্ব্বতার অন্যতম গুণ।

অপূর্ব্বতা হইতে ফল।

গ্রন্থ এতদ্রূপে অপূর্ব্ব হইলে তবে তাহার কোন নির্দ্দিষ্ট

ফলোপধায়িতা ঘটে। তাই "কাব্যশরীর"-নির্ণয়ার্থ আলঙ্কারিক দণ্ডী বলিয়াছেন :—

"শরীরং তাবদিষ্টার্থব্যবচ্ছিন্না পদাবলী।"

এই "ইষ্টার্থ"ই পৌরাণিক ফলশ্রুতি এবং উদ্ধৃত-বচনোক্ত "ফলম্"। সেই ফলই গ্রন্থের উদ্দিষ্ট প্রয়োজন বা অর্থ। যাহা অভীষ্ট অর্থ, তাহাই ইষ্টার্থ। সুতরাং আলঙ্কারিকও বলিলেন, প্রতি কাব্যশরীরের "ইষ্টার্থ" (Desired Effect) আছে। সেই ইষ্টার্থ কাহার বোধগম্য? আলঙ্কারিক বলিলেন :—

"সহৃদয়বেদ্যোঽর্থঃ।"

তাহা কেবল বিশুদ্ধহৃদয় ও মার্জ্জিত-রুচিসম্পন্ন সজ্জনগণেরই বেদ্য অর্থ। গ্রন্থের "অপূর্ব্বতার" সাক্ষাৎ ফল—এই "ইষ্টার্থ" বা ফল। গ্রন্থের "অপূর্ব্বতা" থাকিলে তাহার অধ্যয়ন-ফল অবশ্যম্ভাবী। এই অপূর্ব্বতা গ্রন্থের উপক্রম হইতে অভ্যাসক্রমে উৎপন্ন হয়। সেইরূপে উৎপাদিত অপূর্ব্বতা অবশ্য ফলপ্রসূ হইবে। সেই জন্য উদ্ধৃত শ্লোকে অপূর্ব্বতার পরেই "ফলম্" বসিয়াছে। কিরূপ ফল? যে ফল অপূর্ব্বতা হইতে সমুৎপন্ন হয়, সেই ফল। গ্রন্থের ফল থাকিলেই হইল না, ফলমাত্র "ফলম্" নহে, যে ফল গ্রন্থের এইরূপ অপূর্ব্বতাগুণে উৎপন্ন, কেবল সেই ফলই "ইষ্টার্থ" ও ফল এবং সেই ফল সহৃদয় সজ্জনগণের নিকট অতি উপাদেয়। এইরূপ উপাদেয় ফল লাভার্থ আর্য্যসাহিত্যের বিস্তারিত ক্ষেত্রে গ্রন্থাবলীর তরুরাজি বিরাজিত রহিয়াছে।

———

ঋষিকন্যা শকুন্তলা ও কালিদাসের শকুন্তলা।

অপূর্ব্বতার উদাহরণে আমরা আর্য্য-সাহিত্যের এক অপূর্ব্ব নারী-চরিত্র সমালোচনার অবসর গ্রহণ করিলাম। সেই নারীর নাম শকুন্তলা। আর্য্য-সাহিত্যে এই শকুন্তলাকে দুই অপূর্ব্ব রূপে দেখিতে পাওয়া যায়—এক পৌরাণিক উপাখ্যানের ঋষিকন্যা শকুন্তলা, আর এক কবি কালিদাসের নাটকীয় শকুন্তলা। তন্মধ্যে পৌরাণিক শকুন্তলাই প্রধান; কারণ, কালিদাসের শকুন্তলা পদ্মপুরাণের আদর্শাবলম্বনেই সৃষ্ট হইয়াছে। একথা শ্রীযুক্ত বিহারীলাল সরকার-প্রণীত "শকুন্তলা-রহস্য"-নামক গ্রন্থে সুন্দররূপ প্রদর্শিত হইয়াছে। কবি যাহা গ্রহণ করেন, তাহাতে নিজ প্রতিভার সৃষ্টিশক্তি-জাত এমন সকল ভাব আরোপিত করেন, যদ্দ্বারা তাহা এক অপূর্ব্ব উপাদেয় সামগ্রী হইয়া দাঁড়ায়। কালিদাসের শকুন্তলা সেইরূপ অপূর্ব্ব সৃষ্টি। এ প্রস্তাবে আমরা পদ্মপুরাণান্তর্গত ও মহাভারতীয় পৌরাণিক ঋষিবর্ণিত ঋষিকন্যা শকুন্তলারই অপূর্ব্বতা প্রধানতঃ প্রদর্শন করিব। তৎসঙ্গে সঙ্গে কবি-অঙ্কিত শকুন্তলার পার্থক্য ও অপূর্ব্বতাও দেখাইব। কালিদাসের শকুন্তলায় এই ঋষিকন্যার ছায়াপাত হওয়াতে তাহা আরও বিচিত্র ও রমণীয় হইয়াছে। কিন্তু অগ্রে সেই আদর্শের উৎকর্ষ না দেখিলে কবিসৃষ্টির রমণীয়তা সম্যক্ উপলব্ধি হইবে না।

এজন্য অগ্রে সেই ঋষিকন্যার আদর্শ, তৎপরে কবির সৃষ্টি সঙ্গে সঙ্গে প্রদর্শিত হইতেছে।

এক্ষণে ভারতে একজন ঋষি, কি একজন মুনি পাওয়া একান্ত দুর্লভ। কিন্তু ভারতের এমন এক দিন ছিল, যে দিনে তাহার সর্ব্বত্র মুনিঋষির আশ্রমে পরিপূর্ণ ছিল। হিমালয় হইতে কুমারী অন্তরীপ পর্য্যন্ত, সমস্ত অরণ্যানী ঋষিগণের বেদগানে প্রতিধ্বনিত হইত। তাই একদা রামচন্দ্র সীতাসহ বনবাসকালে এক ঋষির পবিত্র আশ্রম হইতে আশ্রমান্তরে ভ্রমণ করিতে করিতে বনবাসের ক্লেশ দূর করিতে পারিয়াছিলেন। দেখিয়াছিলেন সেই আশ্রমসকল পরম শান্তির নিকেতন, দেখিয়াছিলেন সেই আশ্রমসকল ঋষিদিগের নির্জ্জন আবাস ছিল না। তথায় তাঁহারা কত তপস্বী, মুনি, মুনিপত্নী ও কন্যাগণে পরিবৃত হইয়া একত্র বাস করিতেন। তথায় শিষ্যগণ তাঁহাদের শিক্ষাধীন থাকিয়া তপোবল লাভ করিতেন এবং প্রীতিপ্রফুল্ল হইয়া শান্তিসুখে প্রবর্দ্ধিত হইতেন। সেই পবিত্র আলয়ে পত্নী ও কন্যাগণ অনায়াসে ধর্ম্মলাভে সমর্থ হইয়া এ সংসারকে যথার্থই শান্তির আধার করিতে পারিতেন। এইরূপ এক পবিত্র আবাসে শকুন্তলা আশৈশব প্রতিপালিতা ও প্রবর্দ্ধিতা হইয়াছিলেন। সেই শকুন্তলাচরিত পুরাণের অপূর্ব্ব সামগ্রী। ঋষিকন্যার সেরূপ আখ্যায়িকা আর কোন পৌরাণিক স্ত্রী-চরিতে পরিদৃষ্ট হয় না। ঋষির আশ্রমে শকুন্তলা প্রবর্দ্ধিতা হইয়াছিলেন বলিয়া সেরূপ কন্যা-চরিত কেবল ঋষিগণই দিতে সমর্থ। ঋষি ভিন্ন আর কাহারও দ্বারা যদি সেরূপ চরিতাখ্যায়িকা বর্ণিত হইত, তাহা হইলে সে আখ্যায়িকায় তত আস্থা স্থাপন করা যাইতে পারিত না। পদ্মপুরাণ এবং মহা-

ভারতোক্ত শকুন্তলাচরিত এজন্য এত শ্রদ্ধাভাজন হইয়াছে। সেই পুরাণোক্ত উপাখ্যানে আমরা একটি খাঁটি ঋষিকন্যা-চরিত লাভ করিতে পারি। কেহ কেহ হয় ত বলিতে চান, শকুন্তলা কি খাঁটি ঋষিকন্যা ছিলেন? তিনি ত রাজা বিশ্বামিত্রের ঔরসে এবং অপ্সরা মেনকার গর্ভে জন্মিয়াছিলেন। তবে তিনি কিরূপে ঋষি-কন্যা হইলেন? আমরা বলি, জন্ম ধরিলেও তিনি একপ্রকার ঋষিকন্যা। কারণ, তাঁহার যখন জন্ম হয়, তখন বিশ্বামিত্র আর রাজা ছিলেন না; তপস্যাপরায়ণ ঋষি হইয়াছিলেন। যদিও তখন তাঁহার সম্পূর্ণ ঋষিত্ব লাভ হয় নাই, তথাপি তখন যে তিনি রাজধর্ম্মপরায়ণ সংসারী ছিলেন না, এ কথা নিশ্চিত। ঋষিত্ব কেহ এক দিনে লাভ করিতে পারেন না। যখন কেহ সম্পূর্ণ ঋষিত্ব লাভ করেন, তখন তিনি সম্পূর্ণ ঊর্দ্ধরেতা হইয়া পড়েন। সুতরাং ঋষিকন্যার সম্ভব পর্য্যন্তও লোকে ঋষি বলিয়াই গণনীয় হয়েন। এজন্য শকুন্তলাকে ঋষিকন্যা বলিয়াই ধরিতে হয়। অপ্সরাগর্ভে তাঁহার জন্ম হইয়াছিল বটে, কিন্তু শোণিত-শুক্র মধ্যে বীজই প্রবল বলিয়া ধর্ত্তব্য। আরও বিবেচ্য এই যে, অপ্সরাগণ স্বর্বেশ্যা, মর্ত্ত্যধামের সামান্য বেশ্যা নহেন। স্বর্গধামের দেবপরি-চারিকা বলিয়া তাঁহারা বেশ্যা-নামধারিণী হইয়াছেন। যদি পাপ-চারিণী হইতেন, তবে স্বর্গে তাঁহারা অবস্থান করিতে পারিতেন না। গীতা শিক্ষা দিয়াছেন, আসক্তিতেই পাপপুণ্য নির্ভর করে। যেখানে আসক্তি আছে, সেইখানেই পাপপুণ্য আছে। আসক্তি-বিরহিত কার্য্যে পাপও নাই, পুণ্যও নাই। অপ্সরাগণ শুদ্ধ ইন্দ্রের আদেশ জন্য মর্ত্ত্যধামে আসিতেন; আদেশ পালন করিয়াই চলিয়া যাইতেন। মেনকা তদ্রূপ আদেশপালনার্থ একান্ত বাধ্য হইয়া

বিশ্বামিত্রের সহিত ক্ষণকালের নিমিত্ত আসক্তিবিরহিত সংসর্গ করিয়াছিলেন মাত্র। সুতরাং মেনকা তজ্জন্য অধর্ম্মবশতঃ স্বর্গচ্যুত হন নাই। আমরা স্বতন্ত্র প্রস্তাবে একথা বিস্তারিত রূপে বলিব। তিনি তৎক্ষণাৎ স্বর্গে গিয়া স্বর্গবাসিনী হইয়াছিলেন। যাঁহারা স্বর্গবাসিনী, তাঁহারা পুণ্যবতী দেবীরূপা। এ কথা যদি ঠিক হয়, তবে শকুন্তলার জন্ম ঋষির ঔরসে এবং স্বর্গবাসিনী দেবীর গর্ভে। অতএব, জন্ম ধরিলেও শকুন্তলা ঋষিকন্যা।

শকুন্তলা জন্মাবধিই ঋষির আশ্রমে পালিতা হইয়াছিলেন। এজন্য তাঁহার শিক্ষা ও তরিবদ্ ঋষিকন্যা-সমুচিতই হইয়াছিল। তাই, আমরা পুরাণে যে শকুন্তলাকে দেখিতে পাই, তাঁহার আচার-ব্যবহার, চরিত্র ও শীলতা ঠিক ঋষিকন্যার মতই ছিল। জন্মহেতু তাহার কিছুই ব্যতিক্রম হয় নাই। ঋষির আশ্রমে আজন্ম শিক্ষা-প্রাপ্ত ও প্রবর্দ্ধিতা হইয়া যে শকুন্তলা কণ্বদুহিতা-নামধারিণী ঋষিকন্যা বলিয়া পুরাণের আখ্যায়িকাস্থানীয় হইয়াছেন, তিনিই ঋষিকন্যা শকুন্তলা। জন্মে কি হয়? কর্ম্মেই লোকের মান ও মর্য্যাদা। অনেক ঋষিকন্যাই ঋষিদিগের পালিতা কন্যা। আশ্রমবাসিনী হইয়া শিক্ষাগুণেই তাঁহারা ঋষিকন্যা বলিয়াই গণনীয়া হইয়াছিলেন। আবার অন্যদিকে দেখা যায়, নীচকুলেও রমণীরত্নের সম্ভব হইয়াছে। শাস্ত্রে অনেক শাপভ্রষ্টা নারীরত্নের কথাও আছে। তবে আর জন্মহেতু কি আসিয়া যায়? জন্মদোষ সত্ত্বেও যখন সুশিক্ষা এবং পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত সুকৃতিই চরিত্রোৎকর্ষের কারণ হইয়া থাকে, তখন জন্মদোষ ধর্ত্তব্যই হইতে পারে না। শকুন্তলা নীচকুলেও সম্ভূতা নহেন; অথচ তিনি রমণীরত্ন ছিলেন। রমণীরত্ন ছিলেন বলিয়াই কণ্বের অতিশয় আদরণীয়া হইয়াছিলেন। এমন কি, অনসূয়া ও

প্রিয়ংবদা অপেক্ষাও বুঝি আদরণীয়া ছিলেন। আদরণীয়া হইয়াছিলেন কেবল সহৃদয়তা, সুশীলতা এবং বিনম্র-প্রকৃতিগুণে। সেই গুণে তিনি আশ্রমবাসী সকলেরই স্নেহভাগিনী এবং আশ্রমবাসিনী কন্যাগণেরও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া গণনীয়া হইয়াছিলেন। এই পৌরাণিক ঋষিকন্যাকেই আমরা ঋষিকন্যা শকুন্তলা বলিয়াছি।

কিন্তু কালিদাসের শকুন্তলা এ ঋষিকন্যা নহেন। কালিদাস যদি ঠিক ঋষিকন্যা আঁকিতে চাহিতেন, তাহা হইলে তাঁহাকে সেই পুরাণাঙ্কিত শকুন্তলারই একটি 'ফটো' দিতে হইত; কারণ, ব্যাসের উপর কলম চালান বড় সহজ কথা নহে। আর ঋষিপ্রধানকালে ব্যাস-বাল্মীকি ঋষিকন্যার যে চিত্র দিয়াছেন, সে চিত্র যে ঠিক হয় নাই, একথা বলা কালিদাসের সাধ্য নহে। কালিদাসের সময় মুনিঋষিগণের আশ্রম অতি বিরল হইয়া পড়িয়াছিল। সুতরাং তাঁহার ঋষিকন্যার চরিত্রাবলোকনের তত অবসর ছিল না। যদি থাকিয়া থাকে, তাঁহার সময়ের ঋষিকন্যার সহিত পদ্মপুরাণের ঋষিকন্যার বিস্তর প্রভেদ হইবারই সম্ভাবনা। এইজন্য বলিয়াছি, মহাভারত এবং পদ্মপুরাণ-অঙ্কিত ঋষিকন্যার চিত্রের উপর কলম চালাইবার শক্তি কালিদাসের ছিল না। কালিদাস কেন, কাহারই নাই। কালিদাস পদ্মপুরাণে ঋষিকন্যার যে চিত্র দেখিয়াছিলেন, ঠিক সেই চিত্রের ফটো তুলিতে গেলে, তাঁহার প্রতিভাশক্তি নিশ্চয় প্রতিহত হইত। সে চিত্রের কাব্য যতদূর সরস হইতে পারে, পদ্মপুরাণে তাহা হইয়াছে। কিন্তু কালিদাসের সময়ে কি সে চিত্র তত মনোজ্ঞ হইত? মুনিঋষিগণের প্রাধান্যকাল তখন বহুদিন অস্তমিত হইয়াছিল। লোকের রুচি ও রসজ্ঞতারও বহু পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছিল। এজন্য কালিদাস তৎকালোপযোগিনী করিয়া শকুন্তলাকে চিত্রিত করিয়াছিলেন।

কালিদাস রাজসভার কবি। এজন্য রাজকীয় সমুদায় ব্যাপার তাঁহার বিলক্ষণ পরিচিত ছিল। তাই আমরা নাটক মধ্যে দেখিতে পাই, তিনি রাজসম্পর্কীয় যত বিষয় বর্ণন করিয়াছেন, তাহা অতি পরিপাটী ও যথাযথরূপে চিত্রিত হইয়াছে। রাজার মৃগয়ানুসরণে সারথির রথচালন, রথের অশ্বগণের মৃগানুধাবন কি আর কোন কবি তেমন প্রকৃত বর্ণে অঙ্কিত করিতে পারিয়াছেন? সে সকল চিত্র যেন আমাদের চক্ষের সম্মুখে রহিয়াছে। তদ্রূপ, বয়স্যের সহিত রাজার বিস্রব্ধ আলাপপরিচয় ও কথোপকথন, জনপদোপনীত কণ্ব-শিষ্যগণের চিত্তাবস্থা বর্ণন এবং রাজসভায় বিচারকার্য্যের চিত্রাঙ্কন কি চমৎকার ও অপূর্ব্ব! যে অপূর্ব্বতা কালিদাস এই রাজকীয় চিত্রাবলিতে প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা কি তিনি শকুন্তলাকে ঋষি-কন্যারূপে চিত্রিত করিয়া দেখাইতে পারিতেন? কথনই নহে। যে হেতু সে অপূর্ব্বতা পদ্মপুরাণের কবি এবং কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন ব্যাস দেখাইয়া গিয়াছিলেন। এ পথে এই কণ্টক দেখিয়া কালিদাসের কল্পনা ভিন্ন পথ অবলম্বন করিল। রাজকীয় ব্যাপার সমুদায় কালিদাসের যেমন সুপরিচিত ছিল, রাজকুমারীগণের আচারব্যবহারও তদ্রূপ ছিল। রাজকুমারীগণের শীলতা ও সদাচার, বিনয় ও শিষ্টাচার, লজ্জাশীলতা ও ভয়, মিষ্টভাষিতা ও প্রণয়, বাক্‌ছলনা ও চাতুরী, সৌকুমার্য্য ও মাধুরী প্রভৃতি তিনি অনেক সময় স্বচক্ষে দেখিতেন এবং কখন কখন তদ্বিবরণ শুনিতেও পাইতেন। শুধু তাহাই নহে, সখীগণের সহিত রাজকুমারীগণের লীলা ও রঙ্গরস, ভাব ও অম্বরস, আদর ও অভিমান, মানভঙ্গ ও বাদ্যগান, তামাসা ও মস্করা, শাসান ও ছল করা প্রভৃতি হাসিতে হাসিতে দেখিতেন ও শুনিতেন। এ সকল দেখিয়া শুনিয়া তাঁহার কল্পনা শত ঐশ্বর্য্যে পূর্ণ হইয়াছিল। তিনি

সেই ঐশ্বর্য্যে শকুন্তলা ও তদীয় সখীদ্বয়কে ভূষিতা করিয়া তাহাদিগকে তপোবনসুন্দরীরূপে প্রদর্শন করিলেন। রাজকুমারীর ন্যায় তাঁহার শকুন্তলা ফুল, ফুলগাছ, হরিণী ও ময়ূরী প্রভৃতিকে বড়ই ভালবাসিতেন। তাই শকুন্তলা নবমালিকার সহিত সহকারতরুর বিবাহ দিয়া বন-তোষিণী বলিয়া তাহার নাম রাখিয়াছিলেন। মাধবীলতাকে ভগ্নীসম স্নেহ করিতেন, কুসুমোদ্গম হইবে বলিয়া নিজ হস্তে গাছে গাছে জল সেচন করিতেন, হরিণীকে কোলে করিয়া আদর করিতেন, হরিণশিশুকে করপুটে জলদান করিয়া চুম্বন করিতেন। কালিদাসের শকুন্তলা এই প্রকার বনবাসিনী বল্কলধারিণী রাজকুমারীরূপে তপোবন অলঙ্কৃত করিয়া জগৎ মোহিত করিয়াছেন। তাঁহাকে রাজকুমারীরূপে চিত্রিত করিবার বিশিষ্ট কারণও ছিল। শকুন্তলা প্রকৃত পক্ষে এক প্রকার রাজকুমারী ছিলেন। যে হেতু, বিশ্বামিত্র এককালে রাজা ছিলেন। সুতরাং রাজচক্রবর্ত্তীর বীজে শকুন্তলার জন্ম হইয়াছিল। এই সূত্র পাইয়া শকুন্তলাকে রাজকুমারীরূপে চিত্রিত করিতে কালিদাসের কালবিলম্ব হয় নাই। রাজসভার কবির পক্ষে রাজকুমারীর চিত্রাঙ্কন অতি সহজ হইয়াছিল। তাই কালিদাসের শকুন্তলা এত স্বাভাবিক ও মনোজ্ঞ হইয়াছে। মনোজ্ঞ হইয়াছে রাজকুমারীরূপে, ঋষিকন্যারূপে নহে। পুরাণাঙ্কিত ঋষিকন্যার চিত্র লোকের তত মনোজ্ঞ নহে। কারণ, সে চিত্র লোকের তত পরিচিত নহে। কিন্তু কালিদাসের সংসারিণী শকুন্তলার স্বভাব, প্রকৃতি ও আচারব্যবহার লোকসাধারণবিদিত। সেই জন্য তাঁহার যথাযথ ক্রিয়াকলাপ ও আচরণ দেখিয়া লোকে মোহিত হইয়াছে। এ দেশের লোক দূরে থাক, বিদেশী ইউরোপীয়গণ পর্য্যন্ত মোহিত হইয়াছেন। মোহিত

হইয়াছেন এ দেশীয় কুলবালার মাধুর্য্য, সৌকুমার্য্য, লজ্জাশীলতা, ও রমণীয়তা দেখিয়া। সে শকুন্তলার প্রকৃতি রাজকুমারীর ন্যায় কোমলা, উচ্চবংশীয়ের শীলতা ও শিষ্টাচারে অতি রমণীয়া এবং স্নেহ ও মমতাগুণে সর্ব্বজন-মনোহারিণী। তাপসকুমারীগণের সহিত বল্কলধারিণী হওয়াতে সেই বনবাসিনী রাজকুমারীর সৌন্দর্য্য ও রমণীয়তা আরও বর্দ্ধিত হইয়াছিল। তপোবনের পবিত্রতার বিমল বর্ণে তাঁহার লাবণ্য আরও অধিক বাড়িয়াছিল। রাজকুমারী যেমন সখীগণের আহ্লাদায়িনী হন, তিনিও তদ্রূপ হইয়া তাহাদিগের সহিত মিশিয়া গিয়াছিলেন। তাঁহার শিথিল বল্কল সখীগণকে পরাইয়া দিতে হইত। এই বনবাসিনী বল্কলধারিণী রাজকুমারীর লাবণ্য ও মাধুর্য্যে রাজর্ষি দুষ্মন্ত পর্য্যন্ত মোহিত হইয়া গিয়াছিলেন। কিন্তু এই প্রকৃতিমধুরা সুকুমারী শকুন্তলা যেমন অতুলনীয় সৌন্দর্য্যে এক অপূর্ব্ব রমণীরত্ন হইয়াছিলেন, ধর্ম্মভাবের তেজস্বিতায় এবং সরলতার রমণীয়তায় ঋষিকন্যাও তেমনি অতুলনীয় গাম্ভীর্য্যে আর এক অপূর্ব্ব বনসুন্দরীরূপে তপোবন শোভিত করিয়াছিলেন। এই উভয় অপূর্ব্বতাই আমরা দেখাইতে চেষ্টা করিব। দেখাইব ঋষিকন্যা ধর্ম্মের মনোমোহিনী মূর্ত্তি, শকুন্তলা কবির মনোমোহিনী সৃষ্টি।

ঋষির সংসার—বনবাসীর সংসার, পুরবাসীর সংসার নহে। ধর্ম্মই সে সংসারের সুদৃঢ় বন্ধন। মুনিগণ ও তপস্বিগণ সে সংসারে ধর্ম্মাচারে ও শাস্ত্রালোচনায় প্রবৃত্ত। তাঁহাদিগের পত্নী ও কন্যাগণ তাঁহাদিগেরই দৃষ্টান্তানুযায়ী সুশিক্ষিতা হইতেন। তাঁহারাও তপস্বিগণের ন্যায় ধর্ম্মাচারে বিশুদ্ধা এবং শাস্ত্রজ্ঞানে অলঙ্কৃতা হইতেন। কিরূপ অলঙ্কৃতা হইতেন, ঋষিকন্যা শকুন্তলা মহাভারতীয় দুষ্মন্তের

সমক্ষে রাজসভায় তাহার পরিচয় দিয়াছেন। এই সুশিক্ষাগুণে সেই স্ত্রীরত্নগণ পুরবাসিনী কুলবালাগণের মত তত বাঁধাবাঁধি নিয়মে আবদ্ধা না থাকিলেও ধর্ম্ম দ্বারা সুরক্ষিতা ছিলেন। তাঁহাদিগেরই উদ্দেশে ভগবান্ মনু বলিয়াছেন :—

"অরক্ষিতা গৃহে৷ রুদ্ধাঃ পুরুষৈরাপ্তকারিভিঃ।
আত্মানমাত্মনা যাস্তু রক্ষেয়ুস্তাঃ সুরক্ষিতাঃ" ॥ ৯।১২॥

"যে স্ত্রী দুঃশীলতা হেতু স্বয়ং আত্মরক্ষায় যত্নবতী না হয়, তাহাকে আপ্ত পুরুষেরা গৃহাবরুদ্ধা করিয়া রাখিলেও রক্ষা করিতে সমর্থ হন না; কিন্তু যাঁহারা সতত আত্মরক্ষায় তৎপর, কেহ তাঁহাদিগকে রক্ষা না করিলেও তাঁহারা সুরক্ষিতা হইয়া থাকেন।"

তাই আমরা পৌরাণিক সাহিত্যে দেখিতে পাই, ঋষিগণের আশ্রমবাসিনী নারীগণ যতদূর স্বাধীনভাবে বিচরণ করেন, পুরনারীগণ ততদূর স্বাধীনতা প্রাপ্ত হন না। সেই বনালয়ে কেই বা তাঁহাদিগকে দেখিতেছে; কাহারই জন্য বা তাঁহাদিগের লজ্জাসরম হইবে? তাঁহারা যাঁহাদিগের সংসর্গে থাকেন, তাঁহারা সকলেই সুপরিচিত ও তপোবলে সুসংযত। তাঁহাদিগের নিকট অনায়াসে স্বাধীনভাবে থাকিতে পারেন। আর সেই আশ্রমদর্শনোপলক্ষে যাঁহারা কখন কখন আসেন, তাঁহারা ত দুই চারিদিনের অতিথি মাত্র। বিশেষতঃ তাঁহারা সেই পবিত্র স্থানে অতি সসম্ভ্রমে থাকেন এবং ভক্তিসহকারে আশ্রমবাসিগণকে পূজা করিতে আসেন। সেই যাত্রিগণকে বিস্রব্ধভাবে সেবা শুশ্রূষা করাই আশ্রমবাসিনীদিগের কার্য্য। তাই আমরা দেখিতে পাই, কণ্বঋষির আশ্রমে শকুন্তলা অতি বিস্রব্ধভাবে রাজা দুষ্মন্তকে আশ্রমে আসন দিয়া অতিথিসেবা করিতেছেন। পদ্মপুরাণে আছে :—

"রাজা মৃগের অনুসরণবশতঃ তৃষ্ণাতুর হইয়া জল অন্বেষণ করিতে করিতে অপ্সরাসমা কন্যাদিগকে দেখিতে পাইলেন। তাহারা স্বানুরূপ ঘট কক্ষে রাখিয়া সরোবর হইতে জল সংগ্রহ করিয়া বন্য-আশ্রম-তরুদিগকে সিক্ত করিতেছে। তাহাদের মধ্যে অনবদ্যাঙ্গী শকুন্তলা-নাম্নী কন্যা রাজাকে দর্শন করিয়া সুস্নিগ্ধবচনে বলিলেন, আপনি অদ্য অতিথিরূপে আসিয়াছেন; নিশ্চয়ই সৎকৃত হইয়া যাইবেন। এই আপনার আসন, এই অর্ঘ্য গ্রহণ করুন। রাজা তাঁহার বচনসুধায় পরিতৃপ্ত হইয়া অতিথিসৎক্রিয়া গ্রহণ করিলেন।"

পদ্মপুরাণের এই সংক্ষিপ্ত বিবরণ মহাভারতে বিস্তৃতরূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। মহাভারতে দেখিতে পাওয়া যায়:—

"রাজা দুষ্মন্ত জপহোমপরায়ণ একনিষ্ঠ বিপ্রগণকে সন্দর্শন করিতে করিতে আশ্রমসমীপে উত্তীর্ণ হইলেন। মুনিগণ অতি প্রযত্নপূর্ব্বক রাজাকে যে সকল বিচিত্র আসন প্রদান করিলেন, তদ্দর্শনে তিনি বিস্মিত হইলেন।"

"অনন্তর রাজা, মন্ত্রী ও পুরোহিতকে আশ্রমের বাহিরে রাখিয়া একাকী তন্মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, আশ্রম শূন্য রহিয়াছে, মহর্ষি কণ্ব তথায় নাই। তখন তিনি উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন,—কুটীরের অভ্যন্তরে কে আছ, বহির্গত হও। তাঁহার সেই বাক্য শ্রবণ মাত্র তাপসী-বেশধারিণী লক্ষ্মীর ন্যায় এক কন্যা কুটীর হইতে বহির্গত হইলেন। তিনি রাজাকে সমাগত দেখিয়া পাদ্য, অর্ঘ্য, আসন দ্বারা তাঁহার যথোচিত আতিথ্যবিধানপূর্ব্বক স্বাগত প্রশ্ন ও কুশলাদি জিজ্ঞাসা করিলেন।"

অতিথির প্রতি আশ্রমবাসিনী ঋষিকন্যার এই ব্যবহার। ঋষি ফল-আনয়নার্থ বনান্তরে গিয়াছিলেন; তিনি জানিতেন, আমার অবর্ত্তমানে অতিথি-অভ্যাগতের প্রতি শকুন্তলাই যথোচিত কর্ত্তব্য-সাধন করিবেন। ঋষিকন্যা শকুন্তলাও তাহা অসঙ্কুচিতচিত্তে সম্পাদন করিয়াছিলেন। যখনি অন্যমনস্ক থাকা বশতঃ তৎকার্য্যসাধনে ত্রুটী হইয়াছিল, অমনি একজন ঋষিকর্ত্তৃক শাপগ্রস্ত হইয়াছিলেন। কারণ, কেবল ঋষিরাই জানেন, এরূপ ত্রুটী তাঁহার পক্ষে

অধর্ম্মাচরণ। বনবাসিনী সীতাও একদা রামের অনুপস্থিতিকালে দশাননকে আতিথ্য বিধান করিতে গিয়া গণ্ডীর বাহিরে গিয়াছিলেন। পুরবাসিনী যুবতী কন্যার কি এরূপ ব্যবহার সম্ভবে? সেরূপ কন্যার যাহা সম্ভাবিত হয়, এই দেখুন কালিদাসের শকুন্তলা সেইরূপ ব্যবহার করিয়াছিলেন কি না? দুষ্ট মধুকরকে তাড়াইবার ব্যপদেশে রাজা দুষ্মন্ত যখন শকুন্তলার সমক্ষে সহসা উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "হে তাপসললনে! আপনার তপস্যা বর্দ্ধিত হইতেছে ত?" শকুন্তলা তখন কি করিলেন?

"শকুন্তলা সাধ্বসাদবচনা তিষ্ঠতি।"

"শকুন্তলা সসম্ভ্রমে কোন কথা না কহিয়া নীরব হইয়া রহিলেন।"

তিনি এতক্ষণ স্বচ্ছন্দে সখীগণের সঙ্গে রঙ্গরসের সহিত লীলায় ব্যাপৃতা ছিলেন, এমন সময় হঠাৎ রাজাকে দর্শনপূর্ব্বক কি করিলেন? ঋষিকন্যা শকুন্তলা অসঙ্কুচিতচিত্তে যে ধর্ম্মাচারে প্রবৃত্ত হইয়া রাজাকে নিজে পাদ্য, অর্ঘ্য ও আসন দান করিয়া সাদর সম্ভাষণ করিয়াছিলেন, কালিদাসের শকুন্তলা কি তাহাই করিতে পারিয়াছিলেন? না, সহসা একজন সম্ভ্রান্ত অপরিচিতের আগমনে রাজকুমারীর স্বভাবসুলভ লজ্জা ও সম্ভ্রমের বশবর্ত্তিনী হইয়া তাঁহার সম্ভাষণে নিরুত্তরা হইয়া রহিলেন। যে স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম্মাচরণ সরলা ঋষিকন্যার সাজিয়াছিল, তাহা কি কালিদাসের শকুন্তলার অঙ্গে শোভা পাইত? তিনি একজন সংসারিণী রাজকুমারীর মত নীরব হইয়া রহিলেন, আর তাঁহার সহিত ঋষিকন্যার প্রভেদ দেখাইবার জন্যই যেন অনসূয়া রাজাকে আতিথ্যবিধানের পাদ্য অর্ঘ্য দিবার জন্য উদ্‌যোগিনী হইলেন। এস্থলে দেখুন, বনবাসিনী ঋষিকন্যার স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম্মাচরণ, শিষ্টাচার ও শীলতা কেমন সংসারিণী রাজ-

কুমারীকে সুস্পষ্ট দেখাইয়া দিতেছে। কবির তুলিকার একটিমাত্র কোমল রেখার স্পর্শে এ উভয় চিত্রের বিভিন্নতার সুন্দর পরিচয় হইয়া গেল।

দৈবনির্ব্বন্ধ-নিবন্ধন বিবাহের পূর্ব্বে রাজার প্রতি শকুন্তলার যে পূর্ব্বানুরাগ ক্রমে ক্রমে সঞ্চারিত হইতেছিল, তাহা তিনি গৃহস্থ কুলবালার মত নানাপ্রকারে প্রকাশ করিতেছিলেন, সরলা ঋষি-কন্যার মত প্রকাশ্য বাক্যে কিছুই বলিতে পারেন নাই। কিন্তু রাজা দুষ্মন্ত অতি চতুর বহুদর্শী প্রেমিক নাগরের মত তাহা এই সকল লক্ষণে বুঝিতে পারিয়াছিলেন :—

"বাচং ন মিশ্রয়তি যদ্যপি মদ্বচোভিঃ
কর্ণং দদাত্যবহিতা ময়ি ভাষমাণে।
কামং ন তিষ্ঠতি মদাননসংমুখীয়ং
ভূয়িষ্ঠমন্যবিষয়া ন তু দৃষ্টিরস্যাঃ॥"

"এই শকুন্তলা যদিও আমার বাক্যের সহিত স্বীয় বাক্য মিশ্রিত করিতেছেন না, তথাপি আমি কথা কহিলে মনোযোগপূর্ব্বক কর্ণপাত করিয়া থাকেন; আর যদিও আমার সম্মুখে অধিকক্ষণ থাকিতেছেন না, কিন্তু তাঁহার দৃষ্টি অন্য বিষয়েও অধিকক্ষণ থাকে না।"

আবার শকুন্তলা রাজার নিকট হইতে প্রস্থানকালে কি করিয়াছিলেন? তিনি বলিতেছেন :—

"অনসূয়ে! এই কুশাঙ্কুর লাগিয়া আমার চরণতল ক্ষতবিক্ষত হইয়াছে, আর এই কুরুবক-শাখায় বল্কলও সংলগ্ন হইয়া গিয়াছে, অতএব কিঞ্চিৎকাল অপেক্ষা কর, আমি বল্কল মোচন করিয়া লই।" এই ছলে রাজাকে অবলোকন করিতে করিতে কিছু কাল বিলম্ব করিয়া সখীগণের সহিত নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

গৃহস্থ কুলবালার পূর্ব্বানুরাগের কি সুন্দর অনুরূপ চিত্র! আর কোন কবি কি পূর্ব্বরাগের এমন স্বভাবসিদ্ধ যথাযথ চিত্র দিতে

পারিয়াছেন? যদি না পারিয়া থাকেন, তবে এই চিত্রখানিকে কি মুক্তকণ্ঠে অপূর্ব্ব বলিতে পারা যায় না? নবানুরাগের এ সকল চিহ্ন ঠিক্ বটে, কিন্তু কাহার পক্ষে? একজন সলজ্জা নবীনা রাজকুমারীর পক্ষে ঠিক্, না, সরলা ঋষিকুলবালার সম্বন্ধে ঠিক্? নাগরীর এ সকল অনুরাগ-লক্ষণ সুচতুর রাজনাগরই বুঝিতে পারিয়াছিলেন। তাই—

"ভুজনে পড়িল বাজা ভুজনারি মনে।"

আবার কবিচিত্রিত সখীদ্বয়ও সে সকল লক্ষণ বুঝিতে পারিয়াছিলেন। শুধু শকুন্তলার নহে, রাজারও মন বুঝিতে পারিয়াছিলেন। সখীরাও বড় কম পাত্রী নহেন। তাই তাঁহারা যখন রাজার সুস্পষ্ট পরিচয় পাইলেন, তখন তাত কণ্বের কথা স্মরণ করিয়া বলিয়া উঠিলেন:—

"শকুন্তলে! এখন যদি তাত কণ্ব উপস্থিত থাকিতেন?"

শকুন্তলা সে কথার উত্তরে কৃত্রিম ক্রোধভরে বলিলেন:—

"তবে কি হইত?"

তদুত্তরে উভয় সখী বলিতেছেন:—

"তবে জীবনসর্ব্বস্ব প্রদান করিয়াও এই অতিথিবিশেষকে কৃতার্থ করিতেন।"

শকুন্তলা বলিলেন:—

"তোমরা দূর হও, কি একটা মনে করিয়া বলিতেছ, আমি তোমাদের কথা শুনিব না।"

আবার যখন প্রিয়ংবদা রাজাকে বলিলেন:—

আমাদের এই প্রিয়সখী ধর্ম্মাচরণে পরবশ, ফলতঃ স্বাধীনভাবে স্বয়ং পরিণয়-কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে পারিবেন না; কিন্তু পিতা কণ্ব সংকল্প করিয়াছেন, ইঁহাকে অনুরূপ বরে সম্প্রদান করিবেন।"

তখনও শকুন্তলা কৃত্রিম ক্রোধভরে বলিতেছেন :—

"অনসূয়ে! আমি চলিলাম।"

অন। কি জন্য চলিলে?

শকু। এই প্রিয়ংবদা অতিশয় প্রলাপবাক্য-সকল বলিতেছে, তা, আমি আর্য্যা গৌতমীর নিকট সকল কথা বলিয়া দিই গে।"

প্রলাপবাক্য প্রিয়ংবদা বলিলেন? না, শকুন্তলা নিজেই বলিলেন? তাঁহার বাক্‌ছলনা কি গৃহস্থ অনূঢ়া কন্যার মত নহে? ঠিক্ তাই। সরলা ঋষিকন্যার মুখে এরূপ কথা এবং এরূপ আচরণও সম্ভবে না। এই দেখুন, সরলা ঋষিকন্যা স্বয়ং রাজাকে কি বলিতেছেন :—

"ফলাহারগতো রাজন্ পিতা মে ইত আশ্রমাৎ।
মুহূর্ত্তস্তু প্রতীক্ষস্ব স মাং তুভ্যং প্রদাস্যতি॥"

পদ্মপুরাণ। স্বর্গখণ্ড। ১ম অধ্যায়।

"আমার পিতা ফলাহরণ জন্য আশ্রম হইতে বহির্গত হইয়াছেন। আপনি মুহূর্ত্তমাত্র প্রতীক্ষা করুন। তিনি আমাকে আপনার হস্তে সমর্পণ করিবেন।"

রাজা কিন্তু মুহূর্ত্তমাত্রও প্রতীক্ষা করিতে পারিলেন না। তিনি শকুন্তলার মন জানিতে পারিয়া অমনি শাস্ত্রমত উভয়ের কামজ গান্ধর্ব্ববিবাহের প্রার্থনা করিলেন। প্রার্থনা করিলেন এই জন্য, পাছে কালবিলম্বে কণ্ব ঋষি আসিয়া পড়িলে তাঁহার মনোরথ বিফল হইয়া যায়। সরলা ঋষিকন্যা নিজমুখে যে মনোগত ভাব ব্যক্ত করিলেন, তাহাতে তাঁহার সে বিবাহে সম্মতি বিলক্ষণ প্রকাশ হইয়া পড়িল। সে সম্মতি-প্রকাশে লজ্জা কোন বাধা দিল না। কারণ, হৃদয়ের সরলভাব ঋষিকন্যারা কেবল সরল বাক্যেই প্রকাশ করিতে পারেন। সংসারিণীর কৃত্রিম বাক্য ও ভাবপ্রকাশ তাঁহাদের আচরণীয় নহে। এরূপ সরলতার পরিচয় আমরা আর

এক স্থলে অতি সুস্পষ্ট দেখিয়াছি। শকুন্তলা রাজার সহবাসে গর্ভবতী হইয়াছিলেন। গর্ভ সপ্তম মাসে উপনীত হইলে মহর্ষি কণ্ব শকুন্তলাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন :—

"চিরকাল কন্যার পিতৃগৃহে থাকা উচিত নহে। পিতৃগৃহে লোকাপবাদের সম্ভাবনা ; বিশেষতঃ পতিই নারীর পরম তপস্যা ও পতিই নারীর দেবতা, গুরু, আর্য্য, গতি ও পরম পদ। দেবি! তুমি যাহাকে প্রসব করিবে, সে মহাবল-সম্পন্ন হইবে। রাজপুত্রের বনে থাকা উচিত নহে। অতএব তোমাকে স্বামি-সমীপে প্রেরণ করিব। পতি-প্রেমই স্ত্রীর পরম সৌভাগ্য বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে।"

তদুত্তরে শকুন্তলা বলিলেন :—

"পিতস্তেঽনুগৃহীতাস্মি পতিদর্শনবার্ত্তয়া।
নানুজ্ঞাং প্রার্থয়ে ভূত্যাং স্নেহভঙ্গভয়াৎ তব ॥
ন জানে কো ময়া গর্ভে ধৃতোঽয়ং পুরুষোত্তমঃ।
যত্তেজসা ন শক্লোমি স্থাতুমেকত্র মারিষ ॥
তদদ্যৈব গমিষ্যামি রাজর্ষেস্তস্য চান্তিকম্।
অনুজ্ঞাং দেহি মে তাত কৃপয়া তাপসোত্তম ॥"

পদ্মপুরাণ। স্বর্গখণ্ড। ২য় অধ্যায়।

"পতিদর্শনে যাইব, এ কথা শুনিয়া আমি অনুগৃহীত হইলাম। পিতঃ, পাছে তোমার স্নেহ হারাই, এই ভয়ে আমি আজ্ঞা প্রার্থনা করি নাই। জানি না, আমি কোন্ পুরুষোত্তমকে গর্ভে ধারণ করিয়াছি। তাহার তেজে আমি এক স্থানে থাকিতে পারি না। অতএব, অদ্যই আমি রাজ-সমীপে গমন করিব। আমাকে অনুগ্রহপূর্ব্বক অনুজ্ঞা দিউন।"

পিতৃসম ঋষির নিকট ঋষিকন্যা শকুন্তলা স্বামিগৃহে যাইবার জন্য নিজমুখেই অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। এ সরলতার পরিচয় কি কালিদাসের শকুন্তলায় আছে? কোন গৃহস্থ কুলবালা গর্ভা-

বয়স্থায় পিতৃ-সমীপে কি এরূপ লজ্জাহীনতার পরিচয় দিতে পারেন? কিন্তু আমরা পুরাণে দেখিতে পাই, ঋষিকন্যারা অনায়াসে পিতৃসমক্ষে এরূপ অনুমতি প্রার্থনা করিতে পারিতেন। তাহাতে তাঁহাদের কোন লজ্জাবোধ হইত না। এরূপ স্থলে কালিদাসের শকুন্তলা গৃহস্থকন্যার ন্যায়, কেমন স্বভাবসিদ্ধ লজ্জার বশবর্ত্তিনী হইয়াছিলেন দেখুন :—

স্বামিগৃহে যাইবার জন্য শকুন্তলা উদ্‌যোগিনী হইলে যখন গৌতমী তাঁহাকে বলিলেন,—বৎসে! এই বনদেবতাদিগের অনুগ্রহ দ্বারা বোধ হইতেছে যে, তুমি স্বামিগৃহে গমন করিয়া রাজলক্ষ্মী উপভোগ করিবে। এই স্বামিগৃহের কথা গৌতমীর মুখে শুনিবামাত্র শকুন্তলা—

"লজ্জাং নাটয়তি।"—লজ্জা প্রকাশ করিলেন।

আবার যখন গৌতমী বলিলেন,—বৎসে! আনন্দবাষ্পবিসর্জ্জনকারী লোচন দ্বারা আলিঙ্গন করিয়াই যেন এই তোমার গুরু (কণ্ব) উপস্থিত হইয়াছেন। অতএব, সমুচিত সমাদরপূর্ব্বক ইঁহাকে অভিবাদন কর। তখন শকুন্তলা—

"সব্রীড়ং বন্দনাং করোতি।"—সলজ্জভাবে বন্দনা করিলেন।

অনুমতি প্রার্থনা করা দূরে থাক্, যাত্রাকালে পিতাকে প্রণাম করিতে যাওয়াতেই লজ্জা উপস্থিত হইয়াছিল। কিন্তু এ চিত্র গৃহস্থকন্যার ঠিক্ অনুরূপ চিত্র। তাই বলিয়াছি, কালিদাসের শকুন্তলা ঠিক্ ঋষিকন্যা নহেন; তিনি রাজকুমারীর এক অপূর্ব্ব ও যথাযথ চিত্র। ঋষিকন্যাদিগের সরলতার পরিচয় কেমন অপূর্ব্ব, তাহা পৌরাণিক শকুন্তলার উপাখ্যানে সুন্দর প্রকাশিত হইয়াছে। সরল ধর্ম্মাচরণে তাঁহাদিগের কিছুই লজ্জাবোধ ছিল না। নহিলে,

পিতা কণ্ব ফলাহরণ করিয়া কুটীরে প্রত্যাগত হইলে দিব্যজ্ঞানে শকুন্তলার সহিত রাজা দুষ্মন্তের গান্ধর্ব্ব-বিবাহের বিষয় সমস্ত অবগত হইয়া যখন শকুন্তলাকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিলেন :—

"তুমি আমাকে না বলিয়া, পুরুষের সঙ্গে যে সংসর্গ করিয়াছ, ইহাতে তোমার ধর্ম্ম-হানি হয় নাই। যে হেতু ক্ষত্রিয়ের গান্ধর্ব্ব-বিবাহ শ্রেষ্ঠ বলিয়া উক্ত।"

অনন্তর যখন শকুন্তলাকে আশীর্ব্বাদস্থলে বলিলেন :—

"তোমার গর্ভের মহাবল মহাভাগ পুত্র এই সাগরমেখলা পৃথিবী ভোগ এবং স্বনামবংশ প্রতিষ্ঠা করিবে। বিপক্ষের প্রতি রণযাত্রাকালে সেই মহাত্মা চক্রবর্ত্তীর রথচক্র সর্ব্বত্র অপ্রতিহত হইবে।"

তখন শকুন্তলা পিতার চরণযুগল ধৌত করিয়া দিলে তিনি উপবিষ্ট ও বিগতশ্রান্তি হইলে, অনায়াসে বলিতে পারিয়াছিলেন :—

"যো ময়াসৌ বৃতো রাজা পৌরবঃ পুরুষোত্তমঃ।
স ত্বয়ানুমতো যস্মাৎ কৃতার্থাস্মি পিতঃ প্রভো॥
প্রসাদং কুরু তস্যাপি সামাত্যস্য মহীপতেঃ॥"

পদ্মপুরাণ।

"হে পিতঃ প্রভো! আমি সেই পৌরবরাজকে বিবাহ করিয়াছি, ইহা যে তোমার অনুমোদিত, তাহাতেই আমি কৃতার্থ হইলাম। এক্ষণে প্রার্থনা করি, সেই সামাত্য মহীপতির প্রতি প্রসন্ন হউন।"

কোন্ গৃহস্থ কুলবালা মুখ ফুটিয়া এ সকল কথা লজ্জার মাথা খাইয়া সরলচিত্তে পিতাকে সম্বোধন করিয়া বলিতে পারেন? কালিদাসের শকুন্তলাও কি পারিয়াছিলেন? নাটকে দেখিতে পাওয়া যায়, তিনি সলজ্জ কুলবালার মত এস্থলেও নীরব ও অবনতমুখী হইয়াছিলেন।

পুরাণে গান্ধর্ব্ববিবাহের এইরূপ লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায় :—

"ক্ষত্রিয়স্য হি গান্ধর্ব্বো বিবাহঃ শ্রেষ্ঠ উচ্যতে।
সকামায়াং সকামস্য নির্ম্মন্ত্রো রহসি স্মৃতঃ॥"

"নির্জ্জন স্থানে সকামা কামিনীর সহিত সকাম পুরুষের যে মন্ত্ররহিত সংসর্গ, তাহাকেই গান্ধর্ব্ববিবাহ কহে।"

এই লক্ষণানুসারেই রাজা দুষ্মন্ত ঋষিকন্যাকে বলিয়াছিলেন :—

'সা ত্বং মম সকামস্য সকামা বরবর্ণিনি।
গান্ধর্ব্বেণৈব ধর্ম্মেণ ভার্য্যা ভবিতুমর্হসি॥"

"হে বরবর্ণিনি! আমার যেমন তোমার প্রতি কামনা আছে, তোমারও তেমন আমার প্রতি অভিলাষ আছে; অতএব ধর্ম্মসঙ্গত গান্ধর্ব্ববিধানে আমার ভার্য্যা হও।"

সুতরাং রাজা দুষ্মন্ত ঋষিকুমারী শকুন্তলার অভিলাষ বুঝিতে পারিয়াছিলেন। কিন্তু পুরাণে দেখিতে পাওয়া যায়, ঋষিকন্যা এমন কিছুই করেন নাই বা বলেন নাই, যদ্দ্বারা তাঁহার সে অভিলাষ ব্যক্ত হইতে পারে। যদি রাজার প্রতি তাঁহার পূর্ব্বরাগ জন্মিয়া থাকে, তাহা অতি প্রচ্ছন্নভাবে সংযত হইয়াছিল। যদি বল, ঋষিকন্যা ত বলিয়াছিলেন :—"আমার পিতা ফলাহরণ করিবার জন্য আশ্রম হইতে বহির্গত হইয়াছেন। আপনি মুহূর্ত্তমাত্র প্রতীক্ষা করুন। তিনি আমাকে আপনার হস্তে সমর্পণ করিবেন।"

এই কথায় এই মাত্র বুঝায় যে, রাজা গান্ধর্ব্ববিবাহের জন্য অতি ব্যস্ত হইলে, ঋষিকন্যা তাহাতে আপনার সম্মতি জানাইয়াছিলেন। কিন্তু সে সম্মতি অনুরাগবশতঃ হইয়াছিল, কি রাজার সহিত বিবাহ-সংঘটন পাছে না হয়, এই আশঙ্কাবশতঃ হইয়াছিল, তাহা ঠিক্ বুঝিতে পারা যায় না। তবে এইমাত্র বুঝা যায়, রাজা ঋষিকন্যার সেই কথাকে নিজ অভিলাষসিদ্ধির অনুকূল করিয়া গান্ধর্ব্ববিবাহের প্রস্তাব করিয়াছিলেন এবং বিবাহের জন্য অধীর হইয়াছিলেন।

পুরাণে এইমাত্র প্রকাশিত থাকিলেও কালিদাস ঋষিকন্যার পূর্ব্বানুরাগ নিশ্চিত বলিয়া ঠিক্ করিয়া লইয়াছিলেন। নহিলে তাঁহার সেই পূর্ব্বানুরাগ দেখাইবার অবকাশ ঘটে কই? কিন্তু কালিদাস সেই অবকাশ লইয়া পূর্ব্বানুরাগের যে চিত্র দিয়াছেন, জগতে তাহা অতুলনীয় ও অপূর্ব্ব। তিনি শকুন্তলার প্রেমানুরাগের চিত্র বিস্তারিতরূপে আঁকিবার নিমিত্ত মহর্ষি কণ্বের অনুপস্থিতি-কালকে তীর্থযাত্রাচ্ছলে সুদীর্ঘ করিয়া লইলেন। কিন্তু কালিদাস ঋষিকন্যার নবানুরাগ-প্রকাশের চিত্র কোথায় পাইবেন? সে চিত্র ত পুরাণে নাই। তাই তিনি প্রতিভাশক্তিবলে সেই অতুলনীয় প্রেমানুরাগের চিত্র নিজ কল্পনা হইতেই সৃষ্টি করিলেন। সে কল্পনা ঋষিকন্যার না হউক, গৃহস্থ কুমারীর পূর্ব্বরাগ-প্রকাশের যে সকল অপূর্ব্ব চিত্রে পূর্ণ ছিল, সেই অপূর্ব্ব প্রেমচিত্রাবলি দিয়া ঋষিকন্যা শকুন্তলাকে ভূষিতা করিলেন। তাই আমরা কালিদাসের শকুন্তলাকে এক অপূর্ব্ব নবানুরাগিণী রমণীরত্নরূপে দেখিতে পাই। সে রমণীরত্ন সাধারণ জনগণের কল্পনার সহিত সমঞ্জসীভূত হইয়া সকলেরই মনোমোহিনী হইয়াছে। চিত্রের উজ্জ্বলতায় ও বিমোহনে ঋষিকন্যা অন্তর্হিত হইয়া পড়িয়াছেন। এই কাব্যবিভ্রমগুণে কালিদাসের শকুন্তলা জগজ্জনের অতি প্রিয় সামগ্রী হইয়াছে।

রাজা দুষ্মন্তকে দর্শনাবধি যত দিন যাইতে লাগিল, কালিদাসের শকুন্তলার পূর্ব্বানুরাগ ততই বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। বিরহ ক্রমশই প্রেমকে বাড়াইতে লাগিল। তাই কালিদাসের শকুন্তলা প্রেমপূর্ণা হইয়া আহার-নিদ্রা-পরিত্যাগিনী হইলেন। শকুন্তলা ক্রমে ক্রমে সেই প্রেমে কৃশা হইতে লাগিলেন, যেমন কৃশ রাজা দুষ্মন্ত হইতে-ছিলেন। প্রথম যৌবনরাগে বিহ্বলা শকুন্তলার এ চিত্র—সংসারিণী

কুলবালা-সমুচিত, যেমন সমুচিত সংসারী রাজা দুষ্মন্তের প্রেমচিত্র। তিনি প্রেমানুরাগে যেরূপ অধীরা হইয়া পড়িয়াছিলেন, সেই অধীরতা কেবল রাজকন্যায় শোভা পায়; ঋষিকন্যায় শোভা পায় না। বিবাহের পূর্ব্বে ঋষিকন্যা প্রেমপাগলিনী হইতে পারেন না। তাঁহার ধর্ম্মানুরাগ ঐন্দ্রিয়িক প্রেমানুরাগ হইতে অধিকতর প্রগাঢ়। সেই ধর্ম্মানুরাগে তাঁহার প্রেম সুসংযত। কালিদাসের শকুন্তলার মত ঋষিকন্যার চিত্তচাঞ্চল্য নাই। এমন কি, যখন রাজা তাঁহাকে গান্ধর্ব্ববিধানে বিবাহ করিতে চাহিলেন, তখনও ঋষিকন্যা অতি ধীরভাবে রাজাকে বলিলেন :—

"যদি ধর্ম্মপথস্ত্বেষ যদি চাত্মা প্রভুর্মম।
প্রদানে পৌরবশ্রেষ্ঠ শৃণু মে সময়ং প্রভো॥
প্রতিজানীহি সত্যং মে যথা বক্ষ্যামি তেঽনঘ।
মম জায়েত যঃ পুত্রঃ স ভবেৎ ত্বদনন্তরঃ॥
যুবরাজো মহারাজ সত্যমেতদ্ ব্রবীমি তে।
অভিজ্ঞানঞ্চ রাজেন্দ্র দেহি স্বমঙ্গুরীয়কম্।
যদ্যেতদেবং রাজেন্দ্র অস্তু মে সঙ্গমস্ত্বয়া॥"

পদ্মপুরাণ।

"যদি ধর্ম্মপথ এইরূপই এবং আত্মাই যদি আমার প্রভু হয়, তাহা হইলে পৌরবশ্রেষ্ঠ! আমি যে নিয়ম বলিতেছি, তাহা শ্রবণ করুন। অনঘ! আমি যাহা বলিব, আপনাকে তদ্বিষয়ে সত্য প্রতিজ্ঞা করিতে হইবে। আমার গর্ভে যে পুত্র জন্মিবে, সে আপনার পর যুবরাজ হইবে। মহারাজ! আমি ইহা সত্য বলিতেছি।, রাজেন্দ্র! অভিজ্ঞানস্বরূপ স্বীয় অঙ্গুরীয় আমাকে প্রদান করুন। যদি এই নিয়মে সম্মত হন, তাহা হইলে আমাকে বিবাহ করুন।"

এই সকল বাক্যে ঋষিকন্যা শকুন্তলার চিত্তের ধীরতা ও দৃঢ়তা কেমন প্রকাশিত হইতেছে। শুধু তাহাই হইয়াছে এমন নহে,

সেই প্রাচীনকালের রীতি অনুসারে তিনি জানিতেন, কন্যাকাল অতীত হওয়াতে স্বয়ং পাত্রনির্ব্বাচনপূর্ব্বক আমার নিজ ইচ্ছামত বিবাহ করিবার অধিকার হইয়াছে।

শকুন্তলা যে এইরূপ ইচ্ছাবরা হইবার উপযুক্ত হইয়াছিলেন, তাহার প্রমাণস্বরূপ পুরাণেই দেখিতে পাওয়া যায়, বিবাহের পর রাজসংসর্গমাত্রেই তিনি গর্ভবতী হইয়াছিলেন এবং মহর্ষি কণ্বও গৃহে প্রত্যাগমনপূর্ব্বক তাঁহার বিবাহে সম্মতিদান করিয়া সে বিবাহকে ধর্ম্মপথই বলিয়াছিলেন। কারণ, মনু বলিয়াছেন :—

"ত্রীণি বর্ষাণ্যুদীক্ষেত কুমার্য্যৃতুমতী সতী।
ঊর্দ্ধন্তু কালাদেতস্মাদ্বিন্দেত সদৃশং পতিম্‌॥
অদীয়মানা ভর্ত্তারমধিগচ্ছেদ্‌ যদি স্বয়ম্‌।
নৈনঃ কিঞ্চিদবাপ্নোতি ন চ যং সাধিগচ্ছতি॥"

৯ম অধ্যায়। ৯০।৯১।

"ঋতুমতী হইলেও কুমারী তিন বৎসর কাল অপেক্ষা করিয়া আপন উপযুক্ত পতি নির্ব্বাচন করিয়া লইবে। পিত্রাদি কর্ত্তৃক অদীয়মানা কন্যা যদি যথাকালে স্বয়ং কোন পুরুষকে পতিরূপে বরণ করে, তবে তাহার তাহাতে কিছুমাত্র পাপ নাই এবং উক্ত ভর্ত্তারও কোন দোষ নাই।"

সেই জন্য রাজা দুষ্মন্ত যখন শকুন্তলাকে বলিয়াছিলেন,—এক্ষণে এই বিবাহকার্য্যে তোমার আত্মাই তোমার প্রভু, তখন তিনিও স্থিরচিত্তে তাহা বুঝিয়া রাজাকে বলিয়াছিলেন,—"যদি ধর্ম্মপথ এইরূপ হয় এবং আত্মাই যদি আমার প্রভু হয়, তবে হে পৌরবশ্রেষ্ঠ! আমার ইচ্ছামত প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলে আমি আপনাকে বিবাহ করিতে পারি।" শুধু তাহাই নহে; তখনকার কালে লোকে ধর্ম্মপরায়ণ হইয়া অগ্রে পুত্রেরই কামনা করিতেন। ঋষিকন্যার প্রতিজ্ঞাবাক্যে সেই ধর্ম্মপরায়ণতাপ্রকাশিকা পুত্রকামনাই প্রবলা হইয়াছিল। অতি

ধীরভাবে রাজাকে প্রতিজ্ঞাবাক্যে আবদ্ধ করিয়া তবে তিনি তাঁহাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। এরূপ ধর্ম্মপরায়ণতা, ধীরতা, স্থিরচিত্ততা ও গাম্ভীর্য্য ঋষিকন্যারই সমুচিত। ঋষিকন্যার এ অপূর্ব্ব চিত্র।

কিন্তু কালিদাসের শকুন্তলা কি করিয়াছিলেন? তিনি প্রেমে অধীরা হইয়া অগ্রেই মনের দ্বার খুলিয়া দিয়াছিলেন।

পুরাণে দেখিতে পাওয়া যায়, রাজাকেই প্রথমে বিবাহপ্রার্থনা জানাইতে হইয়াছিল। নাটকে তাহা ঘটে নাই। সেখানে সখীদ্বয় শকুন্তলার হইয়া রাজার নিকট তাঁহার প্রেমবিকারের শান্তি-সাধনোপায় প্রার্থনা করিয়াছিলেন। তাহাতে শকুন্তলা বলিয়াছিলেন :—

"অনসূয়ে! অন্তঃপুরকামিনীদিগের বিরহে উৎকণ্ঠিতচিত্ত এই রাজর্ষিকে উপরোধ করার প্রয়োজন নাই।"

তাই অনসূয়া রাজাকে বলিলেন :—

"আমরা শুনিয়াছি যে, এক এক রাজার বহুতর বল্লভা থাকে, তবে যাহাতে আমাদের এই প্রিয়সখী বন্ধুবর্গের শোচনীয়া না হন, মহারাজ তাহাই করিবেন।"

তাহাতে রাজাকে কাজেই বলিতে হইল :—

"পরিগ্রহবহুত্বেঽপি দ্বে প্রতিষ্ঠে কুলস্য মে।
সমুদ্রবসনা চোর্ব্বী সখী চ যুবয়োরিয়ম্॥"

"ভদ্রে! অধিক কথার প্রয়োজন নাই, যদিও আমার বহুতর ভার্য্যা আছে, তথাপি সমুদ্রবসনা পৃথিবী ও তোমাদিগের এই প্রিয়সখী, এই দুইটীই আমার কুলের গৌরবস্বরূপ বলিয়া জানিবে।"

বহুভার্য্যা থাকিলে গৃহস্থ কামিনীগণ যেমন তাহাদিগের প্রতি বিদ্বেষভাবপ্রকাশক বাক্য বলিয়া থাকেন, এস্থলে রাজাকে লক্ষ্য করিয়া কাম-পীড়িতা শকুন্তলাও প্রেমাকাঙ্ক্ষিণী হইয়া সেইরূপ

শ্লেষোক্তি করিয়াছিলেন। রাজা যেন তাঁহাকেই বিশিষ্টরূপে সমাদর করেন, এই কথা রাজার মুখ হইতে বাহির করাইবার জন্যই এই বিদ্রূপ। সেই বিদ্রূপের তাৎপর্য্য অনসূয়া প্রকাশ করিয়া দিলে, রাজা যে শকুন্তলাকেই একান্ত সমাদর করিবেন, এরূপ প্রতিশ্রুত হইলেন। তৎপরে তাঁহাদিগের বিবাহ হইয়া গেল।

সংসারিণীর লজ্জাবশতঃ শকুন্তলা এস্থলে নিজে রাজাকে কোন কথা বলেন নাই। তিনি অনসূয়াকে সম্বোধনপূর্ব্বক রাজাকে উক্ত বিদ্রূপ-বাণ নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। সংসারিণীর মত তিনি রাজার কেবল প্রীতি ও আদরেরই প্রার্থিনী হইয়াছিলেন। যে তেজে ঋষিকন্যা শকুন্তলা রাজাকে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করিয়া লইয়াছিলেন, সে তেজ করিবার তাঁহার উপায় ছিল না। কারণ, তিনি নিজেই বিবাহের প্রার্থিনী। সেই জন্যই কি ঋষিকন্যার এত তেজ? ঋষিকন্যার স্বভাবতই এত ধর্ম্মবল ছিল যে, তিনি হৃদয়ানুরাগ সংযত করিয়া রাখিতে পারিতেন। সেইরূপ রাখিয়াই তিনি রাজার উপর বিজয়িনী হইয়া অতি দৃঢ়তা-সহকারে রাজসমীপে নিজ সংকল্প বলিতে পারিয়াছিলেন। তাঁহার এই তেজের পূর্ণবিকাশ দেখিতে পাই, যখন তিনি রাজসভা-মাঝে স্বামিসকাশে রাজা দুষ্মন্ত কর্ত্তৃক প্রত্যাখ্যাত হইয়াছিলেন। সেরূপ তেজস্বিতা আর কোন নারীতে কখন দেখিয়াছি বলিয়া স্মরণ হয় না। সতীর সেই তেজ তাঁহার ধর্ম্মবলে উৎপন্ন হইয়াছিল। ঋষিকন্যার সেই তেজ তাঁহার শিক্ষা-গুণে জন্মিয়াছিল। আশ্রমবাসিনীর সেই তেজ তাঁহার শাস্ত্রজ্ঞানে উদয় হইয়াছিল। মহাভারতে দেখিতে পাওয়া যায়, তাঁহার অগ্নিসম বাক্যে, তাঁহার শাস্ত্রীয় যুক্তিতে এবং তাঁহার ধর্ম্মতেজে পরাভূত হইয়া অবশেষে রাজাকে মস্তক পাতিয়া তাঁহাকে গ্রহণ

করিতে হইয়াছিল। ঋষিদিগের ন্যায় ঋষিকন্যা শকুন্তলা তেজস্বিনী ছিলেন। সেই তেজে তিনি একদা রাজা দুষ্মন্তকেও অভিসম্পাত করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। এই ঋষিকন্যা শকুন্তলায় যে তেজ দেখিয়াছি, আর কোন ঋষিকন্যায় তদ্রূপ তেজ দেখি নাই বলিয়া তাহা নূতন; নূতন হইলেই হইবে না, তাহা ধর্ম্ম-প্রণোদিত বলিয়া অতি উৎকৃষ্ট এবং সাধ্বী সাবিত্রীর তেজের ন্যায় সতীর তেজ বলিয়া উপাদেয় ও মধুর। সেই তেজ দেখিলে বিস্ময়াপন্ন হইতে হয়। এজন্য সেই তেজ সর্ব্বতোভাবে অপূর্ব্ব। ঋষিকন্যা শকুন্তলা সর্ব্বতোভাবে অপূর্ব্ব সৃষ্টি।

গ্রন্থের ফল বা অধ্যয়ন-ফল।

বিলাতী ঔপন্যাসিক আদর্শের ফল।

উপন্যাস এবং আখ্যায়িকা প্রায়ই দুই ভাগে বিভক্ত হইতে দেখা যায়—ঘটনা-প্রধান এবং লোকচরিত্র-প্রধান। আরব্য, ও পারস্য উপন্যাসাদি ঘটনাপ্রধান। তাহাতে ঘটনার উপর ঘটনা, সুশৃঙ্খলাক্রমে পুঞ্জে পুঞ্জে উপস্থিত হইয়া উপক্রম হইতে উপসংহারে উপনীত হয়। তাহার উদ্দেশ্য লোকচরিত্র প্রদর্শন করা যত না হউক, ঘটনাপুঞ্জদ্বারা সমাকৃষ্ট করিয়া চিত্তরঞ্জন করাই তাহার প্রধান উদ্দেশ্য। অনেক বিলাতী উপন্যাসও এই শ্রেণীভুক্ত। এক এক বিশেষ রস আশ্রয় করিয়া এই ঘটনাপুঞ্জ মেঘমালার ন্যায় ঘনীভূত হইতে থাকে। কোন গল্পে অদ্ভুত রস, কোনটীতে আদি রস, কোনটীতে বীর রস সঞ্চারিত হইয়া ক্রমেই প্রবর্দ্ধিত হইতে থাকে। লোকচরিত্রপ্রধান উপন্যাস ও আখ্যায়িকায় সেই চরিত্রমাত্র চিত্রিত করিবার জন্যই ঘটনাসকল অবলম্বিত হয়। যেরূপ সংস্থানে আনিলে সেই চরিত্রের সুন্দর বিকাশ হয়, তাহাই ঘটাইবার জন্য যথোপযুক্ত ঘটনা যোজনা করা হয়। বিলাতী সাহিত্য এই শ্রেণীর উপন্যাস ও আখ্যায়িকার পরিপূর্ণ। তাহারই দেখাদেখি বাঙ্গালা সাহিত্যে এক্ষণে এই শ্রেণীর উপন্যাস বহুল পরিমাণে সৃষ্ট হইতেছে। বিলাতী সাহিত্যের আদর্শে বাঙ্গালায় এক্ষণে যে নাটক নভেলের সৃষ্টি হইতেছে, আমরা স্বীকার করি, তাহার অনেক স্থলেই সুন্দররূপে

মানবপ্রকৃতি চিত্রিত হইয়াছে এবং সেই প্রকৃতিচিত্রে লোকচরিত্র প্রদর্শিত হইয়াছে। কিন্তু এই চিত্রাবলিতে একদেশদর্শিতারই অধিক পরিচয় পাওয়া যায়। মানব কি কেবলই পশুপ্রকৃতি লইয়া জন্মিয়াছে? না, তন্মধ্যে দেবপ্রকৃতিও আছে? যদি দেব-প্রকৃতি থাকে, তবে সেই প্রকৃতিরই মহত্ব ও গৌরব অধিক? না, পাশবপ্রকৃতির গৌরব অধিক? কিন্তু বিলাতী আদর্শে একণে যে সকল উপন্যাসের সৃষ্টি হইতেছে, তাহার অধিকাংশেই সুরাপায়ী, হত্যাকারী, চোর, ডাকাত, লোভী, পাপী, শঠ, লম্পট প্রভৃতি দুরাচার পাশবপ্রকৃতির চিত্রই অতি উজ্জ্বলবর্ণে চিত্রিত দেখিতে পাওয়া যায়। তন্মধ্যে যদি কিছু দেবচিত্র থাকে, যদি কোন সাধু-সজ্জনের চরিত্র অঙ্কিত থাকে, তাহার বর্ণরাগ এত অনুজ্জ্বল যে, পাপচিত্রসকলের উজ্জ্বলতায় তাহা নিষ্প্রভ দেখায়; সেই পাশব-চিত্রসকলই উদ্ভাসিত হইয়া মনে অঙ্কিত হইয়া যায়। সুতরাং, সমগ্র গ্রন্থপাঠের অধ্যয়নফলস্বরূপ সেই পাপচিত্রগুলিই মনে জাগিতে থাকে। "সাহিত্য-চিন্তা"য় আমরা একথা বিস্তারিতরূপে আলোচনা করিয়াছি।

এই সমস্ত পাপচিত্রময় গ্রন্থের সমর্থনার্থ লোকে বলিয়া থাকেন, পাপের দণ্ড ও কুফল প্রদর্শন করাই তাহাদের লক্ষ্য। লোককে তদ্রূপ পাপপথ হইতে বিরত করাইবার জন্যই তাহাদের সৃষ্টি। আমরা বলি, তদ্দ্বারা এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হওয়া দূরে থাক্, বরং ঠিক্ বিপরীত ফলই ফলে। এ সংসারের চারিদিকেই দুরাচার, পাপ ও পাপের কুফল সর্ব্বত্র এবং সর্ব্বদা ঘটিতেছে। একবার চক্ষু চাহিবার অপেক্ষা; ঘরে বাহিরে যে দিকে চাও, সেই দিক দুরাচার, পাপ এবং পাপের দণ্ডভোগ দেখিতে পাইবে। তদ্দ্বারা কয়জন

লোক শিক্ষিত ও শাসিত হয়? যদি হয়, তবে তাহার আবার অনুচিত্র আঁকিবার আবশ্যক কি? প্রকৃত ঘটনাপুঞ্জ ও রাশিরাশি পাপের দণ্ডভোগ কি প্রচুর নহে? প্রকৃত ঘটনা অপেক্ষা কি অনুকৃতি অধিকতর উজ্জ্বল? যদি প্রকৃত ঘটনার অভাব হইত, তবে বটে কাল্পনিক ঘটনার সৃষ্টি আবশ্যক হইত। কিন্তু যখন প্রকৃত ঘটনা আমাদিগের চারিদিক্ বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে, তখন আর তাহার অনুকরণ করা কেন? করিলে এই অনিষ্ট হইতেছে, পাপেই আমাদের আমোদ ও অনুরক্তি জন্মিতেছে।

খুনান্ত নাটক-নভেলের অধ্যয়ন-ফল।

"সাহিত্য-চিন্তা"য় বলিয়াছি, পাপের ঘৃণিত মূর্ত্তি ও ভীষণ পরিণাম দেখাইয়া পাপ-পথ হইতে মানুষকে নিবৃত্ত করিবার বিশিষ্ট উপায় বলিয়া ইউরোপীয় সমালোচকগণ খুনান্ত নাটকের আসুরিক সৃষ্টির সমর্থন করিয়া থাকেন। কিন্তু এ যুক্তি সঙ্গত নহে। পাপের মূর্ত্তি দেখাইতে গিয়া সেই পাপকে এত অসামান্য আকারে ভয়ঙ্কর করা কেন, যে তাহা খুনে আসিয়া পর্য্যবসিত হয়? লোকের সামান্য পাপ-প্রবৃত্তি সচরাচর তত ভয়ানক মূর্ত্তি ধারণ করে না। খুনান্ত নাটক-নভেলে যে পাপ অঙ্কিত হয়, তাহা ক্রমে গভীর হইতে গভীরতর, ভয়ানক হইতে অতি-ভয়ানক হইতে থাকে—এত ভয়ানক যে, অবশেষে তাহার পরিণামে খুন আসিয়া উপস্থিত হয়; কারণ, সেইরূপ করাই খুনান্ত-কাব্যের অভিপ্রেত। পাপের এত ভয়ানক মূর্ত্তি কি সংসারের কার্য্যক্ষেত্রে সচরাচর দেখা যায়? সংসারের বাস্তবিক কার্য্যক্ষেত্রে সেরূপ খুনের চিত্র সর্ব্বদা দেখিতে পাওয়া যায় না বলিয়া লোকসমাজের কল্পনাক্ষেত্র তদ্রূপ চিত্রে

কলঙ্কিত হইবার অল্পই সম্ভাবনা ঘটে। তাই যদি হয়, তবে খুনের চিত্রকে সাহিত্য-মধ্যে সুরক্ষিত করিয়া চিরকাল সে চিত্রকে স্থায়ী করিবার আবশ্যকতা কি? সাহিত্য-মধ্যে সেরূপ চিত্র চিরদিনের জন্য পরিস্থাপিত হইলে তাহার ফল এই হয় যে, মানুষের কল্পনায় সেই সাহিত্যের খুন এবং বাস্তবিক কর্ম্মক্ষেত্রে খুন, এই দ্বিবিধ খুন-চিত্র সমুদিত থাকিয়া সেই কল্পনাকে সর্ব্বদা খুন-চিত্রে পূর্ণ করে। প্রতি কবি বা উপন্যাসকার যদি দুই চারি খানি ট্র্যাজিডি-ধাতুর চিত্র আঁকিয়া যান, তবে জাতীয় সাহিত্য-মধ্যে কত খুন-চিত্রের একত্র সমাবেশ হয়? তাহার উপর আবার রঙ্গালয়ে নাটকাভিনয়ের খুন। বিলাতী কাব্য, ইতিহাস, নাটক এবং উপন্যাসাবলি এইরূপ অশেষ খুনময় চিত্রে পরিপূর্ণ। তদ্রূপ সাহিত্যের অনুকরণ বাঙ্গালাভাষায় কেন? অনুকরণ করিবার আর কি সামগ্রী নাই?

বিলাতী সমালোচকেরা বলেন, ম্যাকবেথ প্রভৃতি ট্র্যাজিডির উপদেশ এই যে, কোন কারণ-বশতঃ মানুষ যদি একবার খুন করে, সেই খুন হইতে তাহার সাহস বাড়ে এবং খুনের দিকে সে আরও অগ্রসর হয়। এক খুন মানুষকে আর এক খুনে টানিয়া আনে। তাই লোকে কথায় বলে যে, যে সর্ব্বদা মনে মনে করে আমি গলায় দড়ী দিব, তাহাকে গলায়-দড়ী-দেওয়া ভূতে ধরে। এ কথা সত্য। তাই বিলাতী সমালোচকগণ বলেন, প্রথম খুনে যাহাতে লোকের প্রবৃত্তি না জন্মে, এমত উপায় অবলম্বনীয় এবং সেই উপায়ই ট্র্যাজিডি। যদি বল, ট্র্যাজিডি লোককে প্রথম খুন হইতে বিরত ও সতর্ক করে, সে কথার উত্তরে আমরা বলি, সমাজস্থ যে ভদ্র-জনগণ সেই ট্র্যাজিডির পাঠক, তাঁহারা কি কেবল খুন করিতেই অহরহঃ প্রবৃত্ত যে, সেরূপ খুনের প্রবৃত্তি যাহাতে নিবারিত হয়,

এরূপ উপায় করাই উচিত? লোকে হাজার পাপী হইলেও খুন করিতে কেহ সহসা প্রবৃত্ত হয় না। খুন, অধিকন্তু বদ্‌রোগী ইতরলোক-মণ্ডলী-মধ্যে এবং কখন কখন রাজ-সংসারে পরিদৃষ্ট হয়; ভদ্রসমাজে খুনের দৃষ্টান্ত খুব কম। ভদ্রসমাজ-মধ্যে কিন্তু বিদ্যালোচনার আধিক্য-বশতঃ সেই সমাজস্থ লোকমণ্ডলী-মধ্যে ট্র্যাজিডি ধাতুর সাহিত্যের বিস্তর পাঠক। তাই যদি হয়, তবে ট্র্যাজিডি ধাতুর সাহিত্য বহুল সৃষ্টি করিয়া সেরূপ লোকের কল্পনাকে কলঙ্কিত করা কেন? পাপের মূর্ত্তি এত প্রলোভনীয় যে, তাহার দণ্ড ও ফলাফল অতি উজ্জ্বল বর্ণে আঁকিয়া রাখিলেও মানব সে ফলাফল মনে করিয়া পাপ হইতে নিবৃত্ত হয় না। বেশ্যাসক্তি বা পানাসক্তি হইতে যে অশেষ দুঃখ, সন্তাপ ও শাস্তি হয়, কয় জন লোক তাহা না জানে? জানিয়া শুনিয়াই বা কয় জন লোক সেইরূপ পাপাসক্তি হইতে বিরত হয়? খুনের যে অশেষ সন্তাপ ও নরক-ভোগ, তাহা কি আরঙ্গীব কিম্বা বনবীরকে তৎকার্য্য হইতে নিবৃত্ত করিতে পারিয়াছিল? তাই যদি হয়, তবে সেরূপ ঘোর পাপের ফলাফল দেখাইবার প্রয়োজন কি? দেখাইলেই কি আর ভবিষ্যতে আরঙ্গীব ও বনবীর জন্মিবে না? ঘোর লোভের বশবর্ত্তী হইয়া যে খুন করিবে, তাহাকে কি বিছুতে খুন হইতে বিরত করিতে পারে? দুর্য্যোধন ও রাবণ কি শত উপদেশে পাপপথ ও যুদ্ধ হইতে বিরত হইয়াছিল? আমরা এমত কথা বলিতে চাহি না যে, একেবারেই পাপ-চিত্র আঁকিবে না; আঁকিবে বৈকি। পুণ্যময় চিত্রকে দ্বিগুণ উজ্জ্বল করিবার নিমিত্ত পাপের কলঙ্ক-রেখা-পাত করা উচিত; পুণ্যের সঙ্গে পাপকে দেখাও। পুণ্যের সঙ্গে সঙ্গে পাপকে দেখাইতে হইলে গ্রন্থের অভ্যাসগুণে যেন পুণ্য

দিকই গুরুতর এবং অধিকতর সমুজ্জ্বল হয়, এমত করিয়া চিত্র আঁকা চাই। পাপকে চিত্রিত করা যেন মুখ্য উদ্দেশ্য না হয়, পুণ্যকে সমুজ্জ্বল করাই যেন গ্রন্থের মুখ্য উদ্দেশ্য হয়।

পুণ্যাদর্শের ফল।

পাপ যেমন সংসারে প্রচুর এবং সর্ব্বত্র পরিদৃশ্যমান, পুণ্য তেমনি বিরল এবং অদৃশ্য। লোকে দুরাচারী পাপিগণকে যেমন সর্ব্বত্র এবং সর্ব্বদা দেখিতে পায়, সাধুগণকে তত দেখিতে পায় না। সাধুলোকে গা ফুলাইয়া বলিতে আসে না, দেখগো আমি কেমন সাধু। লোকের পুণ্যকর্ম্ম অতি নিঃশব্দে কৃত হয়। সাধুগণ নির্জ্জনে বসিয়া ধর্ম্মকর্ম্ম সাধন করেন। তাঁহাদের দৃষ্টান্তের গণ্ডীর মধ্যে যাঁহারা আসেন, তাঁহারা উদ্ধার হইয়া যান। ধর্ম্মের প্রভাব এমনি,—গৌরব এতই অধিক! ধর্ম্ম এবং সৎকার্য্যের দৃষ্টান্ত অনেক স্থলেই বিফল হয় না। যদি দশজন সৎপথে আসে, তাহাই লাভ। অন্য লাভ এই, তদ্দ্বারা কিছুই অনিষ্টসাধন হয় না। পুণ্য দৃষ্টান্ত কোন স্থলে বিফল হইলেও হানি নাই। যাহা লোকলোচনের অদৃশ্য, অথচ যাহার গৌরব এত অধিক, তাহাকে সুদৃশ্যমান করাইবার জন্য পৌরাণিক কাব্যাবলি পরিপূর্ণ। কারণ, তাহাই চিরদিনের জন্য রক্ষণীয়। তন্মধ্যে যে পাপচিত্র আছে, তাহা বরং পুণ্যের ও ধর্ম্মের গৌরবকেই দ্বিগুণ বর্দ্ধিত করিয়াছে। এই পৌরাণিক সাহিত্যের পরিবর্ত্তে যে অবধি বিলাতী আদর্শের ঔপন্যাসিক সাহিত্যের এ দেশে প্রচলন হইয়াছে, তদবধি সেই সাহিত্যের পাঠক ও পাঠিকাগণের আমোদ সেই দিকেই গিয়াছে। পাপ এবং খুন হইয়া যাহাদের সতত চিত্তরঞ্জন হয়, তাহাদের প্রবৃত্তি কি কখন

ভাল থাকিতে পারে? প্রবৃত্তি সেই পাপ এবং খুনেই প্রমত্ত হয়। তাই বলি, বঙ্গসমাজে এক্ষণে লোকের প্রবৃত্তি পাপপথে অধিকতর ধাবিত এবং খুনে অসঙ্কুচিত। এইরূপ কুফল অবশ্যম্ভাবী বলিয়া আমাদের ঋষিগণ যে পুরাণাদির সৃষ্টি করিয়া গিয়াছিলেন এবং আমাদের কবিগণ যে পৌরাণিক কাব্যাদির রচনা করিয়া গিয়াছেন, তাহাতে পুণ্যচিত্রের উজ্জ্বলতায় পাপ নিষ্প্রভ হইয়াছে, এবং খুনে পর্য্যবসিত হয় নাই। যে সাহিত্য-পাঠে লোকের কল্পনা এবং প্রবৃত্তি কলুষিত হয়, সে সাহিত্যের প্রচার বন্ধ করাই উচিত। কিন্তু যে সাহিত্য-পাঠে লোকের মন ধর্ম্মামোদেই প্রমত্ত হয়, সেই সাহিত্যেরই কি প্রচার হওয়া উচিত নহে? পৌরাণিক কাব্য ও নাটকাদির কাব্যরসে চিত্ত আর্দ্র হইলে যে আনন্দের সঞ্চার হয়, সে আনন্দ ধর্ম্মেরই আনন্দ এবং তদঙ্কিত ধর্ম্মাদর্শের চিত্রসকল মনকে চিরদিনের জন্য অধিকার করিয়া থাকে। তাই, ভবভূতির সীতা ও রামচন্দ্রের চিত্র, চিরদিনের জন্য ভারতবাসীর হৃদয়ে সঞ্জীবিত রহিয়াছে। সঞ্জীবিত থাকিয়া আজও কত ভারতবাসীকে রামচন্দ্রের মত কর্ত্তব্য-পরায়ণ ও পত্নীপ্রেমে একনিষ্ঠ এবং কত ভারতললনাকে সীতার আদর্শে সংগঠিত করিতেছে।

জীবনচরিতের অধ্যয়ন-ফল।

আমরা বিলাতী সাহিত্যে যেমন প্রচুর নাটক-নভেল ও ইতিহাস দেখিতে পাই, তেমনি জীবন-চরিতও দেখিতে পাই। সেই জীবন-চরিতের সাহিত্যে দেখা যায়, সেই জীবন-চরিতেরই সমধিক গৌরব, যাহাতে জীবনের সমস্ত ঘটনা বর্ণিত হয়। এজন্য তন্মধ্যে জীবনের সামান্য অসামান্য ভাল মন্দ সর্ব্ববিধ ঘটনাই সন্নিবেশিত

করা হয়। তজ্জন্য এক একখানি জীবন-চরিত ফুলিয়া ফুলিয়া বৃহৎ হইয়া পড়ে। সেই জীবন-চরিতের অধ্যয়ন-ফল কিরূপ দাঁড়াইল, তৎপ্রতি কিছুই দৃষ্টি নাই। যতদূর পাওয়া যায়, জীবনের ঘটনাবলি দিতে পারিলেই জীবন-চরিত সম্পূর্ণ হইল। জীবন-চরিত সম্পূর্ণ হইল বটে, কিন্তু সেই জীবন-চরিতদ্বারা যাঁহার জীবন-চরিত, তাঁহার গৌরববৃদ্ধি হইল কি না, তাহা বিচার করা হয় না। ডাক্তার সেমুয়েল জনসনের জীবন-চরিত দেখ। বসওয়েল যে জীবন-চরিত দিয়াছেন, তাহাতে বোধ হয়, কোন বিষয়ের আর ফাঁক পড়ে নাই। তজ্জন্য বিলাতী সাহিত্যে তাহা একখানি উৎকৃষ্ট জীবন-চরিত বলিয়া প্রসিদ্ধ। কিন্তু সেই জীবন-চরিতদ্বারা জনসনের গৌরব বৃদ্ধি হইয়াছে? না, তাহার গৌরবের লাঘব করা হইয়াছে? সেই জীবন-চরিত পাঠের অধ্যয়ন-ফল কিরূপ হয়, তাহা লর্ড মেকলে বর্ণন করিয়াছেন। জনসনের গ্রন্থাদি পড়িয়া জনসনের প্রতি আমাদের যে ভক্তি হয়, তাঁহার জীবন-চরিতপাঠে সে ভক্তি বহুদূরে উড়িয়া যায়। তাই যদি হয়, যদি শিব গড়িতে গিয়া বাঁদর গড়া হয়, তবে সেরূপ জীবন-আখ্যায়িকা লিখিবার প্রয়োজন ছিল কি? এইরূপ গৌরবহ্রাস হয় বলিয়া আর্য্য-সাহিত্যে তদ্রূপ জীবন-চরিত লিখিবার রীতি ছিল না। তা বলিয়া পৌরাণিক আর্য্য-সাহিত্যে যে একেবারে লোকের জীবন-চরিত নাই, এমনও নহে। ঋষিদিগের, তপস্বিগণের, সাধু ও সাধকগণের জীবন-চরিত-মধ্যে যাহা যাহা তাঁহাদিগকে গৌরবে উত্তোলিত করিয়াছে, যাহা যাহা জানিলে পাঠককে তদ্রূপ গৌরব-পথে উত্তেজন করিতে পারে, কেবলমাত্র সেই সকল ঘটনা বর্ণিত হইয়াছে। বাকী সমস্ত সামান্য ঘটনা পরিত্যক্ত হইয়াছে।

পরিত্যক্ত হইয়াছে এইজন্ত যে, সে সকল জানিলে কোন ফললাভ নাই। বাস্তবিক যাহা কিছু সামান্ত, যাহা সচরাচর লোক-সমাজে পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে, যাহা দোষপূর্ণ হউক আর না হউক, কিন্তু যাহাতে গৌরব কিছু নাই, সে সকল বিষয় লিপিবদ্ধ করিয়া গ্রন্থের কলেবর এবং গ্রন্থসংখ্যার বৃদ্ধি করা বৃথা ও নিষ্প্রয়োজন। মহাজনগণের জীবনীতে শুধু যে সামান্ত সামান্ত ঘটনা পরিত্যক্ত হইয়াছে এমত নহে; চরিত্র-গত দোষসকলও বর্জ্জিত হইয়াছে। বর্জ্জিত হইয়াছে এই জন্ত যে, সেরূপ দোষোল্লেখদ্বারা বরং বিপরীত ফল হইবারই সম্ভাবনা। জীবন-চরিতের উদ্দেশ্ত সাধুদৃষ্টান্ত-প্রদর্শন। কিন্তু অসাধু কার্য্যাদির উল্লেখ করিলে, তদ্রূপ অনুষ্ঠান ও কার্য্যাদির একপ্রকার প্রশ্রয় দেওয়া হয়। যে সকল লোক তদ্রূপ দোষাশ্রিত, তাহারা বলিয়া উঠে, আমরা ত সামান্ত, অমুক অমুক বড় বড় লোকেরাও এ সকল দোষ হইতে মুক্ত হইতে পারেন নাই। কেবল কি আমাদের বেলাই দোষ, আর বড় লোকের বেলা দোষ নয়? এই জন্তই বলি, বিলাতী রীতি-অনুসারে যে সকল জীবন-চরিত লিখিত হয়, তাহা দোষরাশির এত আবর্জ্জনা-পূর্ণ যে, সেই আবর্জ্জনার পূতিগন্ধে বিশেষ অনিষ্ট ঘটিয়া থাকে। বিলাতী জীবন-চরিতে দেখিবে, ভাল-মন্দ, সামান্ত-অসামান্ত, জীবনীর সর্ব্ববিধ কার্য্যাদি ও ঘটনা স্থানলাভ করিয়াছে। সুতরাং সেরূপ জীবন-চরিতের অধ্যয়ন-ফল অতি কদর্য্য হইয়া দাঁড়ায়। বিলাতী সাহিত্যের দেখাদেখি, আজকাল সেইরূপ জীবন-চরিত বাঙ্গালা সাহিত্যে প্রকাশিত হইতেছে। আমরা বলি, সেরূপ জীবন-চরিত প্রকাশ করা অপেক্ষা চুপ করিয়া থাকা ভাল। সেই জন্তই দোষপূর্ণ মহাজনেরা মৃত্যুপূর্ব্বে আপনাদের জীবন-চরিত লিখিতে বারণ করিয়া যান।

আর্য্যসাহিত্যে ইতিহাস ও তাহার অধ্যয়ন-ফল।

বিলাতী সাহিত্যে যাহা ইতিহাস (History) বলিয়া প্রথিত, নৃপতিবর্গের সেই ধারাবাহিক বিবরণ, লোভের প্রতিমূর্ত্তিস্বরূপ রাজগণের পাপ-বৃত্তান্ত, আর্য্যসাহিত্যে স্থানলাভ করিতে পারে নাই। তবে কি রাজাদিগের কোন বিবরণই আর্য্য-সাহিত্যে রক্ষিত হয় নাই? পুরাণে আমরা অনেক রাজবংশের বিবরণ দেখিতে পাই। সেই বিবরণ-মধ্যে আমরা সামান্য সামান্য রাজাদিগের কেবল নামোল্লেখমাত্র দেখি। তাঁহাদিগের সামান্য ক্রিয়াকলাপ বা পাপাচারের বৃত্তান্ত সাহিত্য-মধ্যে রক্ষণীয় নহে বলিয়া রক্ষিত হয় নাই। তবে সেই রাজাদিগের মধ্যে যাঁহার কোন বিশেষ গুণ এবং গৌরবের বিষয় ছিল, যিনি অসামান্য দাতা, বা ধর্ম্মপরায়ণ, বা কোন রাজগুণে যশোভাজন হইয়াছিলেন, তাঁহার সেই গৌরবের বৃত্তান্ত বিবৃত হইয়াছে। তা বলিয়া তাঁহার জীবনের সামান্য সামান্য ঘটনাবলি উল্লিখিত হয় নাই। কারণ, সেরূপ উল্লেখের ফল নাই। যতটুকু উল্লেখের ফল আছে, ততটুকুই উল্লিখিত হইয়াছে। তবে, যে সকল নৃপতি ধর্ম্মকর্ম্ম-প্রভাবে রাম বা জনকের মত ঋষিত্ব লাভ করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের বিশেষ বিবরণ এবং রাজকার্য্যের বিস্তৃত আলোচনা পুরাণে স্থানপ্রাপ্ত হইয়াছে। কারণ, সেরূপ জীবন-চরিত ও ইতিহাস-পাঠের ফল প্রভূত। অনেকের দিগ্বিজয়েরও প্রসঙ্গ আছে বটে, কিন্তু সে দিগ্বিজয় রাজ্যলোভে কৃত হয় নাই, যজ্ঞের দানধ্যানার্থ। এ সকল পুণ্য ইতিবৃত্ত-পাঠের ফল শুদ্ধ ঐতিহাসিক জ্ঞানমাত্র নহে, তদ্দ্বারা ধর্ম্মলাভও হইয়া থাকে।

আর্য্যসাহিত্যে কিন্তু ইতিহাস আর এক কার্য্য করিয়াছে। আর্য্য-সাহিত্যে ইতিহাস বলিলে শুধু নৃপতিবর্গের বিবরণ বুঝায় না। সে সাহিত্যে মহাভারত একখানি বৃহৎ ইতিহাস। সে ইতিহাস আস্তিকোপাখ্যান প্রভৃতি নানা অদ্ভুত কথায় পরিপূর্ণ। ভীষ্মদেব শান্তিপর্ব্বে নানা ইতিহাস বলিয়া যুধিষ্ঠিরকে বিবিধ অধ্যাত্ম-বিষয় উপদেশ দিয়াছেন। সে ইতিহাসে "সমীরণ" প্রভৃতিও কথা কহিয়া অধ্যাত্মবিদ্যা প্রকাশ করিয়াছে। সুতরাং যাহা আখ্যায়িকা, কথা, উপাখ্যান ও পদ্যাকারে লিখিত, তাহা আর্য্য-সাহিত্যে ইতিহাস বলিয়া গণ্য। সর্ব্বসাধারণকে উপদেশ দিতে হইলে আর্য্য-সাহিত্য ইতিহাস, আখ্যায়িকা প্রভৃতিকেই গরিষ্ঠ উপায় বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে। সেই সাহিত্য, দৃষ্টান্তকেই মহা শিক্ষাগুরু-রূপে গণ্য করিয়াছে। বাস্তবিক, দৃষ্টান্ত দ্বারা যেমন লোক-শিক্ষা হয়, এমন আর কিছুতেই হয় না। আমরা শিশুকালে সাত বৎসর বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত যত শিখিয়াছি, তৎপরে সমস্ত জীবিতকালে তত শিক্ষা করিয়াছি কি না সন্দেহ। পণ্ডিতে শিখিতে পারেন, সামান্য লোকে ত নহে। এমন কি, সেই সাত বৎসরের মধ্যে মাতৃভাষাটা শিখিয়া ফেলিয়াছি। একটা ভাষা শিখিতে কত কাল লাগে! কিন্তু শৈশবে আমরা মাতৃভাষা কেমন অনায়াসে শিখিয়া ফেলি। সে শিক্ষার কি কেহ গুরুমহাশয় আছেন? না, অন্যান্য বিষয় যাহা যাহা শিক্ষা করিয়াছি, তাহারই কেহ গুরুমহাশয় ছিল? সে কালে শিশু-গণ দেখাদেখি এবং শুনিয়া শুনিয়া আপনা আপনি সকলই দৃষ্টান্ত দ্বারা শিক্ষালাভ করে। আরও এক কথা বিচার্য্য। "পিতামাতাকে ভক্তি করিবে"—এইরূপ বিধিবাক্যে শিশুগণকে সাক্ষাৎভাবে কোন কথা বলিলে তাহারা উপদেশ গ্রহণ করে না। তদ্রূপ সাক্ষাৎভাবে

কোন কথা বারণ করিলেও তাহা তত শুনিবে না। এ বিষয়ে (Gay) গে সাহেবের গল্পাবলিতে (Fables) বেশ একটী দৃষ্টান্ত আছে। কোন কুক্কুট তাহার ছানাগুলি লইয়া বেড়াইতে বেড়াইতে এক কূপসন্নিকটে আসিয়াছিল। তথায় আসিয়া ছানাগুলিকে বারণ করিয়া দিল, সাবধান! যেন কেহ তন্মধ্যে উঁকি মারিয়া দৃষ্টি-পাত না করে। এ কথায় কুক্কুট-শিশুগুলির মহা কৌতূহল উদ্রিক্ত হইল। বৃদ্ধ কুক্কুট সেই কথা বলিয়া চলিয়া গেলে, একটি কুক্কুট-শিশু আসিয়া নিজ কৌতূহল নিবারণ জন্য সেই কূপমধ্যে দৃষ্টিপাত করিল। যেমন দেখা, অমনি জলমধ্যে ছায়ারূপী আর একটী কুক্কুট-শাবক দেখা দিল। দুই জনে দ্বন্দ্ব বাঁধিল। অবশেষে সেই কুক্কুট-শিশু কোপাবিষ্ট হইয়া আক্রোশে কূপে যেমন ঝাঁপ দিয়া পতিত হইল, অমনি প্রাণত্যাগ করিল। এজন্য লোকশিক্ষার্থ আর্য্য-সাহিত্যে এরূপ সাক্ষাৎ উপদেশসম্পন্ন Didactick গ্রন্থ একান্ত বিরল। শুধু ভারতীয় আর্য্যসাহিত্যে কেন, আরব পারস্য প্রভৃতি ভাষাতেও তদ্রূপ। সাধারণ লোকশিক্ষার্থ প্রাচ্য রীতিই এই। কিন্তু ইউরোপীয় সাহিত্যে বিভিন্ন রীতি অবলম্বিত হইয়াছে। তাহাতে সাক্ষাৎ উপদেশসম্পন্ন গ্রন্থই বিস্তর, গল্পাদি বিরল। কিন্তু ইদানীন্তন কালে বরং প্রাচ্যরীতি অধিকতর অবলম্বিত হইতেছে। অবলম্বিত হইতেছে কেন? প্রাচ্যরীতির অধিকতর ফল দেখিয়া। পাশ্চাত্য শিক্ষানীতিজ্ঞেরাও এক্ষণে বুঝিতে পারিয়াছেন যে, পশু-পক্ষিপ্রভৃতির দৃষ্টান্ত দেখাইয়া শিক্ষা দিলে, তরুণবয়স্ক বালকবালিকা-দিগের মনে প্রভূত ফল উৎপন্ন হয়। কারণ, সেইরূপ গল্প, আখ্যায়িকা, ইতিহাসাদিতে উপক্রম হইতে উপসংহার পর্য্যন্ত অভ্যাসক্রমে প্রবৃদ্ধি ও পরিণতি সাধিত হওয়াতে বর্ণিত কার্য্যাদির

ফলাফল অতি সুস্পষ্ট প্রদর্শিত হয়। শৈশব হইতে এপ্রকার গল্লাদির শিক্ষা লোকমনে এরূপ বদ্ধমূল হইয়া যায় যে, সেই উপদেশ লোকে আপনা আপনি গ্রহণ করে—চিরজীবন গ্রহণ করে। কিন্তু সাক্ষাৎ নীতি-উপদেশক নিজে সচ্চরিত্র ও সাধু না হইলে, তাঁহার নীতি-উপদেশ নিতান্ত বিরুদ্ধ বোধ হয় এবং সে উপদেশের কোন ফল ফলে না। গল্লাদির উপদেশে এ দোষ ঘটে না। সেই গল্লাদিই নিজে গুরুরূপে শিক্ষাপ্রদ হয় এবং সে শিক্ষা চিরদিন জীবনকে চালিত করে। "সত্যং ব্রূয়াৎ প্রিয়ং ব্রূয়াৎ" প্রভৃতি স্মৃতিশাস্ত্রের সাক্ষাৎ বিধি-নিষেধ-বাক্যাবলি পণ্ডিতগণের শিক্ষার্থ; সাধারণ লোকের জন্য নহে। সেই শ্রুতি স্মৃতিকে লোকসাধারণগম্য করিবার জন্যই ইতিহাসাদির সৃষ্টি। সুতরাং উহাদিগের অধিকারী পাঠার্থী সম্পূর্ণ বিভিন্ন। শ্রুতি-স্মৃতিকে লোকসাধারণগম্য করিবার জন্য যাহার সৃষ্টি, তাহা অতি প্রাচীন কাল হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। নিজে শ্রুতি তাহার পথ দেখাইয়াছে। কোন শ্রুতি-শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত বলিয়াছেন, "ব্রাহ্মণ-গ্রন্থসমূহে যে ভাবে গল্পগুলি সাজান হইয়াছে, আরণ্যকশ্রেণীর উপনিষৎগুলিতেও ঠিক সেই-রূপ মধ্যে মধ্যে গল্পের সন্নিবেশ পরিদৃষ্ট হয়। উপনিষদের বিষয়-গুলি অতীব বিশৃঙ্খলভাবে উপন্যস্ত এবং মধ্যে মধ্যে উপন্যাস ও কল্পিত গল্পদ্বারা বিচ্ছিন্ন। সেই বিষয়গুলি প্রায় কথোপকথনচ্ছলে অবতারিত।" এই উপনিষদের দেখাদেখি শাস্ত্রকারগণ পরম্পরা-ক্রমে উপদেশ দিবার সুফল বিলক্ষণ বুঝিয়া পুরাণাদির সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন, এবং সেই পুরাণাদির দেখাদেখি পরে আর্য্যসাহিত্যে ভূরি ভূরি ইতিহাস, আখ্যায়িকা, কথা প্রভৃতির সৃষ্টি হইয়াছে। উপ-নিষদের রীতি ক্রমে আরব, পারস্য, মিশর প্রভৃতি প্রাচীন সাহিত্যে

গৃহীত হইয়াছিল বলিয়া আমরা দেখিতে পাই, তাহা ক্রমে মিশর হইতে প্রাচীন গ্রীসে প্রবেশ করিয়া সক্রেটিশের Dialecticsএর সৃষ্টি করিয়াছে। সক্রেটিসের এই গুরুশিষ্যের উপদেশরীতি কিরূপ প্রভূত-শক্তি-সম্পন্ন, তাহা অনেকেই বিদিত আছেন। ইউরোপীয় ইতিহাসই শিক্ষা দিয়াছেন, মিশর প্রাচীন গ্রীসের শিক্ষাগুরু এবং মিশরের শিক্ষা-গুরু পরম্পরাক্রমে প্রাচীন ভারত। কারণ, প্রাচীন ভারতীয় বিদ্যা, বুদ্ধি ও সভ্যতা আরবাদি দেশ দিয়া মিশরে উপনীত হইয়াছিল।

আর্য্যসাহিত্যে ইতিহাস-ক্ষেত্র কেমন বিস্তারিত, তাহা আমরা দেখাইলাম। ইতিহাস পুরাণে, কথায়, আখ্যায়িকায় ও জীবন-চরিতে; এমন কি, পশুপক্ষীর কথোপকথনেও ইতিহাস। ইতি-হাস আর্য্যসাহিত্যে বিশাল উপন্যাস-ক্ষেত্র সৃষ্টি করিয়া যে বৃহৎ শিক্ষামন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছে, জগতে তাহা অতুলনীয়। অতুলনীয় তাহার মহা ধর্ম্মৈশ্বর্য্যে। এই বিশাল ঔপন্যাসিক সৃষ্টির সহিত বিলাতী ঔপন্যাসিক সাহিত্যের বিস্তর প্রভেদ। বিভিন্ন আদর্শে তাহাদের সংগঠন। কিরূপ বিভিন্ন আদর্শে, তাহা আমরা "সাহিত্য-চিন্তা"য় দেখাইয়াছি। দেখাইয়াছি, আর্য্যসাহিত্যে স্বর্গের ঐশ্বর্য্য দেদীপ্যমান, বিলাতী সাহিত্যে মর্ত্ত্যের সুখসম্পদ্ ও বিলাসিতা বিভাসিত। এ সাহিত্যের আদর্শে পুণ্যের প্রভা, সে সাহিত্যের আদর্শে পাপের মলিনতা। তবে কেন আমরা আজ বিলাতী আদর্শে দিন দিন এত উপন্যাস সৃষ্টি করিয়া বাঙ্গালাভাষা পরিপূর্ণ করিতেছি? আর্য্যসাহিত্যে কি ঔপন্যাসিক কাব্যের কিছু অপ্রতুল আছে? কিন্তু বিলাতী সাহিত্যপাঠে এক্ষণে আমাদের রুচি এমনি কলুষিত হইয়াছে যে, আমরা নিজ গৃহবাসের স্বর্ণরাশির সুন্দর বিভা তুচ্ছ করিয়া সাগরবেলার শুক্তিরাশির চাক্‌চিক্যে মোহিত হইয়াছি!

সাবিত্রী-কথা ও গীতার ফলশ্রুতি।

আমাদিগের পুরাণপাঠে পরিদৃষ্ট হয়, প্রতি পুরাণের শেষে সেই পুরাণের ফলশ্রুতি প্রদত্ত হইয়াছে। এমন কি, তদন্তর্গত কোন কোন ইতিহাস বা উপকথায় শেষে, বিশেষ বিশেষ স্তুতি বা স্তবের শেষে, বিশেষ বিশেষ খণ্ডের শেষে সেই সেই বিষয়ের ফলশ্রুতি দেওয়া আছে। ইহার কারণ এই, আমাদের পৌরাণিক আলঙ্কারিকেরা এইরূপ ফলদ্বারা সমগ্র-কাব্যের বা কাব্যবিভাগের বিশেষ বিশেষ অংশের কবিত্ব পরীক্ষা করিতেন। যদি সেরূপ ফল না জন্মিয়া থাকে, তবে শ্রুত বিষয়ের সম্পূর্ণ মর্ম্মাবগতি হয় নাই, বুঝিতে হইবে। যদি শ্রীবিষ্ণুর সহস্রনাম পড়িয়া সেই স্তবের ফলশ্রুতি উৎপাদিত না হইয়া থাকে, তবে বুঝিতে হইবে, সেই নারায়ণ-স্তবের দার্শনিক তত্ত্ব, কিছুই জ্ঞানগোচর হয় নাই *। তখনই কাব্য যথারীতি পঠিত হইয়াছে, যখন তাহার ফলশ্রুতি জন্মিয়াছে। পুরাণের কথা ছাড়িয়া দিয়া সেই নীতিদ্বারা সামান্য সাহিত্যের বিচার করিলে আমরা কি বুঝিতে পারি? বুঝিতে পারি, এই ফলশ্রুতিই সকল সাহিত্যের পরীক্ষা।

পৌরাণিক কালে সর্ব্ববিষয়ই শ্রুত হইত বলিয়া পুরাণে ফলশ্রুতির বর্ণনা আছে। অধুনা যখন শ্রবণের পরিবর্ত্তে সর্ব্ববিষয়েরই

---

* আচার্য্য শঙ্কর শ্রীবিষ্ণুর সহস্রনামের যে বিস্তৃত ভাষ্য লিখিয়াছেন, তাহা রীতিমত অধ্যয়ন করিলে এই স্তবের অধ্যয়ন-ফল কিয়দংশে উৎপন্ন হইতে পারে। এই স্তবের বিস্তর মাহাত্ম্য মহাভারতীয় মোক্ষধর্ম্মের ১৪৯ অধ্যায়ে কীর্ত্তিত হইয়াছে।

অধ্যয়ন হইয়া থাকে, তখন ফলশ্রুতিকে অধ্যয়ন-ফল বলিয়া অভিহিত করা উচিত। তজ্জন্য আমরা "সাহিত্য-চিন্তা"'য় এবং এ গ্রন্থের অনেক স্থলে এই "ফলশ্রুতি"-শব্দের পরিবর্ত্তে "অধ্যয়নফল" শব্দ ব্যবহার করিয়াছি।

এই অধ্যয়ন-ফল কিরূপে উৎপাদিত হয়? সমস্ত গ্রন্থ-পাঠের পর চিত্তে তাহার যে অঙ্কন (Impression) পড়ে, যে ফলোদয় হয়, তাহাই তাহার অধ্যয়ন-ফল। গ্রন্থ বড় হইলে হয় না, ছোট হইলেও হয় না। নল-দময়ন্তীর বিস্তৃত কথার ফল অপেক্ষা ক্ষুদ্র সাবিত্রী-চরিত-কথার ফল অধিকতর। শুধু নল-দময়ন্তীর কথা কেন, পৌরাণিক সাহিত্যে যত সতী-চরিত বর্ণিত হইয়াছে, বোধ হয়, সে সমুদায় চরিত-কথার শ্রুতি বা অধ্যয়ন-ফল অপেক্ষা সাবিত্রী-চরিতের অধ্যয়ন-ফল গুরুতর। তাই, সাবিত্রী-কথা ব্রতরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। যে স্ত্রীজাতি ভূতপ্রেতের এবং আরব্যোপন্যাসের গল্প-কথা বিশ্বস্ত-চিত্তে শ্রবণ করে; শ্রবণ করে কি? হাঁ করিয়া অবাক হইয়া শুনে, তাহাদের চিত্তে সাবিত্রী-চরিতের রূপকথার ফল যে অত্যন্ত গুরুগম্ভীররূপে সুদৃঢ়বদ্ধ হইয়া যাইবে, তাহা আশ্চর্য্য নহে। বাস্তবিক, সাবিত্রী-কথার কাব্যবিভ্রমগুণে হিন্দুজাতিমধ্যে সেই ফলোদয় ঘটিয়াছে এবং সেই কথা ঘরে ঘরে সতীরত্নের উৎপাদন করিয়াছে। সে কথার ফলগৌরব পুরাণে এইরূপ উক্ত হইয়াছে :—

"যশ্চেদং শৃণুয়াদ্ভক্ত্যা সাবিত্র্যাখ্যানমুত্তমম্।
স সুখী সর্ব্বসিদ্ধার্থো ন দুঃখং প্রাপ্নুয়ান্নরঃ॥"

"যে নর ভক্তিশ্রদ্ধাসহকারে প্রতিব্রতা সাবিত্রীর উপাখ্যান শ্রবণ করেন, তাঁহার পরম সুখ ও সর্ব্বসিদ্ধি লাভ হয়।"

তিনি সাবিত্রীরই মত সর্ব্বসিদ্ধি লাভ করিবেন এবং তাঁহারই মত সুখী হইবেন। বাস্তবিক, যিনি সর্ব্বসিদ্ধিলাভ করেন, তিনিই সুখী হয়েন। সিদ্ধি-লাভের মহামন্ত্র শাস্ত্রে এইরূপ উক্ত হইয়াছে :—

"যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী।"

সাবিত্রীও একান্তচিত্তে যাহা ভাবনা করিয়াছিলেন, দৃঢ়ব্রত-সহকারে তাহা লাভ করিয়াছিলেন। তদ্রূপ ব্রতে যিনি ব্রতী হইবেন, সর্ব্বসিদ্ধির সহিত তিনিই সুখলাভে কৃতার্থ হইবেন।

ভগবদ্গীতার উপসংহার কিরূপ, তাহা আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি। সেই উপসংহারের ঠিক্ পরেই ভগবদ্গীতা নিজের ফলশ্রুতি নিজেই এইরূপ বলিয়াছেন :—

"অধ্যেষ্যতে চ য ইমং ধর্ম্ম্যং সংবাদমাবয়োঃ।
জ্ঞানযজ্ঞেন তেনাহমিষ্টঃ স্যামিতি মে মতিঃ॥
শ্রদ্ধাবাননসূয়শ্চ শৃণুয়াদপি যো নরঃ।
সোঽপি মুক্তঃ শুভাল্লোঁকান্ প্রাপ্নুয়াৎ পুণ্যকর্ম্মণাম্॥"

১৮ অ ৭০।৭১।

"যিনি আমাদিগের (শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জ্জুনের) এই ধর্ম্মানুগত সংবাদরূপ গীতাশাস্ত্র অধ্যয়ন করিবেন, সর্ব্বযজ্ঞের শ্রেষ্ঠ জ্ঞানযজ্ঞ দ্বারা আমাকে তাঁহার পূজা করা হইবে। যে ব্যক্তি শ্রদ্ধাবান্ ও অসূয়াশূন্য হইয়া এই গীতাশাস্ত্র শ্রবণ করেন, তিনিও সর্ব্বপাপ হইতে বিমুক্ত হইয়া পুণ্যকারিগণের পবিত্র লোক-সকল প্রাপ্ত হন।"

এস্থলে দেখুন, ভগবান্ প্রথমে অধ্যয়ন-ফল বলিয়া পরে শ্রবণ-ফল বলিলেন। অধ্যয়ন-ফলে অবশ্য যে প্রগাঢ় জ্ঞান জন্মে, শুধু শ্রবণে ততদূর হয় না। সেই জন্য অধ্যয়ন-ফলের গৌরব শ্রবণ-ফলের অপেক্ষা অধিক। তাই ভগবান্ বলিলেন, অভিনিবেশ-সহকারে গীতাপাঠ করিলে সর্ব্বযজ্ঞের শ্রেষ্ঠ যে জ্ঞানযজ্ঞ, তদ্দ্বারা

আমাকে পূজা করা হয়। কিন্তু যিনি কেবল শ্রবণ করিয়া গীতার্থ পরিগ্রহ করেন, তাঁহার ততদূর প্রগাঢ় জ্ঞান না হওয়াতে কেবল ঈশ্বরে গৌণভক্তি জন্মে এবং সেই গৌণভক্তি হেতু তিনি যে সকল পুণ্যকর্ম্ম করেন, তদ্দারা তাঁহার কেবলমাত্র পুণ্যলোক লাভ হয়। সুতরাং এই দুই ফলের তারতম্য গীতা স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন। অতএব, গীতার অধ্যয়ন-ফলই সমধিক এবং সেই ফল হেতু যে পরম জ্ঞান জন্মে, তাহাই মুক্তির কারণ ও সর্ব্বপাপ হইতে বিমুক্ত হইবার প্রধান উপায়। গ্রন্থের অধ্যয়ন-ফলের যখন এত গৌরব, তখন যে গ্রন্থ-পাঠের কোনরূপ অধ্যয়ন-ফল নাই, সে গ্রন্থ কি পাঠযোগ্য? সুতরাং এই অধ্যয়ন-ফলদ্বারাই সকল গ্রন্থের বিচার সিদ্ধ হওয়া উচিত। সাহিত্য-সমালোচনার এই সুপ্রধান নীতি। এ নীতি কেবল আর্য্যসাহিত্য স্পষ্টাক্ষরে শিক্ষা দেয়। আর কোন দেশীয় সাহিত্যে এ নীতি এমন স্পষ্টাক্ষরে উপদিষ্ট হয় নাই। যাহা ভগবানের আদেশ, যে আদেশ স্বয়ং সর্ব্বশাস্ত্রবিৎ ব্যাস প্রকাশ করিয়াছেন, হিন্দুমাত্রই সেই নীতি অবলম্বন করিয়া সাহিত্যের বিচার করিয়া থাকেন। এরূপ ফলশ্রুতি পৌরাণিক কাব্যমাত্রেই এবং অনেক স্থলে কাব্যখণ্ডেও উক্ত হইয়া থাকে। তজ্জন্য আর সেই সেই কাব্য বা কাব্যখণ্ডের যে স্বতন্ত্র সমালোচনা আবশ্যক হয় না, তাহার কারণ এই, সমালোচনা দ্বারা যাহা বাহির করিতে হইবে, তাহা গ্রন্থকার নিজেই বলিয়া দিতেছেন। পাঠক কেবল মিলাইয়া দেখেন, সেই ফলশ্রুতি স্বরূপ কি না। সেইরূপ অধ্যয়ন বা শ্রবণ-ফলের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া গ্রন্থকার স্বীয় গ্রন্থ বিরচন করেন এবং গ্রন্থপাঠেও সেই ফল প্রতীত হয়। তাই আমরা প্রথম প্রস্তাব-শেষে বলিয়াছি, আর্য্যসাহিত্যের এই প্রকার

নীতি থাকাতে সে সাহিত্যে স্বতন্ত্র আকারে সমালোচন-সাহিত্যের আবশ্যকতা হয় নাই।

এখন কথা এই, পৌরাণিক সাহিত্যে যেন এইরূপ ফলশ্রুতি উক্ত হইয়া থাকে, কালিদাস, ভারবি-মাঘ প্রভৃতি-বিরচিত কাব্যেও কি ফলশ্রুতি উক্ত হয়? যদি না হয়, তবে তাহাদের সমালোচনা ত আবশ্যক। সেরূপ কাব্যের ফলশ্রুতি এই জন্য উক্ত হয় না যে, সে সকল কাব্য যে যে পুরাণ হইতে গৃহীত হইয়াছে, সেই সেই পুরাণের ফলশ্রুতি উক্ত হইয়াছে। সুতরাং সে সকল কাব্যের আর স্বতন্ত্র ফলশ্রুতি দেওয়া নাই। আর্য্যকবিগণ যে সকল পৌরাণিক ইতিহাস লইয়া নিজ নিজ কাব্য বিরচন করিয়া গিয়াছেন, তাহাতেও সেই পৌরাণিক ধর্ম্মনৈতিক ফল ফলিয়া থাকে। ধর্ম্মকে এবং ভগবান্‌কে জাজ্বল্যমান করিয়া দেখান, সেই সকল কাব্যের উদ্দেশ্য। কিন্তু আমাদের বাঙ্গালা সাহিত্যে যে সকল পৌরাণিক কাব্য বিরচিত হইতেছে, তাহাদের ফল অন্যবিধ হইয়া পড়ে। কারণ, সে সকল কাব্য বিলাতী আদর্শে সংগঠিত হয়। সেই আদর্শে সংগঠিত হওয়াতে, তাহাতে পাপাংশই সমধিক প্রবল হইয়া থাকে; সুতরাং তাহাদের অধ্যয়ন-ফল সেরূপ সুমিষ্ট হয় না। তজ্জন্যই এক্ষণে এই আর্য্যরীতি-অনুসারে সাহিত্য-সমালোচনার আবশ্যকতা হইয়াছে।

ফলশ্রুতিই যে আর্য্যসাহিত্যের প্রধান নীতি, তাহা আমরা প্রদর্শন করিলাম। গ্রন্থ-পাঠের ফল কিরূপ হইবে, তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখিয়া আর্য্যসাহিত্যে যখন গ্রন্থকারগণ গ্রন্থ বিরচন করিতেন, তখন সেই ফলের গৌরবের প্রতি তাঁহাদের দৃষ্টি স্বভাবতই পতিত হইত। যে গ্রন্থপাঠের ফল যত অধিক ও যত মধুর, সেই গ্রন্থেরই

ত্ত গৌরব। গীতার অধ্যয়ন-ফলের গৌরব অপেক্ষা বুঝি উচ্চতর গৌরব আর কিছু হইতে পারে না। যেহেতু সেই ফল অন্য কিছু নহে, সে ফল একেবারে পরম জ্ঞান—যে জ্ঞান উদয় হইলে লোকের মুক্তিসাধন হয়, পাপ-তাপ সব দূরে যায়, হৃদয়ে শান্তি-স্থাপন হয়, মানুষ আর মানুষ থাকে না, দেবতা হয়, দেবতা হইয়া পরম আনন্দধামে চলিয়া যায়। গীতা-পাঠের যে বাস্তবিক এইরূপ অধ্যয়ন-ফল হয়, তাহার দৃষ্টান্ত বিরল নহে। যাঁহারা বাস্তবিকই অভিনিবেশসহকারে গীতা পাঠ করেন, যাঁহাদিগের গীতাই জপ, গীতাই তপ, অভ্যাস-যোগ বশতঃ তাঁহাদের ভগবদ্ভক্তি ও বিষয়-বৈরাগ্য অনিবার্য্য; বিষয়-বৈরাগ্য হইতে সন্ন্যাস, সন্ন্যাস হইতে পরম জ্ঞান, পরম জ্ঞান হইতে ব্রহ্মানন্দ ও মুক্তি। সেইরূপ ফল শ্রীধর, শঙ্কর, আনন্দগিরি, চৈতন্য প্রভৃতি অনেকেই লাভ করিয়াছিলেন। আজিও যাঁহারা তাঁহাদের মত একচিত্তে গীতা পাঠ ও গীতা জপ করেন, তাঁহারাও তদ্রূপ ফললাভে কৃতার্থ হইতেছেন।

গ্রন্থের অধিকার বা অর্থবাদ।

সাহিত্যে অর্থবাদ কি ?

অধিকার-ভেদ বিচার করা আর্য্য হিন্দুদিগের এক প্রধান নীতি ছিল। কি ধর্ম্মে ও কর্ম্মে, কি আহারে ও ব্যবহারে, কি সমাজে ও পরিবারে, কি আচারে ও বিচারে, কি কাব্য ও অলঙ্কারে, কি উপদেশ ও শিক্ষাদানে, কি জ্ঞানে ও বিজ্ঞানে—সর্ব্ববিষয়েই ও সর্ব্বত্রই হিন্দুদিগের অধিকার-ভেদ। তাহাদিগের সাহিত্য-সমালোচনায়ও এই নীতি স্থান লাভ করিয়াছে।

আমাদের আলঙ্কারিক বলিয়াছেন, যে পদাবলীর কোন ইষ্টার্থ (Desired effect) আছে, তদ্দারাই গ্রন্থাবয়ব সংগঠিত হয়। সুতরাং, প্রতি গ্রন্থেরই "ইষ্টার্থ" থাকা আবশ্যক। ইষ্টার্থ ই গ্রন্থের পরম প্রয়োজন। যে প্রয়োজন সাধনার্থ যে গ্রন্থ লিখিত হয়, তাহাই তাহার ইষ্টার্থ। গ্রন্থের প্রয়োজন থাকিলেই সেই প্রয়োজনের অধিকারীও আছে। কাহার বা কাহাদিগের প্রয়োজন-সাধনোদ্দেশে গ্রন্থ লিখিত হইয়াছে ? যে অর্থের জন্য এবং যে অর্থীর জন্য গ্রন্থ লিখিত হইয়াছে, সেই অর্থার্থীর বাদের নামই "অর্থবাদ।" সুতরাং অর্থবাদের অর্থ "অধিকার" হইয়া দাঁড়াইতেছে।

সমালোচনায় অধিকার-বিচার।

আর্য্য-সাহিত্যে অনেক গ্রন্থের অধিকার, গ্রন্থ-প্রারম্ভেই উক্ত হইয়া থাকে। এই জন্য যে, সেই অধিকারী জনগণেরই সেই সেই

গ্রন্থ পাঠ্য এবং সেই অধিকার ধরিয়াই তাঁহাদের বিচার। অতএব, সেই সাহিত্যে, সমালোচনার যে এক প্রধান বিষয় এই অধিকার হইবে, এ কথা ত পড়িয়াই রহিয়াছে। অধিকারি-বিশেষের জন্য গ্রন্থ লিখিত হইলে, তাহার ফলও প্রভূত হয়।

গ্রন্থমাত্রেরই অধিকার আছে। কারণ, গ্রন্থস্থ বিষয় ও প্রসঙ্গের অধিকার আছে। কোন প্রসঙ্গই অসীম নহে। প্রসঙ্গমাত্রেরই যদি নির্দ্দিষ্ট সীমা ও অধিকার থাকে, তবে তাহার সমালোচনাও সেই অধিকারমধ্যে আবদ্ধ থাকা উচিত। যদি সমালোচনা সেই অধিকারের বহির্ভূত হয়, তবে তাহা নিশ্চয় অযথা ও অন্যায্য হইয়াছে। কিন্তু গ্রন্থকার যদি কোন স্থলে নিজ অধিকারের বাহিরে গিয়া থাকেন, সমালোচক তাহা দেখাইয়া দিবেন। গ্রন্থের যাহা প্রধান রস, সেই রসে যিনি নিমগ্ন হইতে না পারেন, তিনি তাহার সমালোচক হইবার যোগ্য পাত্র নহেন। প্রতিভা-সম্পন্ন লোকেরা, এক এক জন এক এক অধিকারে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছেন। যাঁহার প্রতিভা যে ভাবে স্ফুরিত হইয়াছে, তাঁহাকে সেই অধিকার ধরিয়াই বিচার করা উচিত। কেহ বা হাস্য-রসে প্রধান, কেহ বা বীর-রসে, কেহ বা আদি-রসে, কেহ বা শান্তি-রসে প্রাধান্য-লাভ করিয়াছেন। কেহ বা কৌতুক করিতে, কেহ বা মন মাতাইতে, কেহ বা করুণ-রসে চিত্ত বিগলিত করিতে সমর্থ। যাঁহার যে রসে অধিকার, তাঁহাকে সেই রস ধরিয়া বিচার করা উচিত। এজন্য সমালোচককে বিশেষরূপে রসজ্ঞ হইতে হইবে। অনেকে বীভৎসকে করুণ বলিয়া গ্রহণ করেন। তাই খুনে পর্য্যবসিত, পাপের ঘৃণিত-চিত্র-পূর্ণ, বীভৎস-রস-প্রধান উপন্যাস বা কাব্যকে, করুণ-রস-প্রধান-ভ্রমে, অযথা প্রশংসা করিয়া থাকেন।

করুণ রসে মন আর্দ্র হয়; কিন্তু বীভৎসে ঘৃণার উদয় হয়। এজন্য বীভৎস কখনই প্রীতিকর নহে। সেই ঘৃণিত বীভৎসকে করুণের সহিত তুল করা নিতান্ত দোষার্হ। তদ্রূপ এক-জাতীয় প্রতিভাকে, অন্যজাতীয় প্রতিভার সহিত তুলনা করাও অন্যায়। যিনি যে-জাতীয় কবি, তাঁহাকে তজ্জাতীয় কবির সহিত তুলনা করাই উচিত। গরুর যে সকল গুণ আছে, তাহা গরুকেই প্রাধান্য দিয়াছে; তদ্রূপ ঘোড়ার গুণ ঘোড়াকেই প্রাধান্য দিয়াছে। তাই বলিয়া, যিনি গরুকে ঘোড়ার গুণ দিয়া বিচার করিবেন, তিনি কি ঠিক্ বিচারকর্ত্তা? তদ্রূপ, আমরা যদি শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র সেনের কবিতার সহিত, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের কবিতার তুলনা করি, তাহা হইলে কি ঠিক্ বিচার করা হইল? ঈশ্বরগুপ্ত যে রসে প্রধান, নবীন সেনের কবিতায় তাহা নাই এবং নবীন সেনের কবিতায় যাহা আছে, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের বা ভারতচন্দ্রের কবিতায় তাহা নাই। এ কথা স্মরণ করিয়া বিচার করিলে দৃষ্ট হইবে, নবীন সেনের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করিতে হইলে, তাঁহার কবিতার সহিত ঈশ্বর গুপ্তের কবিতার তুলনা করা উচিত নহে। তাঁহাকে স্বজাতীয় প্রতিভাসম্পন্ন কবির রচনা ধরিয়া বিচার করিলেই, তাহার ঠিক্ বিচার করা হইল; যেমন, ভারতচন্দ্রের সহিত ঈশ্বর গুপ্তের তুলনা করিলে, তবে উভয়ের প্রতিভার প্রকৃতি ঠিক নির্ণয় করিতে সমর্থ হওয়া যায়।

গ্রন্থের অধিকারভেদ-বশতঃ বিষয়ের অধিকারভেদ ঘটে। যে অধিকারীর যে বিষয় গ্রহণীয়, তাহা বিবেচনা করিয়াই গ্রন্থে বিষয়ের সন্নিবেশ করা হয়। সমালোচকের ইহাই বিচার্য্য। নহিলে, অনেক সমালোচককে দেখিতে পাওয়া যায়, গ্রন্থের অধিকার

না বুঝিয়া, তাঁহারা বিষয়ের সমালোচনা করিয়া বসেন। গীতার অধ্যাত্ম-তত্ত্বের বিচারে প্রবৃত্ত হইয়া তাঁহারা বলিয়া বসেন,—লোকের যে সত্য কথা বলা উচিত, মিথ্যা কথা বলা উচিত নহে, গীতায় এ সকল সামাজিক নীতি-কথা কই? কিন্তু তাঁহারা বিবেচনা করেন না যে, স্মৃতি-শাস্ত্রের মানব-ধর্ম্মের কথা গীতায় উক্ত হইবে কেন? মানবের সমাজ-নীতি ও ধর্ম্ম-নীতি যে অধ্যাত্ম-বিদ্যার সোপান, সেই অধ্যাত্মতত্ত্ব-কথা স্মৃতি-শাস্ত্রে নাই, অথবা মনু সেই অধ্যাত্ম-বিদ্যার সহিত, ধর্ম্ম ও সমাজ-নীতির সম্বন্ধ দেখাইবার জন্য, কেবল শেষ অধ্যায়ে, সেই অধ্যাত্ম-তত্ত্বের স্থূল স্থূল কথার উল্লেখ করিয়া, গ্রন্থ সমাপ্ত করিয়াছেন। কিন্তু সেই অধ্যাত্ম-বিদ্যা সম্যক্‌রূপে বিচার করিবার জন্য, আর্য্য-সাহিত্যে এক স্বতন্ত্র-শাস্ত্রের সৃষ্টি হইয়াছে। গীতা, যোগবাশিষ্ঠ, মহাভারতীয় শান্তিপর্ব্বান্তর্গত মোক্ষধর্ম্মীয় পর্ব্বাবলী, সেই শাস্ত্র। সেই শাস্ত্রের সকল বিস্তারিত বিচার যেমন স্মৃতিতে নাই, তেমনি স্মৃতির মানব-ধর্ম্মের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যের কথা মোক্ষধর্ম্মসংক্রান্ত অধ্যাত্ম-শাস্ত্রে নাই। যেমন, বেদবেদান্তের অধিকার না বুঝিয়া, অনেকে বেদের মধ্যে বেদান্তের তত্ত্ব এবং বেদান্তমধ্যে বেদের তত্ত্ব দেখিতে চান, তেমনি মোক্ষ-ধর্ম্মীয় অধ্যাত্ম-শাস্ত্রে তাঁহারা সমাজ-ধর্ম্মের নীতিকথা অন্বেষণ করেন। যে ঘরে যাহা রাখা হয় নাই, সে ঘরে তাহা খুঁজিলে পাইবেন কেন? তবে, মহাভারতে সাধারণতঃ সর্ব্ববিষয়ই গৃহীত হইয়াছে। এজন্য সমাজ-ধর্ম্মও গৃহীত হইয়াছে। রাজ-ধর্ম্মাদির কথা-স্থলে, তাহা স্বতন্ত্রাকারে সংক্ষেপে আলোচিত হইয়াছে।

আর্য্যসাহিত্যে অধিকার-ভেদ।

আর্য্যশাস্ত্র-সমুদায় অধিকার-অনুসারে বিভক্ত হইয়াছে। বেদ-বেদান্ত যে প্রত্যক্ষ সিদ্ধতত্ত্ব সকল খ্যাপন করিয়াছেন, স্মৃত্যাদি শাস্ত্রে তাহারই অনুমানমূলক বিস্তার ও বিবৃতি। বেদ কর্ম্মকাণ্ড লইয়া যে জ্ঞানে আরোহণ করেন, বেদান্ত সেই জ্ঞানকাণ্ড ধরিয়া মোক্ষে উপনীত করেন। সেই বেদ-বেদান্তে আপাততঃ সামান্য জ্ঞানে যে সকল বিবাদ-বিসংবাদ দেখিতে পাওয়া যায়, পূর্ব্ব ও উত্তর মীমাংসায় সেই সমস্ত বিবাদ-বিসংবাদের নিরাস-সাধন হইয়াছে। এবং তাহাতে যে মোক্ষধর্ম্ম উপদিষ্ট হইয়াছে, সাংখ্য ও পাতঞ্জল যোগ-শাস্ত্রে তাহারই সাধনপথ প্রদর্শিত হইয়াছে। এজন্য, এই মীমাংসাদ্বয় এবং সাংখ্য ও পাতঞ্জল শাস্ত্রদ্বয়, সেই বেদ-বেদান্তেরই চক্ষু-স্বরূপ হওয়াতে, তাহাদিগকে দর্শন-শাস্ত্র বলে। ন্যায়শাস্ত্রও অন্যবিধ সাধন-পথ দেখাইয়া সেই একই মোক্ষে আনিয়া উপনীত করেন। এজন্য, সেই ন্যায়শাস্ত্রও দর্শন বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছে। বেদ-বেদান্ত এবং দর্শনে যাহা সূক্ষ্মতত্ত্বরূপে উপদিষ্ট, পুরাণ ও তন্ত্রাদিতে তাহা স্থূলরূপে প্রদর্শিত হইয়াছে। যেমন বাহ্যবিজ্ঞানে সূক্ষ্ম বিষয়-সকল ছবিদ্বারা প্রদর্শিত করা হয়, তেমনি অধ্যাত্ম-বিজ্ঞানে, আত্মার মোক্ষপথে উঠিবার বিবিধ স্তর ও আধ্যাত্মিক অবস্থা, ছবি আঁকিয়া দেখাইবার জন্য, পুরাণ ও তন্ত্রাদির সৃষ্টি। একটী দৃষ্টান্ত গ্রহণ করুন। মুনি-ঋষিগণ সাধনাপথে যে বালভাবে উপনীত হয়েন, যে বালভাবে বাল্য-সরলতা, নির্ভাবনার শান্তিসুখ ও সদানন্দভাব উপলব্ধ হয়, যে ভাব-সমুদায় শৈশবকালে বালকগণে সুন্দর পরিদৃষ্ট হয়, সেই বালভাবকে দেদীপ্যমান করিয়া

দেখাইবার নিমিত্ত, পুরাণে শ্রীকৃষ্ণের ব্রজলীলা বর্ণিত হইয়াছে। ভক্ত (Jesus) যীশুও বলিয়াছিলেন, বালকের মত সরলচিত্ত না হইলে কেহ স্বর্গে যাইবার অধিকারী হইতে পারে না। তদ্রূপ বালকের সহিত লীলা করিবার জন্য সেই ব্রজ-লীলায় স্বয়ং ভগবান্ সদানন্দময় বালকৃষ্ণ হইয়াছেন, আর ব্রজবাসী রাখালগণ ও গোপীরা সকলেই বালক-বালিকারূপ ধারণ করিয়াছে। তাহাদের লীলা বালভাবের অকপট ও সরল ব্রজলীলা। তাহাতে পাপের ছন্দাংশ নাই। সে লীলায় পাপ ভাবাই পাপ। বালক-বালিকার লীলায় পাপ কি? তাহা আনন্দময় লীলা। সেই বাল্য-লীলায় যে সমস্ত চিত্তাবস্থা প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহা আমরা ব্রজাঙ্গনার সমালোচনায় দেখাইয়াছি—মুনি-ঋষিগণের বালভাবে উপনীত চিত্তাবস্থা। এই ব্রজলীলার অধিকার যাঁহারা না জানেন, তাঁহারাই অজ্ঞতা বশতঃ, খ্রীষ্টীয় মিশনরীগণের ন্যায়, নানারূপ অনধিকার-চর্চ্চা এবং অযথা সমালোচনা করিয়া মূর্খতারই পরিচয় দিয়া থাকেন।

পুরাণাদিতে যেমন এইরূপ সাধনা-পথের নানা স্তর ও চিত্তাবস্থা স্থূল অবয়বে জাজ্বল্যমান করা হইয়াছে, তেমনি ভগবানের নানা বিভূতি ও ঐশ্বর্য্য, নানাবিধ শক্তির বিকাশ ও জগল্লীলার সূক্ষ্ম কার্য্য, দেবদেবীর মূর্ত্তি ও লীলায় স্থূলরূপে প্রকটিত হইয়াছে। পুরাণ এবং তন্ত্রের এ অধিকারও অতি সুস্পষ্ট। কিন্তু যাঁহারা সে অধিকার ঠিক্ বুঝিতে না পারেন, তাঁহারাও সেই সেই শাস্ত্রের বিচার ও সমালোচন-স্থলে নানা প্রলাপ-বাক্যে, আপনাদের অজ্ঞতারই পরিচয় দেন। কোথায় তত্ত্ববিৎ ঋষিগণের জ্ঞানগর্ভ বাক্য, আর কোথায় অজ্ঞানান্ধ সংসারী জনগণের অমৃত বালভাষিত!

অতএব, কি প্রত্যক্ষসিদ্ধ বেদ-বেদান্ত, কি অনুমানমূলক দর্শন ও পুরাণাদি শাস্ত্র, সকলেরই অধিকার স্বতন্ত্র। আর্য্য-সাহিত্যের কাব্যাদি সুতরাং যে পুরাণ ও তন্ত্রাদির উপর স্থাপিত, তাহাদেরও অধিকার তদনুসারে নির্দ্ধারিত হইয়াছে। এই অধিকার-অনুসারেই, সেই কাব্যাদির সমালোচনা ও বিচার সিদ্ধ হওয়া উচিত। নহিলে, তাঁহাদিগের উচ্চাদর্শের কাব্যাদির সহিত, বিলাতী-কাব্যাদির তুলনা করা, আর স্বর্গ মর্ত্ত্যের তুলনা করা সমান কথা। সে তুলনা কিরূপ, তাহা আমরা "সাহিত্য-চিন্তা"য় বিশিষ্টরূপে প্রদর্শন করিয়াছি।

অর্থবাদ ও ফল।

আর্য্যসাহিত্য কেমন অধিকারানুসারে সজ্জিত এবং বিরচিত হইয়াছে, তাহা আমরা প্রদর্শন করিলাম। শুধু আর্য্য-সাহিত্যে কেন, সর্ব্বদেশীয় সাহিত্যেরও সেই ধর্ম্ম। সমস্ত ভাল ভাল গ্রন্থেরই অধিকার আছে। অধিকার আছে বলিলে এই বুঝায় যে, সেই গ্রন্থের অধিকারি-বিবেচনায় বিষয়ের বিভাগ ও সন্নিবেশ হইয়াছে। সুতরাং সেই অধিকারের অতিরিক্ত বিষয় তন্মধ্যে প্রত্যাশা করা যাইতে পারে না। সেরূপ প্রত্যাশা করা কখনই বিচারসিদ্ধ নহে। দ্বিতীয়তঃ দেখিতে হইবে, যেরূপ উত্তম, মধ্যম এবং অধম জ্ঞানাধিকারীর জন্য গ্রন্থ বিরচিত, তাহা ঠিক্ তদুপযোগী হইয়াছে কি না? তৃতীয়তঃ দেখিতে হইবে, গ্রন্থ যে সমাজস্থ, যে কালের ও যে বয়সের লোকের জন্য লিখিত, সেই দেশীয় এবং সেই কালীন জনসমাজোপযোগী কি না? এইরূপ দেশ, কাল ও পাত্রোপযোগী করিয়া যে গ্রন্থ রচিত, তাহারই অধ্যয়ন-ফল প্রভূত।

সমালোচন-কালে তবে গ্রন্থের অধিকারই প্রধানতঃ বিচার্য্য। সমালোচনা করিবার অগ্রে গ্রন্থের উত্তমাধমাদি জ্ঞানাধিকার ঠিক্ অবধারণ করা উচিত, সেই অধিকার-অনুসারে পাত্রাপাত্র ও দেশ-কাল-বিবেচনায় তাহার বিষয় বিচার্য্য। সেই অধিকার বিচার ঠিক্ না থাকিলে গ্রন্থের প্রকৃত তাৎপর্য্য নির্ণয় করা সুদুষ্কর। এজন্য গ্রন্থের তাৎপর্য্য-নির্ণয়ার্থ আর্য্যসমালোচক বলিয়াছেন, সেই গ্রন্থের ঠিক্ ফল ফলিবে কি না, তাহা অবধারণ করিতে হইলে তাহার অধিকার ও প্রয়োজন দেখা উচিত। এইরূপ প্রয়োজন-বিচারই "অর্থবাদ।" এই অধিকার-বিচার বা অর্থবাদই সমালোচন-তরির কর্ণস্বরূপ। সেই তরির কর্ণধার যদি এ কর্ণ ছাড়িয়া দেন, তবে তাঁহার সমালোচন-তরি যে কোথায় ভাসিয়া যাইবে, তাহার ঠিকানা নাই। সেই জন্য সমালোচন-কার্য্যে গ্রন্থের অর্থবাদ বরাবরই স্মরণ করিয়া রাখা উচিত। নহিলে, গ্রন্থের প্রকৃত তাৎপর্য্য নির্ণীত হইবে না। তাই আর্য্যসমালোচক "ফলমে"র পরেই শ্লোকের দ্বিতীয় চরণে বলিয়াছেন :—

"অর্থবাদোপপত্তী চ লিঙ্গং তাৎপর্য্যনির্ণয়ে।"

দর্শন ও পুরাণ-তন্ত্রের অধিকার।

দর্শন-শাস্ত্র সচরাচর ত্রিবিধ প্রধান ভাগে বিভক্ত হইতে দেখা যায়—ন্যায়, সাংখ্য ও বেদান্ত। কি ন্যায়, কি সাংখ্য, কি বেদান্ত, সকলই অধ্যাত্ম-পথের পথিক,—সকল দর্শনই মোক্ষধর্ম্মে আত্মতত্ত্বে উপনীত হইয়াছেন; কিন্তু, সেই পথ বিভিন্ন দিক্ দিয়া গিয়াছে। ন্যায়—আন্বীক্ষিকী বিদ্যায় নিঃশ্রেয়স-সাধন-পথ, সাংখ্য—পঞ্চ-ভূতের প্রকৃতি-তত্ত্বের বিচারে পুরুষ-তত্ত্ব, এবং বেদান্ত—ব্রহ্ম-বিদ্যা গ্রহণ করিয়াছেন। বেদান্ত ব্রহ্ম হইতে ব্রহ্মের অনন্ত বিকাশ দেখাইয়া, সকলই ব্রহ্মময় প্রতিপাদন করিয়াছেন; সাংখ্য বাহ্যপ্রকৃতির বিচার করিয়া, পুরুষতত্ত্বে উঠিয়া সেই ব্রহ্মময়ত্ব দেখাইয়াছেন; কিন্তু ন্যায়ের তত্ত্ববিচার স্বতন্ত্র। সাংখ্য যেমন বাহ্যপ্রকৃতি ধরিয়া ভূত-তত্ত্বের বিচারে পুরুষত্ব লাভ করিয়াছেন, ন্যায় তেমনি আভ্যন্তরিক মনের ও চিত্তের প্রকৃতি-বিচার ধরিয়া জগৎকে আত্মময় প্রতিপন্ন করিয়াছেন। ন্যায় মনোবিজ্ঞানে শ্রেষ্ঠ, সাংখ্য সমগ্র প্রাকৃতিক বিজ্ঞানে শ্রেষ্ঠ, বেদান্ত ব্রহ্ম-বিজ্ঞানে শ্রেষ্ঠ। এজন্য সকলের তত্ত্ব-কথা সমান নহে। ন্যায়ের তত্ত্ব-বিচারের সহিত সাংখ্যের তত্ত্ব-বিচার সমান নহে, এবং সাংখ্যের তত্ত্ব-কথা বেদান্তের তত্ত্ব-কথার সহিত সমান নহে। কিন্তু সকলের তত্ত্ব-কথা সমান না হইলেও, পরিণাম-ফল একই। তদ্রূপ, এই কতিপয় দর্শনের অবান্তর-ভেদও আছে। কাপিল-সাংখ্য যে সকল তত্ত্ব স্থির করিয়াছেন,

পাতঞ্জল-যোগ সেই সকল তত্ত্বের ক্রমে ক্রমে লয়-সাধন শিখাইয়া, সমস্ত প্রকৃতি-লয়সাধক মুক্তিপথে আত্মলাভ করিয়াছেন। তদ্রূপ অক্ষপাদ আন্বীক্ষিকী বিদ্যায় যে জাতি-তত্ত্বে উপনীত হইয়াছেন, কণাদ বৈশেষিক দর্শনে সেই জাতি-তত্ত্বের আবার বিশেষ বিশেষ পরমাণু-তত্ত্ব স্থির করিয়া, সেই জাতি-তত্ত্বের নিত্যত্ব হইতে আত্মার নিত্যত্ব স্থাপনপূর্ব্বক, অক্ষপাদের সহিত দেখাইয়াছেন—তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা ক্রমশঃ অপবর্গ-লাভ এবং সেই অপবর্গ-লাভই নিঃশ্রেয়স এবং সাংখ্যের পুরুষার্থ ও বেদান্তীর ব্রহ্মজ্ঞান। অতএব, স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র অধিকারে ন্যায়, বৈশেষিক এবং সাংখ্য-পাতঞ্জল তত্ত্বজ্ঞানে ও যোগ-প্রণালী-ক্রমে যে আত্মতত্ত্বে উপনীত হইয়াছেন, বেদান্ত দেখাইয়াছেন, সেই আত্মাই ব্রহ্ম এবং ব্রহ্মরূপে তিনি বিশ্বময় ব্যাপ্ত। ন্যায়ের অধিকার মনোবিজ্ঞান, সাংখ্যের অধিকার সমগ্র প্রকৃতিবিজ্ঞান এবং বেদান্তের অধিকার এতদুভয়ই। ন্যায় ও সাংখ্য ব্রহ্মে উঠিয়াছেন, বেদান্ত সেই ব্রহ্ম হইতে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে ব্যাপ্ত হইয়া, সেই ব্রহ্মকে কি বাহ্যজগৎ কি অন্তর্জগৎ, উভয় জগতেই দর্শন করিয়াছেন। সুতরাং, ইঁহাদের অধিকারের বিভিন্নতার রেখা অতি সমুজ্জ্বল ও সুস্পষ্ট।

শুধু কি বেদ-বেদান্ত, ন্যায়-সাংখ্য এবং শ্রুতি-স্মৃতির অধিকার বিভিন্ন? পুরাণ, ইতিহাস ও তন্ত্রের অধিকারও তদ্রূপ সুস্পষ্ট। যে সূক্ষ্মতত্ত্ব-সকল বেদাদি শাস্ত্রে বিচারিত ও সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, পুরাণ, ইতিহাস ও তন্ত্র সেই সকল পরমার্থতত্ত্ব, ভক্তি ও শক্তিবাদে উপাখ্যানচ্ছলে, উজ্জ্বলবর্ণে জাজ্বল্যমান করিয়াছেন। ইহাঁদের উপকরণ যুক্তি নহে, কিন্তু ভক্তির উপন্যাস এবং শক্তির বিরাট্, রুদ্র ও মোহিনী-মূর্ত্তি। ইহা এক স্বতন্ত্র রাজ্য ও অধিকার।

এ অধিকারে শুধু হৃদয়ের ব্যাপার—ভক্তি, ভয় ও সৌন্দর্য্যের মোহন অধিকার। মানবের সমস্ত প্রবৃত্তিকে লইয়া পুরাণ-তন্ত্রের অধিকার। প্রবৃত্তিকে উত্তেজিত, সৎপথে চালিত, সমুন্নত, সংযত এবং নিবৃত্তি-মুখী করিতে, উপন্যাস ও আখ্যানের যে প্রভূত শক্তি, পুরাণ-তন্ত্র সেই শক্তিবলে নিজ অধিকারে বলীয়ান্। কালিদাসাদি পৌরাণিক কবিগণ, কাব্য-নাটকে যে রসের সৃষ্টি দেখাইয়াছেন, সেই রসময় রাজ্যে পুরাণ-তন্ত্রের অধিকার সুবিস্তৃত হইয়া আর্য্য-সাহিত্যের মহা গৌরব সম্পাদনপূর্ব্বক বিশ্ববিখ্যাত হইয়াছে। সকলেরই অধিকার স্বতন্ত্র বটে, কিন্তু সকলেই এক মুখে আর্য্যধর্ম্মকেই জগতে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। সুতরাং, আর্য্য-সাহিত্যের সমস্ত অঙ্গের অধ্যয়ন-ফল একই সুবর্ণ বর্ণে সমুজ্জ্বলিত হইয়া রহিয়াছে। কালিদাস, ভবভূতি, মাঘ, ভারবি প্রভৃতি কবিগণের প্রতিভা স্বতন্ত্র; তাঁহাদের কাব্য, নাটকাদির রচনা, রস ও অধিকারও স্বতন্ত্র; ঋষিগণের শাস্ত্রীয় রচনা ও যুক্তিপথও স্বতন্ত্র; কিন্তু সকলে একই ধর্ম্মলাভ-রূপ ফল ধারণ করিয়া রহিয়াছে। আস্বাদন করিয়া দেখ, তেমন ফল আর কোন দেশের কোন জাতির সাহিত্যে সুপরিণত হয় নাই।

গ্রন্থের উপপত্তি।

অভ্যাস ও উপপত্তি।

পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে যে, অভ্যাস-গুণে গ্রন্থের প্রধান বিষয় পুনঃ পুনঃ আবৃত্ত ও আলোচিত হইয়া গ্রন্থ পূর্ণাবয়ব হইয়া আইসে। কিরূপে পুনঃ পুনঃ আবৃত্ত ও আলোচিত হয়?—উপপত্তি-ক্রমে। কুলাল যেমন চক্রের পুনঃ পুনঃ আবর্ত্তনে ঘট-সামগ্রীসকল সংযোজিত করিয়া ঘট প্রস্তুত করিয়া আনে, গ্রন্থকারও তেমনি গ্রন্থাবয়বে নানা প্রয়োজনীয় সামগ্রী যথাস্থানে সন্নিবেশিত করিয়া তাহাদিগকে উপপত্তি-ক্রমে সাজাইয়া ও গাঁথিয়া গ্রন্থকে সম্পূর্ণ করিয়া আনেন। এই জন্য আলঙ্কারিক দণ্ডী সমুদায় গ্রন্থাবয়বকে গ্রন্থের শরীর বলিয়াছেন। তাঁহার এই শরীর-শব্দ সুন্দর অর্থপূর্ণ। তিনি বলিয়াছেন, এই শরীর গ্রন্থের "ইষ্টার্থ"-সাধক পদাবলী দ্বারা নির্ম্মিত হওয়া উচিত। শরীরের যেমন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গসকল এক এক প্রয়োজন সাধন করিয়া সমুদায় শরীরকে সংগঠনপূর্ব্বক তাহার পোষণ, রক্ষণ প্রভৃতি ইষ্টসিদ্ধি করিয়া থাকে, সুগ্রন্থেরও অধ্যায়, সর্গ, পরিচ্ছেদ প্রভৃতি সমুদায় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গও তদ্রূপ পদাবলী স্বরূপ হইয়া তাহার ইষ্টার্থসাধক ফলপ্রদায়ক হয়। তাহা যদি না হয়, তবে সেই অধ্যায়, পরিচ্ছেদ ও সর্গাদি নিরর্থক ও বৃথায় সংযোজিত হইয়াছে। কিন্তু যদি সেই সকল সামগ্রীর যথা-সংযোজন হইয়া থাকে, তবে গ্রন্থখানি উপপত্তি-ক্রমে উপক্রম হইতে উপসংহারে উপনীত হইয়া সুন্দর ফলপ্রদ হয়।

গ্রন্থোক্ত বিষয়সামগ্রী যদি উপপত্তি (Argument) অনুসারে পর পর গ্রথিত হইয়া অভ্যস্ত বা আবৃত্ত হইয়া আইসে, তবেই গ্রন্থের পূর্ণাবয়ব সম্পূর্ণ হয় এবং সেইরূপে গ্রন্থ সম্পূর্ণ হইলেই ঠিক বলা যাইতে পারে, এই স্থলে গ্রন্থ—সম্পূর্ণ। উপপত্তিই তবে গ্রন্থকে সম্পূর্ণ করিয়া আনে। এইজন্য তাহা সমালোচ্য গ্রন্থের শেষোক্ত গুণরূপে আমাদের উদ্ধৃত শ্লোকে সর্ব্বশেষে বসিয়াছে।

অর্থবাদ ও উপপত্তি।

কিন্তু উপপত্তি যেরূপ গুণ, তাহা ত অভ্যাসের ঠিক্ পরেই বসা উচিত ছিল, তাহা না হইয়া "অর্থবাদ" বা গ্রন্থের অধিকারের পর বসিল কেন? বসিল এই জন্য যে, গ্রন্থের অধিকার এবং অধিকারীর উপযোগী করিয়াই গ্রন্থসামগ্রীসকল আয়োজিত এবং পর পর সংযুক্ত করিয়া সজ্জিত করা উচিত। তাহা যদি না হইয়া থাকে, তবে গ্রন্থের ইষ্টার্থ সিদ্ধ হইবে কেন? তাই গ্রন্থের অধিকার-ভেদ-অনুসারে তাহার উপপত্তি হওয়া উচিত। অধিকার-অনুসারে যেমন সকল গ্রন্থেরই বিষয়ীভূত সামগ্রীসকল আয়োজিত হইয়া থাকে, তেমনি তাহা তদনুযায়ী উপপত্তিক্রমে পর পর গ্রথিত ও সজ্জিত না হইলে গ্রন্থের ইষ্টার্থ সিদ্ধ হয় না। এই উপপত্তিই সেই আয়োজিত সামগ্রীসকলকে যথাস্থানে সন্নিবেশিত করিয়া দিয়া গ্রন্থোক্ত বিষয়কে জলের মত সহজ ও বিশদ করিয়া আনিয়া সুন্দর ফলপ্রদ করে। এইজন্য "উপপত্তি" শ্লোকমধ্যে "অর্থবাদের" পরে বসিয়াছে।

উপপত্তি ও ফল।

গ্রন্থের প্রকৃতি ও বিষয় যেরূপই হউক না কেন, তাহা উপন্যাস, ইতিহাস, কাব্য, অলঙ্কার, দর্শন, বা ধর্ম্মতত্ত্ব—যাহাই

হউক না, সকল গ্রন্থশরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদি উপপত্তি-অনুসারে সংযুক্ত ও সজ্জিত হওয়া আবশ্যক। অভ্যাস দ্বারা গ্রন্থকার অধিকার-অনুসারে বিষয়-সামগ্রীর আয়োজন করিয়া আনেন, কিন্তু উপপত্তি-অনুসারে সেই সকল সামগ্রীর প্রয়োজনানুযায়ী নিয়োজন বা নিয়োগ করিয়া দেন। প্রয়োজন, আয়োজন এবং নিয়োজন— এই ত্রিবিধ উপকরণে কি ব্রহ্মাণ্ডশরীর, কি জীবশরীর, কি সমাজ-শরীর, কি গ্রন্থশরীর সর্ব্ববিধ শরীরই সুনির্ম্মিত। বিধাতা যেমন এই ত্রিবিধ উপকরণে ব্রহ্মাণ্ড ও জীবশরীর গড়িয়াছেন, নৃপতিও তেমনি ঐ ত্রিবিধ উপায়ে প্রজামণ্ডলীকে বিভক্ত, শিক্ষিত এবং ব্যবস্থিত করিয়া সমাজ-শরীর গড়িয়া আনেন, এবং গ্রন্থকারও তেমনি গ্রন্থোপকরণ-সমুদায়কে প্রয়োজন-অনুসারে আয়োজিত এবং নিয়োজিত করিয়া আনেন। সেই গ্রন্থ-শরীরেই ইষ্টার্থ-সিদ্ধি হয়, যাহার এই ত্রিবিধ উপকরণ সুসম্পন্ন হইয়াছে। তাঁহারই সমালোচনা ঠিক্ বিচারসিদ্ধ হইয়াছে, যিনি গ্রন্থের এই ত্রিবিধ উপকরণের স্বরূপ ধারণা করিয়া বিচার করিতে পারিয়াছেন। এই ত্রিবিধ উপকরণের ধ্যান ও ধারণা করিতে গেলেই সকল গ্রন্থের দোষগুণ আপনা-আপনি বাহির হইয়া পড়ে। সমালোচক বুঝিতে পারেন, কেন গ্রন্থখানি ঠিক্ ফলপ্রদ হয় নাই বা হইয়াছে। এ বড় শক্ত বিচার, এই বিচারই গ্রন্থের শেষ বিচার। এই বিচারে সিদ্ধ হয়, কোন্ গ্রন্থ কিরূপ ফলপ্রদ হইয়াছে, কাহার ফল বিষময় হইয়াছে এবং কাহারই বা ফল অমৃতময় হইয়াছে।

আয়োজিত বিষয়-সামগ্রীকে প্রয়োজনানুসারে নিয়োজিত করিতে গেলেই উপপত্তি তাহাদিগকে যুক্তি, প্রমাণ, উপযোগিতা প্রভৃতি গুণানুসারে যথাস্থানে সংযুক্ত করিয়া দিবে। সুতরাং

উপপত্তি-অনুসারে গ্রন্থের সেই সেই গুণেরও যথোচিত পরিচয় হয়। সমালোচক সেই সকল গুণের বিচার করিতে পারিলে তবে গ্রন্থের উপপত্তির বিচার সিদ্ধ হইবে। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা একখানি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ; আমরা সেই গ্রন্থের উপপত্তির কিঞ্চিৎ পরিচয় দিতেছি।

গীতার উপপত্তি।

গীতার উপক্রম কি, তাহা আমরা "উপক্রমোপসংহার"-নামক প্রস্তাবে বলিয়াছি। আমরা আরও বলিয়াছি, গীতা উপক্রমে যে অপূর্ব্ব বিষয় গ্রহণ করিয়াছেন, অভ্যাসদ্বারা তাহারই পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি ও আলোচনাপূর্ব্বক প্রক্রান্ত বিষয়ের উচ্চ উচ্চ অধিকারে ক্রমশঃ উঠিয়া, উপপত্তির যথারীতিক্রমে চরম উপসংহারে উপনীত হইয়াছেন। সর্ব্ববিধ পাপতাপের একমাত্র কারণ যে মায়া-মোহ, সেই মোহজাত অহঙ্কার হইতে জীব মুক্ত হইতে গেলে ক্রমশই উচ্চ উচ্চ অধিকারে উঠিতে হয়। সেই অধিকারানুযায়ী তাহার সাধনা ও নিয়মিত হইয়া আইসে। সুতরাং গীতার অধিকার অতি সুবিস্তৃত। ঘোর-মোহসমন্বিত পাপাসক্ত জীবকে মুক্তিপথে আনিতে হইলে, তাহাকে নানা অধিকারানুযায়ী সাধনাদ্বারা নিষ্কাম করিতে পারিলে তবে তিনি মুক্ত হইতে পারেন। সেই উচ্চ উচ্চ অধিকারানুযায়ী সাধনা প্রদর্শন করিয়া নিষ্কাম ধর্ম্মের ক্রম প্রকাশ করাতেই গীতার অভ্যাস হইয়াছে। এই অভ্যাসবশতঃ গীতা অধিকারানুযায়ী উপপত্তিক্রমে পূর্ণাবয়ব হইয়া আসিয়াছে। এই পূর্ণাবয়ব বা শরীর তিন প্রধান ভাগে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছে—শিরোদেশ, মধ্যদেশ এবং পাদদেশ। মানব-শরীরের যেমন এই তিন প্রধান ভাগ, গীতা-শরীরেরও তেমনি ঐ তিন

ভাগ। যে সাধনা মুখ্য বিষয়ীভূত, সেই সাধনাই গীতার শিরোদেশ এবং প্রথম ষড়ধ্যায়ের আলোচ্য বিষয়। তৎপরে কথা এই, যাহার সাধনা করিব, সেই সাধ্য কিরূপ? এজন্য দ্বিতীয় ষটে এই সাধ্য বা আরাধ্য ঈশ্বরতত্ত্ব এবং পরম ব্রহ্মপদ প্রদর্শিত হইয়াছে। এই ব্রহ্মপদ ও আরাধ্য ঈশ্বর সাধকগণের মস্তকোপরি স্থাপিত হওয়াতে, গীতার তৃতীয় ষড়ধ্যায়ে সেই সাধকগণের বিষয় আলোচ্য হইয়াছে। তবেই গীতার পাদদেশে সাধকগণ অবস্থিত, তাহার মধ্যদেশে স্বয়ং ভগবান্ ও তাঁহার ঐশ্বর্য্যশালী দেবগণ, এবং শিরোদেশে ধ্যান, ধারণা, আরাধনা প্রভৃতি সাধনা ও নিষ্কাম ধর্ম্মের বিবিধ যোগাঙ্গ।

এই তিন ভাগের প্রত্যেক ভাগ আবার তিন তিন বিভাগে বিভক্ত হইয়াছে। সাধনার তিন ভাগ—কর্ম্ম, ভক্তি ও জ্ঞান-যোগ; সাধ্যের তিন ভাগ—পরমাত্মা পরব্রহ্ম, ঈশ্বর ও ঐশ্বর্য্যসম্পন্ন দেবগণ, এবং সাধকের তিন ভাগ—সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণপ্রধান ত্রিবিধ সাধক। কর্ম্মীর দেবগণ, ভক্তের ভগবান্ এবং জ্ঞানীর ব্রহ্ম। ভক্তি কর্ম্মীকে দেবগণ হইতে ভগবানে উপনীত করেন, এবং ভগবানে পরাভক্তিতে পরিণত হইয়া জ্ঞানে ব্রহ্মপদে পরম ব্রহ্মানন্দে মিশিয়া যান।

গীতার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কিপ্রকার, তাহা আমরা দেখাইলাম। এই অঙ্গপ্রত্যঙ্গসকল অধিকারানুসারেই সজ্জিত হইয়া অভ্যাসবশতঃ প্রধান বিষয় নিষ্কামধর্ম্মের পুনঃ পুনঃ আলোচনায় গীতা পূর্ণাবয়ব হইয়া সম্পূর্ণ হইয়াছে। তাহার প্রত্যেক অধ্যায় কিরূপ উপপত্তি-ক্রমে যুক্তিযুক্ত হইয়া বিন্যস্ত হইয়াছে, তাহা দেখাইতে হইলে সমগ্র গ্রন্থের যুক্তিপথ দেখাইতে হয়। শ্রীধর প্রভৃতি টীকাকার এবং শঙ্করাচার্য্য প্রভৃতি ভাষ্যকারগণ সেই সেই যুক্তিসকলের সম্যক্

সমালোচনা করিয়া দেখাইয়াছেন। সুতরাং আমরা সে বিষয় উল্লেখ করিতে ক্ষান্ত হইলাম। এখন কথা এই, গীতার এই যুক্তিপথ ও উপপত্তি দেখাইতে এত টীকাকার ও ভাষ্যকার কেন? যাঁহারা যেরূপে এই গীতা অধ্যয়ন করিয়াছেন, তাঁহারা গীতাকে সেইরূপে বিশদ করিয়া দেখাইয়াছেন। কাহারও টীকায় কর্ম্মপথ, কাহারও বা ভক্তিপথ, কাহারও ভাষ্যে বা জ্ঞানপথ অতি সুন্দরভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। এজন্য প্রত্যেকেই এক এক অপূর্ব্ব যুক্তিপথ দিয়া গীতার উপসংহারে উপনীত হইয়াছেন। সুতরাং প্রত্যেকেই যুক্তিসিদ্ধ মুক্তিপথ বিবৃত করিয়াছেন। বিভিন্ন অধিকার তাঁহাদিগকে স্বতন্ত্র করিয়া দিয়াছে। আর্য্যসাহিত্যের চমৎকারিত্ব এই অধিকার লইয়া। এই অধিকার শুধু যে এক গ্রন্থকে অপর গ্রন্থ হইতে পৃথক্ করিয়া দেয় এমন নহে, এই অধিকার-ভেদ আবার টীকাকার এবং ভাষ্যকারগণকেও পৃথক্ করিয়া দেয়। এক শ্রীমদ্ভাগবতের শতাধিক টীকা ও ভাষ্য, কিন্তু সকলই বিভিন্ন।

স্মৃতিতেও উপপত্তি।

আমরা গীতাকে যেরূপ বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইলাম, আর্য্যশাস্ত্রের অনেক উৎকৃষ্ট গ্রন্থকেই তদ্রূপ বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইতে পারা যায়। যেহেতু, সে সকল গ্রন্থ আমাদিগের শ্লোকোক্ত উপক্রমাদি গুণাবলিসম্পন্ন। এমন কি, বিধি-নিষেধ-সম্পন্ন মন্বাদি স্মৃতিশাস্ত্রসকলও উপপত্তি-অনুসারে অধ্যায়ে অধ্যায়ে বিভক্ত হইয়া আসিয়াছে; এবং এক এক অধ্যায়স্থ বিধানাবলির মধ্যেও কিয়দংশে যুক্তিপথ পরিদৃষ্ট হয়। ভগবান্ মনুর স্মৃতি ত বিলক্ষণ এ গুণসম্পন্ন। আমরা অপর এক স্মৃতিশাস্ত্র হইতেও ইহার দৃষ্টান্ত দিতেছি।

বিধবা-বিবাহ-বিরুদ্ধে পরাশরের যুক্তি।

অনেকের ধারণা এই যে, স্মৃতিশাস্ত্রে কেবল বিধানসকলই প্রদত্ত হয়। বিধান-শাস্ত্রে বিধি-নিষেধ-বাক্যের যুক্তি প্রদত্ত হয় না। সর্ব্বস্থলেই এ কথা সত্য নহে। কোন কোন স্থলে স্মৃতিশাস্ত্রের বিধান ও ব্যবস্থাসকল বিলক্ষণ যুক্তিসিদ্ধ হইতেও দেখা যায়। কারণ, আমাদিগের শাস্ত্রকারেরা যুক্তিপথ বড়ই ভালবাসিতেন। তাঁহারা এই বাক্যের একান্ত পক্ষপাতী ছিলেন :—

"কেবলং শাস্ত্রমাশ্রিত্য ন কর্ত্তব্যো বিনির্ণয়ঃ।
যুক্তিহীনবিচারেণ ধর্ম্মহানিঃ প্রজায়তে॥"

"কেবল শাস্ত্রবাক্য আশ্রয়পূর্ব্বক ধর্ম্মনিরূপণ করা কর্ত্তব্য নহে। কারণ, যুক্তিহীন বিচার দ্বারা ধর্ম্মহানি হইয়া থাকে।"

পরাশরের মত আমরা এক্ষণে তিনখানি ব্যবস্থাশাস্ত্র হইতে প্রাপ্ত হই—বৃহৎ পরাশরসংহিতা, লঘু পরাশরসংহিতা এবং ব্যাস-সংহিতা। এই তিনখানিই তাঁহার শিষ্যত্রয় কর্ত্তৃক লিখিত। কি বৃহৎ পরাশর, কি ব্যাস, উভয়ই বিধবা-বিবাহের বিরুদ্ধে বলিয়াছেন। লঘু পরাশর অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রতর গ্রন্থ। সুতরাং পরাশরের মত তাহাতে সংক্ষেপে উক্ত হইয়াছে। এজন্য লঘু পরাশরের যুক্তি-পথও অতি সংক্ষিপ্ত। কিন্তু সেই সংক্ষেপের মধ্যে সেই শাস্ত্রকর্ত্তা অতি সুন্দররূপে নিজ গুরুর অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। সেই অভিমত কখন বৃহৎ পরাশর এবং ব্যাস-সংহিতাদ্বয় হইতে বিভিন্ন হইতে পারে না। এ প্রস্তাবে আমরা এই লঘু পরাশরের সংক্ষিপ্ত

যুক্তিপথ বলিতেছি। নবু পরাশরের চতুর্থ অধ্যায়ে বিধবা-বিবাহ-বিরুদ্ধে এইরূপ সংক্ষিপ্ত যুক্তি পরিদৃষ্ট হয়।

প্রথমতঃ। বৈধব্য,—কিরূপ পাতক হইতে কাহার কর্ম্মফল-স্বরূপ বৈধব্য হয়, তাহা শাস্ত্রকার বলিতেছেন :—

"অদুষ্টাপতিতাং ভার্য্যাং যৌবনে যঃ পরিত্যজেৎ।
সপ্তজন্ম ভবেৎ স্ত্রীত্বং বৈধব্যঞ্চ পুনঃ পুনঃ॥
দরিদ্রং ব্যাধিতং মূর্খং ভর্ত্তারং যা ন মন্যতে।
সা মৃতা জায়তে ব্যালী বৈধব্যঞ্চ পুনঃ পুনঃ॥"

"অপতিতা এবং অদুষ্টা ভার্য্যাকে যে ব্যক্তি যৌবনকালে পরিত্যাগ করে, সে সপ্তজন্ম স্ত্রীলোক হইয়া জন্মগ্রহণপূর্ব্বক পুনঃ পুনঃ বৈধব্য-যন্ত্রণা ভোগ করে।"

পুরুষ এই পাতকে স্ত্রীত্ব প্রাপ্ত হইয়া বৈধব্য-যন্ত্রণা ভোগ করে। আর স্ত্রীলোক কোন্ পাতকে তদ্রূপ যন্ত্রণাভাগিনী হন?

"দরিদ্র, ব্যাধিগ্রস্ত ও মূর্খ স্বামীকে যে অবজ্ঞা করে, সে মরণান্তে সর্প হইয়া জন্মগ্রহণ করে এবং পুনঃ পুনঃ বৈধব্য-যন্ত্রণা ভোগ করে।"

এ কথার অর্থ এই, যদি সর্প না হয়, তবে মনুষ্যজন্মেই স্ত্রীজাতীয় হইয়া পুনঃ পুনঃ বৈধব্যযন্ত্রণা ভোগ করে। বৈধব্যের আরও এক কারণ উক্ত হইয়াছে :—

"ঋতুস্নাতা তু যা নারী ভর্ত্তারং নোপসর্পতি।
সা মৃতা নরকং যাতি বিধবা চ পুনঃ পুনঃ॥"

"ঋতুস্নান করিয়া যে নারী স্বামীর নিকট উপগতা না হয়, সে মরণান্তে নরকে বাস এবং পুনঃ পুনঃ (বহু জন্ম) বৈধব্য-যন্ত্রণা ভোগ করে।"

এ স্থলে দেখা যাইতেছে, বৈধব্য-যন্ত্রণাই এক প্রকার নরক-ভোগ। এই বৈধব্য-ভোগ করিবার জন্য যাহাদিগের জন্ম, বিধাতার নিয়মানুসারে তাহাদিগের বৈধব্য ঘটিবেই ঘটিবে। কিন্তু বিধবাদিগের যদি পুনরায় বিবাহ হয়, তবে আর তাহারা বিধবা

থাকিয়া কর্ম্মফল ভোগ করিল কৈ? বরং তদ্বিপরীতই ঘটিল। পুনঃ পুনঃ বিবাহ করিয়া মনোমত পতিগ্রহণপূর্ব্বক সুখিনীই হইল। তাহা হইলে হিন্দুসমাজে সবাই সধবা। ঋষিরা কি এমন ব্যবস্থা করিতে পারেন, যদ্দ্বারা বিধাতার নিয়মভঙ্গ হয়? বিশেষতঃ যে শাস্ত্রকার উক্ত বৈধব্যের নিয়োগ করিয়াছেন, তিনি আর কি বলিয়া সেই বৈধব্য-নিবারণের উপায়স্বরূপ বিধবাদিগের পুনরায় বিবাহের ব্যবস্থা দিতে পারেন? এ ব্যবস্থা কোন মতেই যুক্তিসঙ্গত হয় না। বাস্তবিক তিনি সে ব্যবস্থা করেন নাই। বরং যাহাতে চিরদিন সেই বৈধব্য ভোগ হয়, আমরা দেখাইব, তিনি এইরূপই ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন *।

দ্বিতীয়তঃ। তবে বৈধব্য কি? সকলেই জানেন, পতিহীনতার নাম বৈধব্য। মৃতপতিকাই কি কেবল বিধবা? মৃতপতিকার সহিত সমান-অবস্থাপন্না কে কে? সে কথার উত্তরে স্মৃতিকার বলিলেন :—

"নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে ক্লীবে চ পতিতে পতৌ।"

যাঁহার পতি বহুকাল নিরুদ্দেশ হইয়াছেন, তিনি কি পতিহীনা নহেন? যাঁহার পতি প্রব্রজ্যাগ্রহণপূর্ব্বক সন্ন্যাসী হইয়া বনে গিয়াছেন, তিনি কি পতিহীনা নহেন? যাঁহার পতি ক্লীব, তিনিও

---

* বিধবা-বিবাহ শুদ্ধ শাস্ত্রমতে নিষিদ্ধ এমত নহে, সমাজ-নীতি-অনুসারেও নিষিদ্ধ। সমাজ-নীতি-অনুসারে কিরূপ নিষিদ্ধ, তাহা আমরা "সমাজ-তত্ত্বে" "বালিকা-বিবাহ ও বিধবা-বিবাহ"-নামক প্রস্তাবে প্রদর্শন করিয়াছি। সুতরাং কি ধর্ম্মনীতি, কি সমাজনীতি, উভয় নীতি-অনুসারেই বিধবা-বিবাহ নিষিদ্ধ।

কি একপ্রকার বিধবা নহেন? তাঁহার পতি যে জীবিত থাকিতেও নাই। আর যাঁহার পতি পতিত হইয়া বিধর্ম্মী ও জাতিচ্যুত হইয়া চণ্ডালত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন, তিনিও কি পতিহীনা হইয়া গৃহে একাকিনী অবস্থিতা নহেন? বলিতে গেলে মৃতভর্ত্তৃকার সহিত এই চতুর্ব্বিধ নারীও সমান অবস্থাপন্ন এবং একপ্রকার বৈধব্যদশা প্রাপ্ত। তবে সর্ব্বসাধারণে কেবল মৃতভর্ত্তৃকাকেই বিধবা বলিয়া থাকেন, এই প্রভেদ। সেইজন্যই স্মৃতিকার প্রচলিত "বিধবা"-শব্দ ব্যবহার না করিয়া বলিলেন, ঐ পঞ্চপ্রকার নারী—সকলেই একই প্রকার আপৎকালে অবস্থিত। তাঁহারা :—

"পঞ্চস্বাপৎসু"

মৃতপতিকার যে দশা, অপর চতুর্ব্বিধ নারীর যদি সেই দশাই ঘটিয়া থাকে, তবে তাহাদিগকে বিধবাই বল, অথবা সম-অবস্থাপন্ন আপৎকালে অবস্থিতই বল, সে একই কথা। কারণ, সেই পঞ্চবিধ নারীর মধ্যে মৃতপতিকা বিধবাও রহিয়াছেন। অপর চারিজনকে মৃতপতিকার সহিত একই সূত্রে আবদ্ধ করিবার কারণ এই যে, স্মৃতিকারেরা ব্যবস্থা দিবার সময় একভাবাপন্ন সর্ব্বজনের প্রতি যাহাতে একরূপ ব্যবস্থা প্রযুক্ত হয়, এমন ভাবেই ব্যবস্থা দিয়া থাকেন। সেইরূপ মৃতপতিকার প্রতি প্রযুক্ত করিবার নিমিত্ত সকলকেই একই সূত্রে আবদ্ধ করিয়া শাস্ত্রকার বলিলেন :—

"পঞ্চস্বাপৎসু নারীণাং পতিরন্যো বিধীয়তে।"

একই আপৎকালে অবস্থিত সেই পঞ্চবিধ নারীদিগের

"পতিরন্যো বিধীয়তে।"

তবে এইক্ষণে এই বিধান বিচার্য্য।

তৃতীয়তঃ। ব্যবস্থা হইল, ঐ নারীদিগের অন্য পতি বিহিত। তবেই দেখিতে হইবে, নারীদিগের অন্য পতি বলিতে কি বুঝায়? যদি আমরা বলি কালিদাসের অন্য নাটক, তাহা হইলে কি বুঝাইল না, কালিদাসের "শকুন্তলা" ব্যতীত অন্য নাটক? সে নাটকও অবশ্য কালিদাসকৃত এবং তাহাও আছে। যদি বলি, ব্রাহ্মণদের অন্য বাড়ী, তাহা হইলে কি বুঝাইল না, সেই ব্রাহ্মণদের অন্য বাড়ীও আছে? তদ্রূপ, "নারীদিগের অন্য পতি" বলিলে কি বুঝাইল না যে, সে পতিও নারীদিগের আছে? "নারীণাং পতিরন্যো" বলিলে কি এরূপ আকাঙ্ক্ষা বুঝায় না? যদি বুঝায়, তবে বরং বিচার্য্য, নারীদিগের অন্য পতি কে আছে? কিন্তু এ কথা দ্বারা নিশ্চয় এমন বুঝায় না যে, নারীদিগের অন্যবার বিবাহ বিহিত। কারণ, পতি-শব্দের অর্থ বিবাহ নহে। লঘু পরাশরের স্মৃতিকারও এমন কথা বলেন নাই যে, আপৎকালে সেই নারীদিগের অন্যবার বিবাহ বিহিত। মনু বলেন :—

> "নোদ্বাহিকেষু মন্ত্রেষু নিয়োগঃ কীর্ত্ত্যতে ক্বচিৎ।
> ন বিবাহবিধাবুক্তং বিধবাবেদনং পুনঃ॥"—নবম অধ্যায়, ৬৫।

কুল্লূক ইহার টীকায় বলেন :—

"ন চ বিবাহবিধায়কশাস্ত্রেঽন্যেন পুরুষেণ সহ পুনর্ব্বিবাহ উক্তঃ।"

"বিবাহের যে সকল মন্ত্র আছে, তাহাতে এমন প্রকাশ নাই যে, একের স্ত্রীতে অন্যের নিয়োগ আছে এবং বিবাহবিধায়ক শাস্ত্রে লিখিত নাই যে, বিধবা স্ত্রীর পুনর্ব্বিবাহ (অর্থাৎ নিয়োগ) আছে।

এ স্থলে মনু বলিতেছেন, বিবাহবিধায়ক কোন শাস্ত্রেই বিধবার পুনরায় বিবাহের কথা উক্ত নাই। সুতরাং পরাশরেও তাহা উক্ত হয় নাই। পরাশরের "পতিরন্যো বিধীয়তে"র তবে নিশ্চয়

অন্য অর্থ আছে। তিনি যখন অন্যবার বিবাহের কথা বলেন নাই, তখন তাঁহার "অন্য পতি" শব্দের অর্থ স্বতন্ত্র। সে পতি নিশ্চয় বিবাহিত পতি নহে। সে পতি কে, তাহা যদি শাস্ত্রেই উক্ত থাকে, তবে তখনকার কালে শাস্ত্রজ্ঞ মাত্রেরই তাহা জানা ছিল। এজন্য, তাহা আর বিশেষ করিয়া বলিবার আবশ্যকতা হয় নাই। শুধু অন্য পতি বলাতেই যথেষ্ট হইয়াছিল। এই দেখুন, শাস্ত্রে সেই অন্য পতির কথা কিরূপ উক্ত হইয়াছে :—

"মানসঃ সর্ব্বভূতানাং বাসুদেবঃ শ্রিয়ঃ পতিঃ।
স এব দেবতালিঙ্গৈর্নামরূপবিকল্পিতৈঃ।
ইজ্যতে ভগবান্ পুংভিঃ স্ত্রীভিশ্চ পতিরূপধৃক্।
তস্মাৎ পতিব্রতা নার্য্যঃ শ্রেয়স্কামাঃ সুমধ্যমে।
যজন্তেঽনন্যভাবেন পতিমাত্মানমীশ্বরম্॥"

শ্রীমদ্‌ভাগবত, ৬ষ্ঠ স্কন্ধ, ১৮ শ অধ্যায়।

"সর্ব্বভূতের হৃদয়বাসী—সেই শ্রীপতি লক্ষ্মী-পতি ভগবান্ বাসুদেবই নাম-রূপ-পার্থক্যদ্বারা পৃথক্‌কৃত বিবিধ দেবমূর্ত্তি ধারণ করিয়া পুরুষদিগের নিকট এবং পতিরূপধারী হইয়া স্ত্রীলোকদিগের নিকট পূজিত হয়েন। অতএব, হে সুমধ্যমে, মঙ্গলার্থিনী পতিব্রতা নারীগণ পতিকে আত্মা এবং ঈশ্বরবোধে পূজা করেন।"

প্রকৃতিপতি ও লক্ষ্মীপতি শ্রীভগবান্ নারীদিগের পতিরূপে বরাবরই বিদ্যমান। বিবাহিত পতি-সত্ত্বেও তিনি বিদ্যমান। সেই বিবাহিত পতি তাঁহার কল্পিত রূপ মাত্র। তিনি প্রধান পতির প্রতিরূপ। সুতরাং নামরূপকল্পিত পার্থিব বিবাহিত পতির অভাব হইলে, সেই প্রধান ও প্রকৃত পতিকেই তাঁহার স্থানে প্রতিষ্ঠিত করিয়া লওয়া শাস্ত্রের অনুশাসন।

পুরুষের একমাত্র পতি—শ্রীভগবান্। নারীদিগের পতি দুই—

(১) বিবাহিত পতি,—(২) শ্রীভগবান্—যিনি সেই বিবাহিত পতির আত্মারূপে পূর্ব্ব হইতেই বর্ত্তমান। যিনি চিরকালই পতি হইয়া আছেন, তাঁহাকে আপৎকালে স্মৃতিকার "পতিরন্যো" বলিয়া বিশিষ্টরূপে আশ্রয় গ্রহণ করিতে বলিয়াছেন। তিনিই "নারীণাং পতিরন্যো"। তাঁহাকে আর গ্রহণ করিতে হয় না; কারণ, তিনি বরাবরই গৃহীত হইয়া আছেন। এই জন্য "পতিরন্যঃ"-শব্দের পর "বিধীয়তে" শব্দের সুন্দর প্রয়োগ হইয়াছে। লঘু পরাশর-কর্ত্তা অন্যপতি গ্রহণীয় বলেন নাই, অন্যপতি বিহিত বলিয়াছেন।

সমুদায় শাস্ত্র-পর্য্যালোচনায় এই অর্থই সুসঙ্গত বোধ হয়। সাধ্বী দময়ন্তীর পতি যখন নিরুদ্দেশ হইয়াছিলেন, তখন তিনি ব্রহ্মচর্য্যই অবলম্বন করিয়াছিলেন। তবে যে তিনি নলের উদ্দেশে দ্বিতীয়বার বিবাহের ঘোষণা করিয়া দিয়াছিলেন, তাহা কেবল কৌশলক্রমে সেই পতিরই লাভরূপ উদ্দেশ করিবার জন্য। নহিলে, তিনি যদি ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন না করিয়া আবার বিবাহ করিতেন, তাহা হইলে নল ফিরিয়া আসিলে কি সঙ্কট উপস্থিত হইত? পতির নিরুদ্দেশকালে নারীদিগের পুনরায় বিবাহ হইলে এইরূপ সঙ্কট ঘটিবার সম্ভাবনা। এ কথা কি শাস্ত্রকার বুঝেন নাই? না বুঝিয়া তিনি পুনর্ব্বার বিবাহের ব্যবস্থা দিবেন? শ্রীরাধিকার পতি ক্লীব ছিলেন বলিয়া তিনি ভগবান্ হরিকেই পতিত্বে বরণ করিয়াছিলেন। কিন্তু পতি ক্লীব বলিয়া যদি তাহার পত্নীর পুনরায় বিবাহ হয়, তবে সমাজে ক্লীব-সংখ্যার এবং অশান্তির আর পরিসীমা থাকে না। এজন্য সমাজে মহা সঙ্কট উপস্থিত হয়। ঋষি যাজ্ঞবল্ক্যের প্রব্রজ্যা ঘটিলে তাঁহার প্রথমা পত্নী মৈত্রেয়ী সহধর্ম্মিণীর মত সঙ্গে সঙ্গেই গিয়াছিলেন; দ্বিতীয়া পত্নী ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বনপূর্ব্বক গৃহেই অবস্থিতা

ছিলেন। নহিলে, সেই বৃদ্ধ বয়সে কি আবার দ্বিতীয়বার বিবাহ করা সম্ভব হয়? শাস্ত্রানুসারে পঞ্চাশ বৎসর বয়ঃক্রমেই প্রব্রজ্যা গ্রহণ করা উচিত। শাস্ত্রকার কি সেইরূপ বৃদ্ধ সন্ন্যাসীর পত্নীর পুনর্ব্বার বিবাহ বিহিত বলিতে পারেন? পরমর্ষি দেবল সন্ন্যাস গ্রহণ করিলে তাঁহার পত্নী সুযজ্ঞ রাজার কন্যা রত্নমালা বহুকাল পতিবিরহে ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়াছিলেন।

পতিতের কথা পুরাণের অধিকারভুক্ত নহে বলিয়া পতিতদিগের বিবরণ শাস্ত্রে তত দেখিতে পাওয়া যায় না; নহিলে, আমরা সে দৃষ্টান্তও দিতে পারিতাম। পতিত পতিকে পরিত্যাগ করিয়া যদি কোন পতির আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়, তবে শ্রীভগবান্‌ই সেই নিখিল-কল্যাণগুণযুক্ত একমাত্র পতি। কারণ, প্রতিনিধির অভাবে নিধিই গ্রহণীয় হয়। কিন্তু অপর ত্রিবিধ নারীর আপৎকালে যদি পুনর্ব্বার বিবাহ হয়, তাহা হইলে যে সঙ্কট এবং বিরুদ্ধাচরণ হয়, সে বিষয়ও বিবেচনা করিলে কি প্রতীত হয় না যে, শাস্ত্রকার কখন সেরূপ বিবাহ-নিয়োগ করিতে পারেন না? অতএব এই চতুর্ব্বিধ নারীর আপৎকালে যে "পতিরন্যো" বিহিত হওয়াতে, তাহাদিগের ব্রহ্মচর্য্যই অবলম্বনীয় হইয়াছে, লঘু পরাশর-কর্ত্তা মৃতভর্ত্তৃকার আপৎকালেও সেই পতিই তাঁহার পক্ষে নিশ্চিত বিহিত বলিয়াছেন। ভিন্ন ব্যবস্থা বিহিত হইলে তাহাকে পৃথক্ করা হইত, "পঞ্চস্বাপৎসু নারীণাং" হইত না।

উপরে "পতিরন্যো"-শব্দের যে অর্থ ধৃত হইল, তাহার একটি আপত্তি এই—এ স্থলে পতি-শব্দের যে ঐ অর্থ, তাহার পরিভাষা কই? তৎপক্ষে বক্তব্য এই যে, স্মৃতিতে পরিভাষা করিয়া শব্দপ্রয়োগের রীতি নাই। শব্দের চলিতার্থই গৃহীত হইয়া থাকে। সে অর্থ

ধরিলে পতি-শব্দের অর্থ "বিধাহ" হয় না। সেই "পতিরন্যো" কে, তাহা পূর্ব্বকালে সাধারণতঃ বিদিত ছিল। তজ্জন্য বিধবাদিগের ব্রহ্মচর্য্যই চিরকাল চলিয়া আসিতেছে। তৎপক্ষে কখনও কাহার সন্দেহও হয় নাই। পরাশরের মত যে অন্যবিধ ছিল, এ কথা অপর শাস্ত্রকারেরাও বুঝেন নাই। বিদ্যাসাগর মহাশয় নিজ অভি-প্রায়সিদ্ধ্যর্থ কষ্টকল্পনা করিয়া ভিন্নার্থ করিয়াছিলেন মাত্র।

চতুর্থতঃ। লঘু পরাশরকর্ত্তা যে বিধান দিয়াছেন, সেই বিধি-বাক্যের পরশ্লোকেই তাহার "ফলশ্রুতি" কীর্ত্তন করিয়াছেন। সেই "ফলশ্রুতি" দ্বারাও সপ্রমাণ হয়, তাঁহার বিধানের প্রকৃত অর্থ কি। তাহার অর্থ যে ব্রহ্মচর্য্য, সেই ব্রহ্মচর্য্যেরই গৌরব ঠিক্ পরশ্লোকেই কীর্ত্তিত হইয়াছে। এই ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বনীয় হইলে, যাঁহারা বিধবা হন, তাঁহারা চিরকালই বিধবা থাকিয়া যান। এজন্য তাঁহার বাক্যাবলির পূর্ব্বাপরসঙ্গতি রক্ষা হইয়াছে। কিন্তু লঘু পরাশর-বচনের ভিন্নার্থ করিলে সে অর্থের এরূপ সঙ্গতি কিছুতেই রক্ষা করা যায় না। ভিন্নার্থ করিলে, সে বচনকে "প্রক্ষিপ্ত" বলিতে হয়। নহিলে, শাস্ত্রমধ্যে সে বচনের স্থান হইতে পারে না। কিন্তু ধৃতার্থ গ্রহণ করিলে আর কোন প্রকার অসঙ্গতি ঘটে না। সেই অর্থেই ঠিক্ পরশ্লোকে ব্রহ্মচর্য্যের মাহাত্ম্যকীর্ত্তন অতি সার্থক ও সুসঙ্গত হই-য়াছে। অথচ বিধবাগণ ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিলে তাহাদিগের বৈধব্যদশার অনেকাংশে শান্তিবিধান হয়। শুধু যে ইহলোকে শান্তি-বিধান হয় এমন নহে, মরণান্তেও ব্রহ্মচর্য্যের সঞ্চিত পুণ্যবলে বিধবাগণ ব্রহ্মচারীদিগের যে গতি, সেই গতি লাভ করিয়া থাকেন। এতদর্থে স্মৃতিকার ঠিক্ পরশ্লোকেই এইরূপ কীর্ত্তন করিয়াছেন :—

"মৃতে ভর্ত্তরি যা নারী ব্রহ্মচর্য্যে ব্যবস্থিতা।
সা মৃতা লভতে স্বর্গং যথা তে ব্রহ্মচারিণঃ॥"

"স্বামীর মরণান্তে যে নারী ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করেন, তিনি মৃত্যুর পর ব্রহ্মচারীর ন্যায় স্বর্গলাভ করেন।"

বলিয়াছি ত "পতিরন্যো"র অর্থ যদি স্বয়ং সর্ব্বপতি শ্রীভগবান্ হন, তবেই তৎপরে এইরূপ ব্রহ্মচর্য্যের গৌরব-কীর্ত্তনের সুন্দর সার্থকতা ও উপযোগিতা দৃষ্ট হয়। নহিলে, পুনর্ব্বার বিবাহ করিতে বলিয়া তৎপরেই ব্রহ্মচর্য্যের গৌরব-কীর্ত্তন তত সুসঙ্গত হয় না। শাস্ত্রকার যদি সেরূপ বিবাহের বিধান দিতেন, তাহা হইলে ব্রহ্মচর্য্যের গৌরব-কীর্ত্তন করিবার পূর্ব্বে "কিন্তু" শব্দের প্রয়োগ করিতেন। সেরূপ বিপরীত-অর্থ-ব্যঞ্জক যখন কোন শব্দের প্রয়োগ নাই, তখন নিশ্চয় বুঝিতে হইবে, শাস্ত্রকারের অভিমত পুনর্ব্বার বিবাহ নহে; তাঁহার অভিমত এমত পতিগ্রহণ, যদ্দ্বারা সেই ব্রহ্মচর্য্যই অবলম্বনীয় হয়, যে ব্রহ্মচর্য্যের গৌরব পরে কীর্ত্তিত হইয়াছে। আবার যে নারী পতিকেই পরম দেবতাজ্ঞানে তাঁহার মরণান্তে সহমৃতা হইয়া আত্ম-সমর্পণপূর্ব্বক তাঁহার অনুগামিনী হন, তাঁহার পক্ষেই যথার্থ "পতি-রন্যো বিধীয়তে" হইয়াছে। কারণ, শাস্ত্রেই বলিয়াছেন :—

"পতিরেব হি নারীণাং দৈবতং পরমং স্মৃতম্।"
"নারীদিগের পতিই পরম দেবতা।"

সেইরূপ দেবতাজ্ঞানে যে নারী পতির মরণান্তে সহধর্ম্মিণী হইয়া তাঁহার অনুগামিনী হইতে পারেন, লঘু পরাশরের স্মৃতিকার তদ্রূপ সহধর্ম্মিণীর অধিকতর গৌরব কীর্ত্তন করিয়া বলিলেন :—

"তিস্রঃ কোট্যোঽর্দ্ধকোটী চ যানি রোমাণি মানবে।
তাবৎকালং বসেৎ স্বর্গে ভর্ত্তারং যানুগচ্ছতি॥"

"স্বামীর মরণে যিনি সহমৃতা হন, সেই স্ত্রী, মানবদেহে যে সার্দ্ধ ত্রিকোটি-সংখ্যক রোম আছে, তাবৎপরিমিত কাল স্বর্গভোগ করেন।"

স্বয়ং ভগবান্‌ই যে পতিরূপে বর্ত্তমান; তাঁহার অনুগামিনী হইয়া যে নারী স্মৃতিকারের "পতিরন্যো"র বিধি অবিলম্বেই অনুসরণ করিলেন, তাঁহার গৌরব যে তিনি শতমুখে গাহিবেন, তাহা আর আশ্চর্য্য কি? চমৎকার ফলশ্রুতি! ফলশ্রুতির এতদূর সার্থকতা শাস্ত্রের আর কোন স্থলে পরিদৃষ্ট হয় না।

সাহিত্যে অভিশাপ।

বিলাতী সাহিত্যে অভিশাপ নাই।

আর্য্যভারত ভিন্ন আর কোন দেশের সাহিত্যমধ্যে অভিশাপ পরিদৃষ্ট হয় না। শুধু পরিদৃষ্ট নহে, আর্য্যসাহিত্যমধ্যে অভিশাপের ছড়াছড়ি। ছড়াছড়ি কি? অভিশাপ আর্য্যসাহিত্যের অস্থি-মজ্জা। অভিশাপের উপকরণে আর্য্যসাহিত্যের অনেক কাব্য-নাটক সংগঠিত হইয়াছে। পুরাণাদি অভিশাপে ভরা; সেই অভিশাপ সুতরাং পৌরাণিক কাব্যাবলির মূল মন্ত্র হইয়াছে। কাব্যের মন্ত্রণা ও ষড়যন্ত্রের মূল এই অভিশাপ।. তাই আমরা দেখিতে পাই, কালিদাসের প্রধান কাব্য-নাটকে এই অভিশাপেরই স্ফূর্ত্তি ও পরিবর্দ্ধন। আর্য্যসাহিত্যেই কেবল অভিশাপ আছে, অন্য দেশীয় সাহিত্যে তাহা নাই কেন, এ কথা কি কেহ কখন ভাবিয়া দেখিয়াছেন? যদি না ভাবিয়া থাকেন, একবার ভাবিয়া দেখা উচিত। আমরা পূর্ব্বে দেখাইয়াছি, বিলাতী সাহিত্যে এমত অনেক সামগ্রী আছে, যাহা আর্য্যসাহিত্যে নাই। এক্ষণে দেখাইব, আর্য্যসাহিত্যে আবার এমত সকল সামগ্রী আছে, যাহা বিলাতী সাহিত্যে নাই। তন্মধ্যে এই অভিশাপ প্রধানতঃ গণ্য। প্রধানতঃ বলি এই জন্য, যেহেতু, এই অভিশাপই এই দুই সাহিত্যের প্রকৃতি বিভিন্ন করিয়া দিয়াছে। কিরূপে দিয়াছে, তাহা এই প্রস্তাবে আলোচ্য।

অভিশাপ সামাজিক শাসন।

ধর্ম্মপ্রাণ আর্য্যজাতির সমস্ত ক্রিয়াকাণ্ড ধর্ম্মার্থ গৃহীত হইত এবং আজিও হইয়া থাকে। ধর্ম্মের প্রতি হিন্দুর প্রবৃত্তি আকৃষ্ট করিবার নিমিত্ত যত কাম্য কর্ম্মের শেষে সেই সেই কর্ম্মের ফলশ্রুতি আছে। আর্য্যসাহিত্যের ফলশ্রুতি দ্বারা যেমন সেই সাহিত্যের বিশেষত্ব ও ধর্ম্ম নির্ণীত হয়, সেই ফলশ্রুতি তেমনি প্রতি কাম্য-কর্ম্মের ও ব্রতানুষ্ঠানের বিশেষ ফলাফল নির্দ্দেশ করিয়া দেয়। হিন্দুর সাহিত্য-পাঠ যেমন বৃথায় নহে, শুধু চিত্তরঞ্জনমাত্র নহে, তাহার কাম্য-কর্ম্মানুষ্ঠানও তেমনি বৃথায় নহে। সর্ব্বথা তাহার ধর্ম্ম-প্রবৃত্তির উন্মেষসাধন ও উত্তেজন করাই প্রধান উদ্দেশ্য। সেই ধর্ম্মপথে তাঁহাকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া রাখিবার নিমিত্ত আর এক বিশেষপ্রকার উপায় অবলম্বিত হইয়াছে। পাছে হিন্দু ঘুণাক্ষরে ধর্ম্মপথ হইতে বিচলিত হন, তাই তাঁহার ধর্ম্মশাস্ত্রে, কাব্য-নাটকে এবং সর্ব্ববিধ সাহিত্যে অভিশাপের ভীষণ মূর্ত্তি প্রদর্শিত হইয়াছে। এই অভিশাপভয় লোকের অন্তরে অন্তরে লাগে। সেই ভয়ে ভীত হইয়া তাঁহাকে অতি সাবধানে সংসারকার্য্য অনুষ্ঠান করিতে হয়। ইহা রাজদণ্ড-ভয় নহে, কিন্তু তদপেক্ষা অতি গুরুতর দণ্ডভয়। লোকে রাজদণ্ড এড়াইতে পারে, কিন্তু শাপভয় এড়াইতে পারে না। কে কবে লোকের অহিত করিয়া, লোকের মনোবেদনা দিয়া পরের অভিশাপ হইতে নিস্তার পাইয়াছে? অভিশাপ যে অতি গোপনে মনে মনে প্রদত্ত হইয়া থাকে। নিজে রাজাও প্রজার অভিশাপ-ভয়ে ভীত। গুরুর শাপ লঘুতে লাগে, লঘুর শাপ গুরুতে লাগে। তজ্জন্য হিন্দু অনেক সময়ে অনেক অধর্ম্মাচার ও রূঢ় কার্য্য

হইতে আপনা-আপনি নিরস্ত হন। এ কিছু কম সামাজিক শাসন নহে? পাছে হিন্দুকে শাপগ্রস্ত হইতে হয়, পাছে সেই শাপের ফলা-ফল কালবিলম্বে ভোগিতে হয়, এই ভয়ে হিন্দু সশঙ্কিত। এই আশঙ্কা ও দেবকোপ-ভয় সর্ব্বলোক-মনে জাগরূক রাখিবার নিমিত্ত আর্য্যসাহিত্যের সর্ব্বত্রই অভিশাপ পরিদৃষ্ট হয়।

ধর্ম্ম-লঙ্ঘনের ফল অভিশাপ।

হিন্দু ভিন্ন আর কোন জাতি ধর্ম্মের গতি পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে নির্ণয় করিতে সমর্থ হয়েন নাই। বেদ-বেদান্তের অতি সূক্ষ্ম ও প্রগাঢ়-তম ধর্ম্মতত্ত্ব-সকলের ব্যাখ্যা করিবার জন্য আর্য্য দর্শনশাস্ত্র, স্মৃতি, পুরাণ ও তন্ত্রাদির স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র অধিকার নির্ণীত হইয়াছে। স্মৃতিশাস্ত্রে হিন্দুর সমস্ত কর্ত্তব্যপথ এত সুন্দর ও পরিপাটীরূপে প্রদর্শিত হই-য়াছে যে, তজ্জন্য তাহার কর্ত্তব্য-অবধারণের আর কোন সাহায্য আবশ্যক হয় না। সেই কর্ত্তব্যপথ হিন্দুধর্ম্মের মহা শিক্ষাপ্রণালী। যে মুনি-ঋষিগণ দেবত্বলাভ করিয়াছিলেন, সেই ঈশ্বরেরা এই কর্ত্তব্যপথের পরম গুরু ও নেতা। সামান্য লোকে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য-নির্ণয়ে অসমর্থ বলিয়া আর্য্যসাহিত্যে সকল শাস্ত্রের শিক্ষাদাতা আপ্ত-গণ ও ঈশ্বরেরা। ঈশ্বর-বাক্য ও ঈশ্বরসম আপ্তগণের বাক্য বলিয়া তৎপ্রতি কাহারই সন্দেহের কারণ হইতে পারে না। এই কর্ত্তব্য-পথে তাপস জনগণেরও যখন ঈষৎ পদস্খলন হইয়াছে, অমনি তাঁহাদিগকে দেবকোপ-ভাজন হইয়া শাপগ্রস্ত হইতে হইয়াছে। সুতরাং এই অভিশাপ হিন্দুর কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যের অতি সূক্ষ্ম পাপ-কলঙ্ক সমস্ত নির্দ্দেশ করিয়া দেয়; দেখাইয়া দেয়, তাপসজনেরাও ধর্ম্মের ক্ষুরধারে পড়িয়া কোথায় অতি সূক্ষ্ম পাপে পতিত হইলেও

তাহাদিগকে সেই পাপ হইতে বিমুক্ত হইয়া বিশুদ্ধ ধর্ম্মপথে পরিবর্দ্ধিত হইতে হইত। কারণ :—

"Man's glory consists not in never falling, but in rising every time he falls."

তপস্বিগণ জীবের এই স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম্মপথে বিচরণ করিতে করিতে একেবারে সর্ব্বপাপ হইতে বিমুক্ত না হইতে পারিলে ঋষিত্বে উপনীত হইতে পারিতেন না। অভ্যাসযোগে এই ধর্ম্মপথ সহজ হইয়া আইসে। ধর্ম্মপথে কোথায় একটু বাঁধিতেছে, তাহা তাঁহাদের দেবচরিত্রে প্রদর্শিত হইয়াছে। পুরাণ সেই চরিত্র বিশিষ্টরূপে দেখাইবার জন্য কোথায় কোথায় ঋষিগণের পদস্খলন হইয়াছিল, তাহা দেখাইয়া দেয়। সম্পূর্ণ ঋষিত্ব লাভ করিতে হইলে সম্পূর্ণ বিশুদ্ধতা লাভ করিতে হয়। শাপান্ত হইলে তবে সেই বিশুদ্ধতা লব্ধ হয়। দেবর্ষি নারদ সেইরূপ ঋষিত্ব লাভ করিবার পূর্ব্বে শাপগ্রস্ত হইয়াছিলেন। যে দুর্ব্বাসা এত লোককে শাপ দিয়াছিলেন, তিনিও এককালে তদীয় শ্বশুর ঔর্ব্বঋষি-কর্ত্তৃক অভিশপ্ত হইয়াছিলেন। নহুষ স্বর্গে উঠিয়াও শাপগ্রস্ত হইয়া পতিত হইয়াছিলেন। কারণ, হিন্দুর নিকট স্বর্গও চরমগতি নহে। বিশ্বামিত্র ব্রহ্মত্ব লাভ করিবার পূর্ব্বে ব্রহ্মতেজঃসম্পন্ন বশিষ্ঠকর্ত্তৃক পরাভূত হইয়াছিলেন। ব্রহ্মপদই ঋষির পরম পদ।

অধ্যাত্ম-রাজ্যের অলঙ্ঘ্য নিয়ম।

এ সংসারের কার্য্যক্ষেত্রে ধর্ম্মাধর্ম্মের অলঙ্ঘ্য ফলাফল কি সকল সময় পরিদৃশ্যমান হয়? যাঁহার যেরূপ শিক্ষা ও অন্তর্দৃষ্টি, তাঁহার কাছে এই ফলাফল সেইরূপে প্রতীয়মান হয়। আগুনে হাত দিলেই

হাত পুড়িবে; তেমনি কার্য্যমাত্রেরই ফল আছে। সেই ফল কখন কখন বাহিরে প্রকাশিত হয়, কখন হয় না। কি চিন্তা, কি প্রবৃত্তি, কি চেষ্টা, কি কার্য্য, মানুষের সর্ব্ব বিষয়েরই ফল ও ভোগ আছে। তাহারা হয় মানুষের আধ্যাত্মিক প্রকৃতিকে অধোগামিনী, না হয় উর্দ্ধগামিনী করিতেছে; হয় পাপপথে, না হয় পুণ্যপথে লইয়া যাই-তেছে; তাহার সূক্ষ্ম শরীরকে অনবরতই গড়িয়া আনিতেছে। সেই গড়নের ফলাফল আমাদের প্রকৃতির অলঙ্ঘ্য নিয়মে ঘটিয়া থাকে; কেহ বাধা দিতে পারে না। কারণ, তাহা প্রাকৃতিক নিয়ম। প্রকৃতি শক্তিরূপা; সেই শক্তির প্রাণ সর্ব্ব-শক্তিমান্। সর্ব্বশক্তিমানের নিয়ম কে লঙ্ঘন করিতে পারে? সেই নিয়মদ্বারাই তিনি ফলাফল-দাতা। প্রকাশ্যে অনেক গোপনীয় দুষ্কৃতি ও পাপ অশাসিত ও অদণ্ডিত থাকে, থাকিয়া অন্তরে অন্তরে প্রবৃদ্ধ হইতে থাকে। যখন চার পোয়া হয়, তখন ভগবানের অলঙ্ঘ্য নিয়মে, প্রকৃতির স্বভাব-বশতঃ ধরা পড়ে; ধরা পড়িয়া শাসিত ও দণ্ডিত হয়। কারণ, প্রকৃতির অধীশ্বর-পুরুষ ভগবান্ সর্ব্ব-ফলাফলদাতা। তাই ভগবান্ বলিয়াছেন :—

"যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্॥
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥"

পুরাণে অধ্যাত্ম-রাজ্য প্রকটিত।

এ নিয়মের অতিক্রম করা কোন পাপীর সাধ্যায়ত্ত নহে। পাপী রাজার দণ্ডবিধি হইতে নিস্তার পাইতে পারে, কিন্তু ধর্ম্মের সূক্ষ্ম রাজ্যের দণ্ডবিধিতে ধরা পড়ে,—পড়িবেই পড়িবে। অভিশাপ এই

দণ্ডবিধির সামান্য মুখভারতী মাত্র—ভগবানের অস্ফুট দণ্ড-প্রচার মাত্র। সে মুখভারতী যে স্থলে না প্রকাশিত হয়, সে স্থলে গোপনে গোপনে উচ্চারিত হয়। অন্তরে অন্তরে পাপ পরিবর্দ্ধিত হইলে সময়ক্রমে সেই শাপের ফলাফল পরিদৃষ্ট হয়। হিন্দুধর্ম্মের কর্ম্ম-ফলবাদের নিগূঢ় রহস্য এই। সেই কর্ম্মফলবাদই পাপপুণ্যের রহস্য, ও অলঙ্ঘ্য নিয়ম প্রকাশিত করিয়া দিয়াছে। পুরাণ তাহা প্রকাশ করিয়াছে। বাহ্য অবয়বে ছবি আঁকিয়া দেখাইয়াছে। লোকচরিত্রে দেদীপ্যমান করিয়া দেখাইয়াছে। যে ফল স্থূল জগতে সকল সময় প্রকটিত হয় না, সূক্ষ্ম অধ্যাত্ম-জগতে তাহা কেমন প্রকটিত হয়, পুরাণ তাহাই স্থূল অবয়বে লোকচরিত্রে দেখা-ইয়া দেয়। গীতা যে অধ্যাত্ম-রাজ্যের অকাট্য নিত্য নিয়মাবলী খ্যাপন করিয়াছে, বিশাল মহাভারত তাহা বাহ্য দৃষ্টান্তে ও লোক-চরিত্রে জাজ্বল্যমান করিয়া দিয়াছে। সমস্ত পুরাণই এইরূপ অধ্যাত্ম-রাজ্যের ধর্ম্মনিয়ম-প্রকাশক; সেই ধর্ম্মরাজ্যকে বাহ্য অবয়বে প্রকটিত করিয়া দেখায়। যাহা এইরূপ করে, তাহাই পুরাণ; তাহাই সেই পুরাণ বেদের পুরাণ কথা। তাই তাহার নাম পুরাণ। তাহাই ভারত-সৃষ্টি—মহাভারত—ভারতীর মহাসৃষ্টি—মুখভারতীর দেদীপ্যমান বিশাল দৃশ্যপট—গীতার অধ্যাত্ম-রাজ্যের প্রকট দৃশ্য। তাহাই পঞ্চম বেদ—পঞ্চম বেদ বলিয়া পুরাণ কথা। পুরাণ এইরূপ সূক্ষ্ম তত্ত্বের স্থূল অবয়ব বিকাশ করিয়া লোক-শিক্ষা দেয়।

অভিশাপ অধ্যাত্ম-রাজ্যের দণ্ড-বিধান।

পৌরাণিক সাহিত্য তবে অধ্যাত্ম-রাজ্যের নিত্য নিয়মের প্রকট রূপ—যে রূপ সকল সময়ে, সকলের চক্ষে প্রতীয়মান নহে, সেই

রূপের প্রকট ছবি। যে অধ্যাত্ম-রাজ্যে মানুষের সমস্ত চিন্তা, প্রবৃত্তি, চেষ্টা ও কর্ম্মের ফলাফল প্রকৃতির অলঙ্ঘ্য নিয়মে সতত ফলিতেছে, সেই রাজ্যের বৃহৎ দৃশ্যপট পৌরাণিক ইতিবৃত্ত। এই ফলাফলের যে সংস্কার-সকল হৃদয়ের অধ্যাত্মদেশে গোপনে অঙ্কিত হয়, সেই চিত্রই গুপ্তচিত্র এবং চিত্রগুপ্ত তাহার দেবতা—সংযমপতি ধর্ম্মরাজ যমের লেখক—The Recording Angel। কিসের লেখক? সেই কর্ম্মফলের সংস্কার-সমুদায়ের লেখক। সেই চিত্রগুপ্তের বৃহৎ পটের বর্ণরাগ-সমস্ত দেখিতে চাও ত পুরাণের প্রতি চাহিয়া দেখ। দেখিতে পাইবে, মানুষের এমত কার্য্য নাই, এমত চিন্তা নাই, এমত প্রবৃত্তি নাই, এমত চেষ্টা নাই, যাহার ফলাফল হয় না। ভরত হরিণকে ভালবাসিয়া তাহার এতদূর তীব্র চিন্তা করিয়াছিলেন যে, জন্মান্তরে তিনি মৃগরূপ ধারণ করিয়াছিলেন। পুরাণে কর্ম্মফল-বাদের ফলশ্রুতি এইরূপ। পৌরাণিক আর্য্যসাহিত্যে তবে অধ্যাত্ম-রাজ্যের বৃহৎ পট বিস্তারিত। সেই পটে কি দেখা যায়? দেখা যায়, এ জগতের বাহ্য দৃশ্যের মধ্যে আর এক সূক্ষ্ম অধ্যাত্ম-জগৎ বিদ্যমান—যে জগতে কেবল সর্ব্বনিয়ন্তৃস্বরূপ কর্ম্মফল-দাতা ভগবান্ একাই রাজা—মহারাজ রাজরাজেশ্বর—সর্ব্ব-অধীশ্বর। তাই ভগবতীর নাম রাজরাজেশ্বরী। আমরা নরলোকে কেবল নরেরই কর্ত্তৃত্ব দেখিতে পাই, কিন্তু ভগবানের সেই সূক্ষ্ম কর্ত্তৃত্ব তত দেখিতে পাই না। তিনি যে এই বৃহৎ দৃশ্যের অন্তরালে বসিয়া এই বিশ্বলীলা করিতেছেন; এই পুতুলের নৃত্য দেখাইতেছেন, তাঁহার সেই গোপনীয় হস্ত কয়জন লোক দেখিতে পায়? তাঁহার অস্ফুরিত বাক্য সময়ে সময়ে শাপবাক্যে উচ্চারিত হয়।

আর্য্যসাহিত্যের সহিত বিলাতী সাহিত্যের প্রভেদ।

আর্য্যসাহিত্যের সহিত অপর দেশীয় সাহিত্যের প্রভেদ এই যে, অপর দেশীয় সাহিত্যে কেবল বাহ্য জগতের নরলোকের ক্রিয়া-কাণ্ডের বাহ্য দৃশ্য, আর্য্যসাহিত্যে সেই দৃশ্য-মাঝে সেই নটবর ভগবানের গুপ্ত লীলা। অপর দেশীয় সাহিত্য নরলোকের কর্ত্তৃত্ব দেখায়, আর্য্যসাহিত্য সেই অহঙ্কারপূর্ণ কর্ত্তৃত্বের ভিতর ভগবানের নিরহঙ্কার কর্ত্তৃত্ব দেখায়। যাহা লোকে দেখিতে পায় না, আর্য্য-সাহিত্য তাহা সুস্পষ্ট দেখাইয়া দেয়। যাহা সকলেই দেখিতে পাইতেছে, তাহা দেখাইলে কি হইবে? তাহা দেখাইবার ফলাফল ত জগতে আপনা-আপনি ঘটিতেছে। যাহা লোকে দেখিতে পায় না, অথচ যাহার ফলাফল প্রভূত, তাহারই দৃশ্যপট আঁকা আর্য্য-কবির কার্য্য। সেই মহাকবি ব্যাস, বাল্মীকি ও তাঁহাদের পদানু-সরণ করিয়া যাঁহারা আর্য্যকাব্য লিখিয়াছেন, সেই কালিদাস, ভবভূতি, ভারবি, মাঘ প্রভৃতি। তাঁহারা যে কাব্যাদি লিখিয়া গিয়াছেন, সে কাব্যে নরনারায়ণ একত্র সংলিপ্ত,—এই জগতের সংসারলীলায় একত্র কার্য্য করিতেছেন। ভগবান্ নরের দেহ-রথের সারথি। তিনি সারথি বলিয়া নররথী। তিনি বীরের সম্মুখে বুক পাতিয়া দিয়াছেন বলিয়া অর্জ্জুন বীর। তিনি অর্জ্জুনকে দিয়া—নরের হস্ত দিয়া কুরুক্ষেত্র রণে সমগ্র পাপীর ও অসুরের নিধন সাধন করিতেছেন। তিনি নীজে নিরস্ত্র, কিন্তু তাঁহার মহাস্ত্র ও ব্রহ্মাস্ত্র-সকল নরের হাতে। অভিশাপ সেই অস্ত্রের ক্ষীণ রব। যাবতীয় ঘটনা-সমূহের সহিত ভগবান্ ধর্ম্মের সূক্ষ্ম সূত্র দিয়া জগতের সমস্ত ঘটনাকে একসূত্রে বাঁধিতেছেন। শুদ্ধ ইহকাল নহে,

শুদ্ধ পরকাল নহে, পূর্ব্বজন্মের সহিত মানবের জীবনকে একসূত্রে বাঁধিতেছেন। তাই ভাগবত দেখায়, ভরতের পুণ্যপ্রকৃতি কত উচ্চে উঠিয়াও কোন্ কর্ম্মদোষে কিপ্রকার মৃগরূপে পরিণত হইয়াছিল। এই ঘটনাপূর্ণ বিশ্বের সমুদায়ই মহাভারত ও শ্রীমদ্ভাগবত— ভগবানের বিশ্বলীলার মহাকাব্য। এই পরিদৃশ্যমান ভারতের মধ্যে কুরুক্ষেত্ররূপ মানব-সমাজের কর্ম্মক্ষেত্রের যে মহাযুদ্ধ ও সেই যুদ্ধের ফলাফল তাহাই মহাভারত। লৌকিক ঘটনাসমূহ যে কার্য্যকারণের অভিনয়, তদ-ভ্যন্তরে ভগবানের এই সূক্ষ্ম ও অদৃশ্য কর্তৃত্ব। নটবরনারায়ণ প্রধান কর্ত্তা, নর অর্জ্জুনরূপে নিমিত্ত-কারণ মাত্র। মহাভারত ভগবদ্গীতায় এই সূক্ষ্ম তত্ত্ব প্রকাশ করিয়া স্থূল অবয়বে তাহা জাজ্বল্যমান করিয়া দিয়াছেন। এই তত্ত্বই সমস্ত জাগতিক ঘটনার গূঢ় রহস্য। আর্য্য-সাহিত্য সেই গূঢ় রহস্য প্রকাশ করে। এই তত্ত্ব লইয়াই তবে অপরাপর দেশীয় সাহিত্যের সহিত আর্য্যসাহিত্যের প্রভিন্নতা। অপর দেশীয় সাহিত্যে লৌকিক ঘটনাময় বাহ্য দৃশ্য; পৌরাণিক কাব্য ও সাহিত্যে ধর্ম্মের সূক্ষ্ম রাজ্যের নিগূঢ় কথা। একটী দৃষ্টান্ত দেখ।

বিলাতী সাহিত্যে অভিশাপ নাই কেন?

শেক্সপিয়ারের ওথেল নাটক পড়িয়া আমরা কেবল মনুষ্যে সামান্য ঘটনা-যোজনার ইতিবৃত্ত দেখিতে পাই। দেখিতে পাই, ডেস্‌ডিমোনা পিতার সম্পূর্ণ বিরুদ্ধে এক বিজাতীয় মুরের সহিত প্রণয়াসক্তা হইয়া-ছিলেন। সর্ব্বদেশেই এরূপ ঘটনা পিতামাতার অনুমোদনীয় নহে— পিতামাতা কি, কোন সমাজে কাহারই অনুমোদনীয় হইতে পারে না। বলিতে গেলে, ডেস্‌ডিমোনা মুরের সহিত প্রেমাসক্ত হইয়া সমাজের

বাহির হইয়া গিয়াছিলেন। অপ্সরা-তুল্য ডেস্‌ডিমোনা যে একজন কালা মুরকে ভালবাসিবে, এ কথা অবিশ্বাস্য। কিন্তু যখন ইহা প্রকৃত প্রস্তাবে ঘটিয়া উঠিয়াছিল, তখন পিতার মনে দৃঢ় বিশ্বাস হইল, মুর কোন যাদুবিদ্যা-প্রভাবেই তাঁহার দুহিতাকে ভুলাইয়াছে। অতএব যাদু-কারী মুরের বিপক্ষে যাদুর অপরাধে আদালতে নালিশ রুজু হইল। কারণ, সেকালে যাদুকরের প্রভূত শাস্তি হইত। সেই মকর্দ্দমায় দেখিতে পাই, কন্যা প্রমাণ করিয়া দিল, স্বামীর সে অপরাধ সম্পূর্ণ মিথ্যা; সে নিজেই মুরের বীরত্বে বশীভূত হইয়া তাহাকে বিবাহ করিয়াছিল। কাজেই মুরের প্রণয়ে অন্ধ হইয়া কন্যা প্রকাশ্য আদা-লতে পিতার যথোচিত অপমান করিয়া তাহাকে প্রত্যাখ্যান করিল। শেক্সপিয়ার দেখাইলেন, পিতা নীরবে ঘাড় পাতিয়া সেই অপমান বহন করিয়া আদালত হইতে কালামুখ লইয়া পলাইতে পথ পাইলেন না। এ সময় অবশ্য পিতার মনে যে দারুণ ব্যথার উদয় হইয়াছিল, তিনি রাগে, অপমানে, লজ্জায় যেরূপ অভিভূত হইয়া আদালত হইতে আসিয়াছিলেন, তাহা অনায়াসে অনুমান করিতে পারা যায়। তৎপরে আমরা দেখিতে পাই, ডেস্‌ডিমোনার সহিত ওথেলর মিলন সম্পূর্ণ বিষময় হইয়া উঠিল; এতদূর যে, শেষে সেই মুর নিজ পতিপ্রাণা প্রণয়িনীকে স্বহস্তে অনায়াসে হত্যা করিয়াছিল। এই ঘটনাপূর্ণ দৃশ্য বাহ্য লৌকিক ইতিবৃত্ত মাত্র। কিন্তু ইহার তলদেশে যে এক সূক্ষ্ম ইতিবৃত্ত প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে, তাহা শেক্সপিয়ারে নাই। সে বিষয় ধর্ম্মের সূক্ষ্ম তত্ত্ব। সে তত্ত্ব শেক্সপিয়ার দেখাইতে পারেন নাই। সে তত্ত্ব কি আর্য্য কবি ভিন্ন আর কেহ বুঝিতে বা দেখাইতে পারেন?

অভিশাপের প্রত্যক্ষ ফল।

এই নাটক যদি আর্য্যকবির হাতে পড়িত, তাহা হইলে তাহার ভাগ্য ফিরিয়া যাইত। পিতাকে সেইরূপ প্রত্যাখ্যান ও অপমান করাতে, পিতার মনে যে অরুন্তুদ বেদনা উপস্থিত হইয়াছিল, সেই বেদনা হেতু তিনি রাগে কন্যাকে অবশ্যই সেই দণ্ডে মনে মনে অভিসম্পাত করিয়াছিলেন। এই অভিসম্পাত কি মানুষের স্বভাবসিদ্ধ নহে? সেই প্রকৃতি-সিদ্ধ ব্যাপার শেক্সপিয়ার কই প্রদর্শন করিয়াছেন? এ চিত্র আঁকিতে ধর্ম্মের সূক্ষ্ম দৃষ্টি চাই, মানুষের অধ্যাত্ম-প্রকৃতি বুঝা চাই। এ প্রকৃতি-চিত্রের চিত্রকর বিলাতী কবি নহেন, পৌরাণিক আর্য্যকবি। আর্য্যকবি হইলে এ স্থলে দেখাইতেন যে, পিতা কন্যাকে তখনই শাপ দিয়া বলিতেছেন, তুই অধঃপাতে যা, অমন মেয়ে যেন তেরাত্রের মধ্যে ঐ মুরের হাতে নিহত হয়। আর্য্যকবি যাহা দেখাইতেন, শেক্সপিয়ারের নাটকে তাহাই ঘটিয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু শেক্সপিয়ার তাহার নিগূঢ় রহস্য দিতে পারেন নাই— কোন্ কার্য্যের কোন্ ফল দেখাইতে পারেন নাই। আর্য্যকবি সেই অভিশাপের নিদারুণ বাক্যাবলি প্রকাশ করিয়া তাহার ভীষণ পরিণাম ও প্রতিফল দেখাইতেন। দেখাইতেন সেই সমাজ-ধর্ম্মবিরুদ্ধ বিবাহের পরিণাম বিষময় হইবেই হইবে। পিত্রাদেশ অবহেলা করিলে যে পাতক হয়, সেই পাতকের বিষময় ফল অবশ্যম্ভাবী। বিশ্বামিত্রের পুত্রগণের অধোগতি যে পিতৃ-অভিশাপের ফল, সেই পিতৃ-অভিশাপেই ডেস্‌ডিমোনার নৃশংস হত্যা ঘটিয়াছিল। পিতৃ-শাপ ফলিয়া গেল, ধর্ম্মের জয় হইল। ধর্ম্মের জয় আর্য্যকবি দেখান।

ধর্ম্মের জয় মহাভারত ও রামায়ণে ; কালিদাসের শকুন্তলায়। সে ফল দেখাইলে ওথেল নাটকের ভাগ্য ফিরিয়া যাইত। শেক্সপিয়ার সে নাটক যে ভাবে লিখিয়াছেন, তাহাতে সকল দোষ সেই মুরের স্কন্ধে চাপাইয়াছেন। সে নাটক পড়িলে এখন লোকে সেই মুরকেই ঘৃণা করে। তদ্রূপ ঘৃণাস্পদ করাইবার জন্যই শেক্সপিয়ার সে নাটক লিখিয়াছিলেন। কিন্তু যদি তন্মধ্যে পিতৃ-অভিশাপ স্থান পাইত, তাহা হইলে লোকে কাহাকে দূষিত? লোকে কি জ্ঞান করিত না, মুর কেবল ধর্ম্মের নিমিত্ত-কারণ মাত্র? কর্ম্মফলদাতা ভগবানের হইয়া সে হত্যা করিয়াছে। যেমন কর্ম্ম, তেমনি ফল ফলিয়াছে। আর্য্য কবি যদি ওথেল নাটক-মধ্যে ঐ অভিসম্পাতটুকু দিয়া নাটক লিখিতেন, তাহা হইলে এক্ষণে যেরূপ অধ্যয়ন-ফল হইতেছে, ঠিক্ তাহার বিপরীত ফল ঘটিত। তাহা হইলে ঐ ওথেল নাটক কি অভিশাপ-মূলক শকুন্তলা প্রভৃতি নাটকের ন্যায় একখানি ধর্ম্ম-নাটকরূপে প্রতীত হইত না? সুতরাং যে সকল বিলাতী নাটক অভিশাপমূলক হওয়া উচিত ছিল, তাহাতে অভিশাপের গন্ধমাত্র নাই। না থাকাতে তাহাদের অধ্যয়ন-ফলের ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে। ফলশ্রুতি বিপরীত হইয়াছে। তাই বলিয়াছি, যদ্দ্বারা ধর্ম্ম উজ্জ্বলবর্ণে অঙ্কিত হইতে পারে, বিলাতী কবি তাহা দেখাইতে পারেন না। তাহা আর্য্য-কবির কার্য্য এবং আর্য্যসাহিত্যের প্রধান সম্পত্তি। সেই সাহিত্যে সূক্ষ্ম ধর্ম্মরাজ্যের অকাট্য নিয়মের অলঙ্ঘ্য শাসন এবং ঘটনার সহিত ঘটনার নিগূঢ় রহস্য ধর্ম্মের সূক্ষ্ম সূত্রে পরিদৃশ্যমান। তদ্ভিন্ন অপর দেশীয় সাহিত্যে মানবীয় ঘটনাবলি ও মানুষ-ব্যাপার সূক্ষ্ম ধর্ম্মরাজ্যের আবরণ মাত্র।

শকুন্তলার অভিশাপ।

আর্য্য-কাব্যসাহিত্যের অধিকাংশই পৌরাণিক-সাহিত্যাবলম্বনে বিরচিত। তাহা সেই সাহিত্যেরই বিস্তৃত পট। শুধু পট নহে; কাব্য যেরূপ রসের খেলা, সেই রসের খেলা খেলিয়া লোকের হৃদয় অধিকার করে। রসের দ্বারা মন ভিজাইয়া ফেলে। শুধু মুখের কথায় কবি উপদেশ দেন না, লোকচরিত্রে রসের অবতারণা করিয়া তিনি লোকশিক্ষা দেন। তিনি পৌরাণিক ইতিহাসকে নিজ কাব্যরসে আপ্লুত করিয়া অধ্যাত্ম-জগতের নিগূঢ় তত্ত্ব-সকল দ্বিগুণ বলে লোকের হৃদয়ে বদ্ধমূল করিয়া দেন। সেই-রূপ কবি—কালিদাস, ভবভূতি, মাঘ, ভারবি প্রভৃতি। আজ আমরা কালিদাসের একখানি দৃশ্যকাব্যদ্বারা এ কথা বুঝাইতে চাই। তাঁহার যে কাব্য সর্ব্বজন-সমাদৃত, সেই "অভিজ্ঞান-শকুন্তল"ই আমরা গ্রহণ করিলাম। শকুন্তলার অভিশাপ আমাদের সমালোচ্য।

হিন্দু জনসমাজ ত্রিবিধ শাসনাধীন, (১) জাতিভেদের দুর্দ্দান্ত শাসন, (২) রাজশাসন, (৩) ধর্ম্ম-শাসন। কি জাতিভেদের শাসন, কি রাজশাসন, কোন শাসন-দণ্ডে মনুষ্যসমাজের সমুদায় অপ-রাধ দণ্ডনীয় হয় না। হইতেও পারে না। তদপেক্ষা সূক্ষ্মতর শাসন ধর্ম্মের। ধর্ম্মাধর্ম্মের অলঙ্ঘ্য নিয়মে সর্ব্ববিধ অপরাধ ও পাপ শাসিত হয়। এ শাসন-দণ্ডের শিথিলতা হইতে পারে না; কারণ, এ শাসন-দণ্ড ভগবানের অলঙ্ঘ্য নিয়মাধীন। ভগবান্

অন্তর্যামী, তিনি অন্তর্যামী হইয়া সর্ব্ববিধ পাপেরই দণ্ড দিয়া থাকেন। কারণ, মনুষ্যের সর্ব্ববিধ পাপেরই ভোগাভোগ-বশতঃ অন্তঃপ্রকৃতি হয় ক্রমশঃ নীচগামিনী, না হয়, উর্দ্ধগামিনী হইতেছে। নীচগামিনী হইবার সময় কষ্টভোগ এবং উর্দ্ধগামিনী হইবার সময় আনন্দভোগ। অপর দুই শাসন মানব-প্রতিষ্ঠিত; এজন্য তত প্রবল নিয়মাধীন নহে। কিন্তু ধর্ম্মাধর্ম্মের অলঙ্ঘ্য নিয়মে সর্ব্ববিধ অপরাধই শাসিত হয়। এমন কি, ঘুণাক্ষরে ধর্ম্মের লঙ্ঘন দেখিলে স্বভাবতই মানুষের ক্রোধ উদ্রিক্ত হয়। অন্যায় দেখিলে কাহার না ক্রোধ জন্মে? এই ক্রোধ কিসের ব্যঞ্জক? ধর্ম্মের প্রতি সাতিশয় অনুরাগ-বশতঃ অধর্ম্মের প্রতি মানুষের স্বাভাবিক বিদ্বেষ। এই বিদ্বেষ ক্রোধরূপে দেখা দেয়। সৎক্রোধ ধর্ম্মানুরাগের ফল; পাছে ধর্ম্ম লঙ্ঘিত হয়, তাই সেই আত্যন্তিক ধর্ম্মানুরাগবশতঃ ক্রোধ কোনরূপ অন্যায়াচার সহ্য করিতে পারে না। অন্যায়ের শাসন জন্য যে ক্রোধের উদয় হয়, তাহাই সৎক্রোধ। সেই সৎক্রোধ অধর্ম্মাচার ও অন্যায় কার্য্যের শাসনার্থ দণ্ড দিতে উদ্যত হয়। দুর্ব্বাসা ঋষির ক্রোধ এইরূপ ছিল। তাঁহার ধর্ম্মানুরাগ এতদূর প্রবল ছিল যে, তিনি ঘুণাক্ষরে অধর্ম্মাচার দেখিতে পারিতেন না। পুরাণে আমরা যে অনেক ঋষিচরিত পাঠ করি, সকলেই কি এক রকমে ঋষিত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন? সকল ঋষি এক রকমে সিদ্ধি লাভ করেন নাই। কেহ অত্যন্ত ভক্তি-প্রভাবে, কেহ বা জ্ঞানপ্রভাবে, কেহ বা শুধু ধর্ম্মানুরাগে ঋষিত্ব লাভ করিয়াছিলেন। নারদের ভক্তি, বাল্মীকির হৃদয়তারল্য, ব্যাসের জ্ঞান, এবং দুর্ব্বাসার ধর্ম্মানুরাগ প্রসিদ্ধ। দুর্ব্বাসার ধর্ম্মানুরাগ এত প্রবল ছিল যে, দুর্ব্বাসা সেই ধর্ম্মানুরাগ-

বলেই সিদ্ধ হইয়াছিলেন। হিন্দুধর্ম্মমতে, ঋষিদিগের মধ্যে এক এক জনের এইপ্রকার বিশেষ বিশেষ গুণ ও স্বভাব তাঁহাদিগের পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত প্রালব্ধ হেতু। সেই প্রালব্ধ হেতু এ জন্মে যাঁহার যেপ্রকার প্রারব্ধ হইয়াছিল, তদনুসারেই এক এক জনের জীবন বিশেষ বিশেষ স্বভাবে পরিণত হইয়াছিল। বহু জন্মের পুণ্য-সঞ্চয় না হইলে কেহ একেবারে ঋষিত্বে উঠিতে পারে না। সেই জন্যই দুর্ব্বাসার ধর্ম্মানুরাগ অত্যন্ত তরুণ বয়স হইতে প্রবলরূপে দেখা দিয়াছিল। তজ্জন্য তিনি একদা স্বীয় বাক্‌দুষ্টা পত্নীকেও অভিশাপে ভস্মীভূত করিয়াছিলেন। সেই পত্নী তাঁহার শাপে অনুদিন ভস্মীভূতা হইয়া প্রাণান্ত হইয়াছিলেন। সেই শাপ তাঁহার প্রবল ধর্ম্মানুরাগের ফল। বাস্তবিক, দুর্ব্বাসা সমুদায় ধর্ম্মানুরাগ-ময়—ধর্ম্মের তৃণমাত্র লঙ্ঘন তাঁহার অসহ্য ছিল। তাই, পৌরাণিক কবি যেখানে ধর্ম্মাচারের কিছুমাত্র লঙ্ঘন দেখিয়াছেন, সেই-খানেই দুর্ব্বাসার সৎক্রোধে পূর্ণ হইয়া ঋষির আবির্ভাব দেখাইয়া-ছেন। দুর্ব্বাসা অনেক কাল গত হইয়াছেন বটে, কিন্তু তাঁহার ঋষিত্ব বিনষ্ট হয় নাই, হইবার নহে। সেই ঋষিত্বপ্রভাবে দুর্ব্বাসা পৃথিবীতে অমর হইয়া আছেন। আর্য্যকবি যেখানে দুর্ব্বাসাকে আপন কাব্যমধ্যে আনিয়াছেন, বুঝিতে হইবে, দুর্ব্বাসা সশরীরে জীবিত থাকিলে, সেখানে যে ব্যবহার করিতেন, কবি অধর্ম্মের প্রতি সেইরূপ সৎক্রোধ দেখাইয়াছেন। কাব্যমধ্যে যেখানে দুর্ব্বাসা যে শাপ দিলেন, সেখানে সে শাপ দুর্ব্বাসার নহে, সে শাপ সেই কবির নিজের; কবি দুর্ব্বাসার ভাবে পূর্ণ হইয়া ধর্ম্মলঙ্ঘনকে অভিসম্পাত করিলেন। সে অভিসম্পাতের অর্থ কি? যাহা ধর্ম্মতঃ নিন্দনীয়, যাহাতে দেবকোপ সঞ্জাত হয়, তাহাই অভিশাপ-যোগ্য।

যাহা রাজনীতি বা জাতিভেদের সামাজিক শাসনে শাসনীয় নহে, অথচ ধর্ম্মবিচারে প্রতিবিদ্ধ, অভিশাপদ্বারা কবি তাহারই নিন্দা ও প্রতিষেধ করেন। ইংরাজীতে যাহার নাম Moral condemnation, কবির শাপবাক্য সেই Moral condemnation। এই দেখুন, পদ্মপুরাণের কবি শকুন্তলাকে উপলক্ষ করিয়া দুর্ব্বাসার মুখ দিয়া কিরূপ অভিসম্পাত করিতেছেন :—

"দূরাদুচ্চৈর্বভাষেহথ কেয়ং পর্ণোটজে স্থিতা।
বিলোকয়তু মাং প্রাপ্তমতিথিং ভোজনার্থিনম্॥
ইত্যুচ্চৈর্মুহুরাভাষ্য ন প্রাপ্যাতিথিসৎক্রিয়াম্॥
তপোধনশ্চুকোপাশু শশাপ ক্রোধনো মুনিঃ॥
যং ত্বং চিন্তয়সে বালে মনসাহনন্যবৃত্তিনা।
বিস্মরিষ্যতি স ত্বাং বৈ অতিথৌ মৌনশালিনীম্॥"

পদ্মপুরাণ, স্বর্গখণ্ড, দ্বিতীয় অধ্যায়।

"দুর্ব্বাসা দূর হইতে উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন—কে এই পর্ণোটজে আছে; চাহিয়া দেখ; ভোজনার্থী অতিথি উপস্থিত। বারংবার উচ্চৈঃস্বরে এইপ্রকার আভাষণপূর্ব্বক অতিথিসৎকার না পাইয়া তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া এই বলিয়া শাপ দিলেন :—

"হে বালে! তুমি যেমন অতিথির কথার উত্তর দিলে না, তেমনি একাগ্রচিত্তে যাঁহার ধ্যান করিতেছ, সে তোমায় ভুলিয়া থাকিবে।"

ভুলিয়া থাকিবারই কথা। এ শাপ না দিলেও দুষ্মন্ত শকুন্তলাকে ভুলিয়া থাকিতেন। আমরা প্রকৃত প্রস্তাবে ইউরোপীয় সমাজে এইরূপ ভুলিয়া থাকার বহু বহু দৃষ্টান্ত দেখিতে পাই। যে স্থলে বিবাহ কেবল কামজ, কেবল চক্ষের নেশা হেতু সম্পন্ন হয়, সে স্থলে সেই নেশা কাটিয়া গেলেই, ইন্দ্রিয় চরিতার্থ হইলেই, লোকে পরিণীতাকে একেবারে ভুলিয়া থাকে। এই সত্য

উক্তি শাপবাক্যে প্রকটিত হইয়াছে। গল্পের মধ্যে কবি আপনি কিছু বলিতে পারেন না বলিয়া দুর্ব্বাসা ঋষিকে আনাইয়া সেই মহার্ঘ সামাজিক তত্ত্ব প্রকাশ করিয়াছিলেন। যে ইউরোপীয় সমাজে এইপ্রকার কামজ নেশাজনিত গান্ধর্ব্ব-বিবাহের মত বিবাহ প্রচলিত, সেখানে প্রায়ই পরিদৃষ্ট হয়, বিবাহের কিছু দিন পরেই পতিপত্নীর ছাড়াছাড়ি হইয়া গেল। পতি, পত্নীকে ভুলিলেন। কোন কোন স্থলে এই বিবাহবশতঃ ব্যভিচারের সূত্রপাত হওয়াতে একেবারে বিবাহ-বন্ধনের ছেদন (Divorce) সংঘটিত হইয়া গেল। এইরূপ সংঘটনে এক পক্ষে, না হয় অন্য পক্ষে, মনে মনে শাপ দেওয়া-দিয়ি ঘটিয়া থাকে। তাহাই কবি দুর্ব্বাসার মুখ দিয়া প্রকাশ করিলেন। পদ্মপুরাণের কবি ধর্ম্মাচরণ-লঙ্ঘনের প্রতি অভিসম্পাত দেখাইলেন, নাট্যসাহিত্যেরও কবি দুর্ব্বাসার মুখে এইরূপ শাপবাক্য আরোপ করিয়াছেন :—

"আঃ কথমতিথিং মাম্ অভিভবসি।
বিচিন্তয়ন্তী যমনন্যমানসা তপোনিধিং বেৎসি ন মামুপস্থিতম্।
স্মরিষ্যতি ত্বাং ন স বোধিতোঽপি সন্ কথাং প্রমত্তঃ প্রথমং কৃতামিব॥"

"আঃ কি আস্পর্দ্ধা! আমি অতিথি বলিয়া উপস্থিত হইলাম, আমাকে অবজ্ঞা করিয়া অবমাননা করিলি? তুই যে পুরুষকে অনন্যমনে চিন্তা করিতে করিতে অতিথিরূপে উপস্থিত এই তপোধনের অভ্যর্থনা করিলি না, তজ্জন্য মদ্যাদিপানে মত্ত ব্যক্তি প্রথমে যে বাক্য প্রয়োগ করে, পুনরায় তাহাকে সেই বাক্য বলিতে বলিলে সে যেমন কোনক্রমেই তাহা স্মরণ করিয়া আর বলিতে পারে না, তেমনি তোর সেই প্রিয় ব্যক্তিকে যথেচ্ছরূপে স্মরণ করিয়া দিলেও সে ব্যক্তি কোন মতেই তোকে স্মরণ করিবে না।"

কাম-রিপুর ঘোর প্রমত্ততা হেতু যে গান্ধর্ব্ব-বিবাহ সম্পন্ন হয়,

যে প্রমত্ততাই সেই বিবাহকে পাপবিবাহরূপে নিন্দনীয় ও হেয় করিয়াছে, যে কামান্ধতা ও প্রমত্ততার পাপমোহে অভিভূতা থাকিয়া শকুন্তলা অতিথিসৎকারের ধর্ম্মকর্ম্মে মনঃসংযোগ করিতে পারেন নাই, সেই প্রমত্ততা ও মাদকতাই যে শাপের হেতু, পদ্মপুরাণ তাহা তত স্পষ্টরূপে খুলিয়া বলেন নাই *। নাটককার তাহা অঙ্গুলি-নির্দ্দেশপূর্ব্বক বিশদরূপে ব্যক্ত করিলেন। এইরূপ মোহজনিত বিবাহই কামজ বিবাহ। গান্ধর্ব্ব-বিবাহ সেইরূপ কামজ বিবাহ। এ ত বিবাহ নহে, ঘোর রিপুর চরিতার্থতা-সাধন। এজন্য অনেক বিলাতী বিবাহের মিলন মধুর Honey-moon পর্য্যন্তই স্থায়ী হইতে দেখা যায়। তৎপরেই বিচ্ছেদ। তাই মনু গান্ধর্ব্ব-বিবাহকে এইরূপ কামলক্ষণাক্রান্ত রূপে বর্ণন করিয়াছেন :—

> "ইচ্ছয়ান্যোন্যসংযোগঃ কন্যায়াশ্চ বরস্য চ ।
> গান্ধর্ব্বঃ স তু বিজ্ঞেয়ো মৈথুন্যঃ কামসম্ভবঃ ॥"
>
> মনু। তৃতীয় অধ্যায়। ৩২।

"কন্যা এবং বর উভয়ের পরস্পর অনুরাগবশতঃ যে মিলন হয়, তাহাকে গান্ধর্ব্ব-বিবাহ বলে। ইহা কামমূলক ও মৈথুনেচ্ছায় সংঘটিত হয়।"

তাই মেধাতিথি বলিয়াছেন :—

> "তস্যেয়ং নিন্দা, মৈথুন্যঃ কামসম্ভবঃ। মিথুনপ্রয়োজনো মৈথুন্যঃ।"

---

* এ প্রস্তাব প্রধানতঃ নাটকীয় গান্ধর্ব্ব-বিবাহ-অবলম্বনেই রচিত হইয়াছে। নাটকীয় বিবাহ, বর কন্যা উভয়েরই কামজ মিলন। পুরাণে শুদ্ধ বরপক্ষে কামজ, অভিশাপও তাহাই দেখায়; কন্যাপক্ষে কামজ কি না, তাহা স্পষ্ট প্রকাশিত নাই।

নিন্দনীয় কামসম্ভূত মৈথুনেচ্ছাই গান্ধর্ব্ব বিবাহের হেতু। সুতরাং সে বিবাহ কথন চিরজীবনের বন্ধনস্বরূপ হইতে পারে না। মৈথুনেচ্ছা চরিতার্থ হইলেই এই বিবাহ-বন্ধনের শৈথিল্য হইবেই হইবে এবং যে স্থলে সামাজিক নিয়মে পতিপত্নীর একতর ত্যাগের ব্যবস্থা আছে, সে স্থলে সেই বিবাহ-বন্ধনের একেবারে ভঙ্গ হইবারই অধিক সম্ভাবনা। বিলাতী বিবাহে প্রকৃতপক্ষে অনেক স্থলেই তাহাই ঘটিতে দেখা যায়। এই নিন্দনীয় মৈথুনেচ্ছা-জনিত প্রমত্ততা লোককে ধর্ম্মের প্রতি অন্ধ করে। এই কামান্ধতাই রোমিও জুলিয়েটের মিলনের কারণ। এই কামান্ধতায় প্রমত্ত হইয়া হার্মিয়া পিত্রাদেশ লঙ্ঘনপূর্ব্বক লাইসেণ্ডারকে বিবাহ করিতে চাহিয়াছিলেন। তাই বলিয়াছি, এরূপ বিবাহ-জনিত মিলন দুদিনের জন্য চক্ষের নেশা মাত্র। এতদ্দ্বারা কি চিরদিনের সহচর ও সহচরীকে নির্ব্বাচন করা যায়? কালিদাস বুঝাইয়া দিলেন, অভিশাপের বিষয় সেই কামজ মোহ ও প্রমত্ততা, যদ্দ্বারা লোকে ধর্ম্মপথ হইতে বিচ্যুত হয়। কিন্তু হিন্দু-বিবাহ যে ধর্ম্মপথ; সে পথ মোহ-সম্ভূত হওয়া বিধেয় নহে। তবে কেন হিন্দুবিবাহ-প্রণালীর অন্তর্গত গান্ধর্ব্ব ধর্ত্তব্য হইয়াছে? তাহার কারণ এই, লোকসমাজে বিবাহ যতরূপে ঘটিতে পারে, সেই অষ্টবিধ বিবাহই হিন্দুবিবাহরূপে বিধিবদ্ধ হইয়াছে। বিবাহ যদি চিরজীবনের বন্ধন-স্বরূপ হয়, তবে তাহাতে তত সামাজিক অমঙ্গল ঘটিতে পারে না। যেরূপে দম্পতিদ্বয় মিলিত হউক না কেন, তাহারা যদি চিরজীবনের জন্য সেই বন্ধনে আবদ্ধ থাকিয়া সংসার-ধর্ম্ম সুনির্ব্বাহ করে, তবে তাহা তত সামাজিক অনিষ্টের কারণ হইতে পারে না। তথাপি গান্ধর্ব্ববিবাহ কামজ বলিয়া নিন্দনীয় হইয়াছে এবং কেবল ক্ষত্রিয়-রাজকুলের জন্য

বিহিত হইয়াছে। হিন্দুরাজকুলেও ইহা হেয় বলিয়া গণনীয় এবং ক্বচিৎ ঘটিতে দেখা যায়। ইহার হেয়ত্ব কোথায়, কেন এ বিবাহ নিন্দনীয়, তাহাই কালিদাস স্পষ্ট করিয়া বুঝাইয়া দিয়াছেন। যাহা চিরদিনই হেয়, কালিদাসের সময়েও তাহা অবশ্য হেয়রূপে গণনীয় ছিল। সেই জন্য কালিদাসেরও তাহা অনুমোদনীয় নহে। তাই কালিদাস শুধু যে শকুন্তলা নাটকে এ বিষয় বুঝাইয়া দিয়াছেন, এমন নহে; তিনি যে কয়েক খানি প্রধান পৌরাণিক কাব্য লিখিয়াছেন, সে সমুদায় কাব্যে একই বিষয়ের অভিশাপ। কামজ প্রমত্ততা হেতু ইন্দ্রিয়লালসাপূর্ণ কামান্ধতার প্রতি যে দেবকোপ শকুন্তলায় দুর্ব্বাসার বাক্যে প্রকাশিত, সেই দেবকোপ উর্ব্বশীর প্রতি এবং নলদময়ন্তীর প্রতি ঘটিয়াছিল। আর যদি সেই দেবকোপের জ্বলন্ত অগ্নি দেখিতে চাও, দুর্ব্বাসা-বাক্য অপেক্ষাও মহাজ্বলন্ত শিখায় উদ্দীপ্ত ও উদ্গীর্ণ হইতে দেখিতে চাও, তবে একবার চাও—ধূর্জ্জটির ললাটদেশে। সেই দেবকোপের জ্বলন্ত অগ্নি উদ্গীর্ণ হইয়া সাক্ষাৎ কামকে ভস্মীভূত করিতেছে। এইখানে কালিদাস পৌরাণিক কবিকে অবলম্বনপূর্ব্বক স্পষ্টাক্ষরে দেখাইয়া দিতেছেন, মানবের কোন্ রিপু ভস্মীভূত হইবার সুযোগ্য সামগ্রী। মহাযোগী ত্রিলোচনকে বাহ্যসৌন্দর্য্যে মোহিত করিবার জন্য মদন ও বসন্তের সহায়তায় উমা যখন তৎসমক্ষে উদয় হইলেন, তখন সেই মহাযোগী কি করিলেন?—

"অথেন্দ্রিয়ক্ষোভমযুগ্মনেত্রঃ পুনর্বশিত্বাদ্‌বলবন্নিগৃহ্য।
হেতুং স্বচেতোবিকৃতের্দিদৃক্ষুর্দিশামুপান্তেষু সসর্জ দৃষ্টিম্॥
স দক্ষিণাপাঙ্গনিবিষ্টমুষ্টিং নতাংসমাকুঞ্চিতসব্যপাদম্।
দদর্শ চক্রীকৃতচারুচাপং প্রহর্ত্তুমভ্যুদ্যতমাত্মযোনিম্॥

তপঃপরমার্শবিবৃদ্ধমন্যোর্ভঙ্গদুষ্প্রেক্ষ্যমুখস্য তস্য।
স্ফুরন্নুদর্চ্চিঃ সহসা তৃতীয়াদক্ষ্ণঃ কৃশানুঃ কিল নিষ্পপাত ॥"

"অনন্তর ত্রিলোচন জিতেন্দ্রিয়ত্বহেতু বলবৎ ইন্দ্রিয়ক্ষোভ নিগৃহীত করিয়া স্বীয় চিত্তবিকারের হেতু অন্বেষণের নিমিত্ত চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। তিনি দেখিতে পাইলেন, কন্দর্প স্বীয় বামপদ আকুঞ্চিত এবং স্কন্ধদ্বয় সন্নত করিয়া গুণাকর্ষণ-মুষ্টি দক্ষিণ চক্ষুর প্রান্তভাগ পর্য্যন্ত আনয়নহেতু চক্রীকৃত শরাসন ধারণপূর্ব্বক অবস্থিত রহিয়াছেন। তপস্যার প্রতি আক্রমণ করাতে তৎক্ষণাৎ ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিলেন। তৎকালে ভ্রুকুটির আবির্ভাবে তাঁহার মুখমণ্ডল ভয়ঙ্কর আকার ধারণ করিল। তৎক্ষণাৎ তাঁহার ললাটস্থিত তৃতীয়চক্ষু হইতে জাজ্বল্যমান শিখাশালী অগ্নি বহির্গত হইল।"

উমার বিমোহন রূপ দেখিয়া ক্ষণকালের নিমিত্ত মহাযোগীর মনে যে মোহের উদয় হইয়াছিল, পৌরাণিক কবি সেই মোহকে শরীরী করিয়া মদনরূপে দেখাইয়াছেন। এরূপ চিত্তচাঞ্চল্য মানুষ-মাত্রেরই মনে সঞ্জাত হওয়া স্বাভাবিক। রূপের সহিত চিত্তের যে সম্বন্ধ, তাহা বিধিনির্ব্বন্ধ, [illegible] অবশ্যম্ভাবী। সেই ক্ষণিক স্বাভাবিক চিত্তবিকারে পাপপুণ্য কিছুই নাই। তবে তপস্যাপ্রভাবে সেরূপ চিত্তবিকার ক্রমে ক্রমে দুর্ব্বল হইয়া আইসে। কিন্তু পাপ কোথায়? পাপ, তৎপরে আসক্তি হেতু সঞ্জাত হয়। এই টুকু বুঝাইবার জন্য শুদ্ধসত্ত্ব মহাযোগীর মনে হিন্দু পৌরাণিক কবি বিকারের আবির্ভাব দেখাইলেন। কিন্তু পাছে সেই স্বাভাবিক চিত্তচাপল্য পাপাসক্তিতে পরিণত হয়, তাই তিনি বলিলেন, শরীরী মদনকে মহাদেব সূক্ষ্ম জ্ঞাননেত্রে দেখিয়াই ক্রোধান্ধ হইয়া উঠিলেন। কি, সে তপোবিঘ্ন ঘটাইতে আসিয়াছে? যেই মাত্র যোগীর মনে সেই চিত্তচাপল্য হেতু মদনাবির্ভাব অনুভূত হইল, অমনি যোগী তাহা জ্ঞান-বলে বুঝিতে পারিলেন। সেই সূক্ষ্ম

আভ্যন্তরিক মানস-ব্যাপার স্থূল অবয়বে দেখানই কবির উদ্দেশ্য। তখন মহাযোগী স্বীয় জ্ঞানাগ্নিতে সেই মোহকে তৎক্ষণাৎ ভস্মীভূত করিয়া মোহিনী প্রকৃতিদেবী উমাকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। এই কথা ইংরাজী কবি ঠিক বুঝাইবার জন্য এইরূপ বলিতেছেন :—

> "Then with strong effect Siva bulled to rest,
> The storm of passion in his troubled breast."

ইহাই কবি-কল্পনা। কবি যখন দেবদেব মহাদেবকে শরীরী মহাযোগিরূপে মনুষ্যাকারে দেখাইয়াছেন, তখন সেই শরীর-ধারণ-জনিত যে চিত্তবিকার স্বভাবতই সঞ্জাত হইবে, তাহা মানব-ধর্ম্ম। সেই মানব-ধর্ম্ম বজায় রাখিয়া কবি দেবসম্ভব জ্ঞানাগ্নির সঞ্চারদ্বারা সেই মানব-ধর্ম্মের শমতা দেখাইলেন। মানবে ইহাই দেবত্ব ও তপঃসঞ্জাত দেববল। মানবের স্বাভাবিক মদনাবির্ভাব স্থায়ী ইন্দ্রিয়লালসা ও রিপুরূপে পরিণত হওয়াই পাপ। মহাযোগী সেই রিপুকে ক্ষণকালের জন্যও অন্তরে স্থান দিলেন না। কারণ, যে মোহ শরীর-ধারণের অবশ্যম্ভাবী ফল, তাহা উদয় হইবামাত্র জ্ঞানি-গণ দমন করিয়া ফেলেন। অশান্ত প্রমত্ত ঐন্দ্রিয়িক জনগণ সেই মোহের বশীভূত হয়। সেই মোহের বশবর্ত্তিনী হইয়া নাটকীয় শকুন্তলা অতিথিসৎকাররূপ ধর্ম্মাচরণ ভুলিয়া গিয়াছিলেন, দময়ন্তী দেবগণকে অবজ্ঞা করিয়াছিলেন, উর্ব্বশী পুরুষোত্তমকে স্মরণ করিতে গিয়া পুরূরবার নামোচ্চারণ করিয়াছিলেন। তাই তাঁহারা অভিশপ্ত হইয়াছিলেন। যক্ষ নিজ কর্ত্তব্য অবহেলা করাতে যক্ষরাজ তাহাকে অভিশাপ দিয়াছিলেন। আর ডেসডিমোনা

অনুচ্চারিত পিতৃশাপে পতিতা হইলে, যার জন্য সেই শাপগ্রস্তা, সেই তাঁহাকে নিষ্ঠুররূপে নিহত করিয়াছিল।

কালিদাসের সময়েও যে কামজ গান্ধর্ব্ব-বিবাহ কিরূপ শাপযোগ্য ছিল, তাহা আমরা তাঁহার "অভিজ্ঞান-শকুন্তলে" দেখিতে পাই। শাপযোগ্য কি? "কুমারে" দেখিতে পাই, দেবগণ ষড়যন্ত্র করিয়া যখন উমার সহিত ত্রিলোচনের সেইরূপ কামজ মিলন ঘটাইতে গেলেন, তখন সেই মহাযোগীর কোপাগ্নিতে মদন একেবারে ভস্মীভূত হইয়া গেলেন। উমা তদ্রূপ মিলন অসম্ভব দেখিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। সুতরাং "কুমারে" যাহা মদনভস্ম, "শকুন্তলা"য় তাহাই দুর্ব্বাসার অভিশাপ। সেখানে যেমন কামার্ত্তা উমা অপদস্থা, এখানে তেমনি প্রেমবিহ্বলা শকুন্তলা অভিশপ্তা। প্রভেদ এই, দুর্ব্বাসা একজন ঋষি, মহাদেব স্বয়ং ঈশ্বর। একজন মনুষ্য-আকারে দেবতা, অন্যজন দেবতা মনুষ্য-আকারে আকারিত। সেই দেবসম মনুষ্যচক্ষে মদনোত্তেজিতা উমা এবং প্রেমবিহ্বলা শকুন্তলা কিরূপ অবস্থাপন্না হইয়াছিলেন, তাহারই চিত্র "কুমারে" এবং "অভিজ্ঞানশকুন্তলে।" ব্রহ্মচারীর রূপ ধরিয়া সেই মহাদেব উমাকে যখন পরীক্ষা করিতে আসেন, তখন তিনি কিরূপ মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছিলেন, কালিদাস তাহা এইরূপ বর্ণন করিয়াছেন :—

> "অথাজিনাষাঢ়ধরঃ প্রগল্‌ভবাগ্‌ জ্বলন্নিব ব্রহ্মময়েন তেজসা।
> বিবেশ কশ্চিজ্জটিলস্তপোবনং শরীরবদ্ধঃ প্রথমাশ্রমো যথা॥"
>
> কুমারসম্ভব। ৫। ৩০।

"অনন্তর একদিন মৃগচর্ম্ম ও পলাশদণ্ডধর জটাধারী এক ব্রহ্মচারী পবিত্র ব্রহ্মময় তেজে জ্বলিতে জ্বলিতেই যেন পার্ব্বতীর তপোবনে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার বাক্য ভয়সম্পর্কপরিশূন্য; বোধ হইল, যেন ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম স্বয়ং দেহ ধারণপূর্ব্বক সেই স্থানে আগমন করিলেন।"

আর দুর্ব্বাসা যখন শকুন্তলাকে অভিশাপ দিয়া চলিয়া যাইতেছেন, তখন তাঁহাকে প্রিয়ংবদা কি বলিয়াছিলেন ?—

"কো অণ্ণো হুদবহাদো দহিউং পভবিস্‌সদি গচ্ছ পাএসু পণমিঅ ণিবত্তেসু ণং জাব অহং অগ্‌ঘোদঅং উবকপ্‌পেমি।"

"হুতাশন ব্যতীত অন্য আর কে দগ্ধ করিতে সমর্থ হইয়া থাকে ? তুমি সত্বর যাইয়া তাঁহার চরণে পড়িয়া ফিরাইয়া আন। আমিও উহাঁর জন্য অর্ঘ্যোদক সাজাইয়া রাখি।"

দুর্ব্বাসা এইরূপ ধর্ম্মের জ্বলন্ত দীপশিখা। এ ত দুষ্মন্ত নহে যে, রূপ দেখিয়া একেবারে গলিয়া যাইবেন, আর নড়িবার চড়িবার শক্তি নাই !

এইরূপ সৃষ্টি-সকল পুরাণ লোক-লোচনের সমক্ষে ধারণ করে। পদ্ম-পুরাণের সেই সৃষ্টিতে বর্ণ-প্রয়োগ করিয়া কবি তাহা নাটকে প্রতিফলিত করিয়াছেন। তিনি অগ্রে শকুন্তলার অপূর্ব্ব রূপের সৃষ্টি করিলেন, তাঁহাকে সুন্দরী সাজাইলেন ; তাঁহাকে ততোধিক রূপে ভূষিতা করিলেন, যত অধিক রূপসী প্রকৃতি-সুন্দরী উমা। এই দেখুন, উমা কিরূপ সুন্দরী :—

'সর্ব্বোপমাদ্রব্যসমুচ্চয়েন যথাপ্রদেশং বিনিবেশিতেন।
সা নির্ম্মিতা বিশ্বসৃজা প্রযত্নাদেকস্থসৌন্দর্য্যদিদৃক্ষয়েব ॥'

"বিধাতা যেন সমস্ত উপমাবস্তু পার্ব্বতীর শরীরের যথাযোগ্য স্থানে সন্নিবেশিত করিয়া অতিশয় যত্নসহকারে তাঁহাকে নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন।"

আবার দেখুন শকুন্তলাও সেইরূপ উপকরণে গঠিত। দুষ্মন্ত মোহিত হইয়া বলিতেছেন :—

"চিত্রে নিবেশ্য পরিকল্পিতসর্ব্বযোগা রূপোচ্চয়েন মনসা বিধিনা কৃতা নু।
স্ত্রীরত্নসৃষ্টিরপরা প্রতিভাতি সা মে ধাতুর্ব্বিভুত্বমনুচিন্ত্য বপুশ্চ তস্যাঃ ॥"

"সেই ক্ষীণাঙ্গী শকুন্তলার শরীর-সৌন্দর্য্য চিন্তা করিয়া ইহাই অবগত হওয়া গেল যে, বিধাতা জগতের তাবৎ নির্ম্মাণ-সামগ্রী একত্র আহরণপূর্ব্বক সমস্ত রূপরাশি এক স্থানে দেখাইবার জন্যই একটী স্ত্রীরত্ন সৃষ্টি করিয়াছেন।"

উমার রূপ বাড়াইবার জন্য যেমন তাঁহার দুই পার্শ্বে জয়া বিজয়া রহিয়াছেন, শকুন্তলারও দুই পার্শ্বে তেমনি অনসূয়া ও প্রিয়ংবদা। কিন্তু উমার সেই রূপ-প্রভা মনুষ্যের চিত্তে কিরূপ প্রতিভাত হয়, তাহা "কুমারে" নাই। দেবগণ সেই রূপকে অতুল সৌন্দর্য্যরূপে দেখিয়াছিলেন মাত্র। শকুন্তলার কবি সেই সৌন্দর্য্য মানুষের সমক্ষে ধরিলেন। দেখাইলেন, সে রূপে সামান্য মনুষ্য কি? জিতেন্দ্রিয় দুষ্মন্ত—যিনি হাজার হাজার রূপ দেখিয়াও স্থিরচিত্ত হইয়া ইন্দ্রিয়প্রভাব জয় করিতে পারিয়াছিলেন, আজ তিনিও কি না শকুন্তলার রূপ দেখিয়া চিত্তকে স্থির রাখিতে পারিলেন না। সেই অপূর্ব্ব রূপ-রাশির পদতলে সেই রাজরাজেশ্বর দুষ্মন্ত কৃপাভিখারী। একজন তত বড় জিতেন্দ্রিয় ক্ষত্রিয়-রাজ সেই রূপে পরাভূত! শুধু কি সেই রূপ? কবি নাটকের উপক্রমে সুন্দরীগণের লীলা-রসের যে চিত্র সৃষ্টি করিয়াছেন, আর কোন দেশীয় সাহিত্যে কি তদনুরূপ চিত্রের সৃষ্টি আছে? সেই অপূর্ব্ব সুন্দরীগণের পূর্ব্বরাগপূর্ণ অসামান্য সৃষ্টির সমক্ষে দুষ্মন্তের মত ক্ষত্রিয় বীর দণ্ডায়মান। হায়! সে বীরত্ব আজ রমণীর কাছে পরাজিত! ক্ষত্রিয় বীরের এই পরাভব-চিত্র দেখাইয়া, কবি তৎপার্শ্বেই আর এক বীরত্বের গৌরব-ছবি আঁকিলেন। শকুন্তলার সমক্ষে একজন ঋষি দণ্ডায়মান। মানুষে ও ঋষিতে, ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণে, রাজর্ষি ও পরমর্ষিতে কত বিভিন্নতা, তাহা এই স্থলে প্রতীত। যে ধর্ম্মের বিক্রম দুষ্মন্তে অকৃতকার্য্য, সেই সংযম ধর্ম্মের

গৌরব ব্রাহ্মণের চিত্তে আজ পূর্ণ প্রভাবে সমুদিত। ব্রাহ্মণের কত বড় শিক্ষা, কত বড় সংযম-অভ্যাস, কত বড় তপস্যা—যে তপস্যা তাঁহাকে পৃথিবীর অতুল রাজবীর হইতেও বল-বীর্য্যবান্ করিয়াছে, সেই ব্রাহ্মণবীরের, সেই সংযমবীরের, সেই ধর্ম্মবীরের, সেই তপস্যা-বীরের সমক্ষে শকুন্তলার প্রেমপূর্ণ,—প্রেমপূর্ণ কি? প্রেমবিহ্বলা মোহিনী মূর্ত্তি স্থাপিত করিয়া কবি সেই তপস্যা-প্রভাব, সেই সংযম-প্রভাব সেই ধর্ম্মপ্রভাব দেখাইলেন। যিনি ভগবানের সৌন্দর্য্য দেখিয়াছেন, তিনি কি মানুষের রূপে মুগ্ধ হন? শকুন্তলা সে বীরের নিকট পরাজিত। ব্রাহ্মণ-বীরত্ব ক্ষত্রিয়-বীরত্বের উপর জয়লাভ করিল। কি শকুন্তলার রূপ, কি ক্ষত্রিয়-বীরত্বের গৌরব, সকলই সেই সংযম-বলের নিকট পরাভূত। কবি, সেই অতুলনীয় শকুন্তলা-দুষ্মন্তের গৌরবিত ছবির পার্শ্বে এই শকুন্তলা-দুর্ব্বাসার অতুল গৌরবিত ছবি দেখাইলেন। দেখাইবা মাত্র পূর্ব্ব ছবির রাগরঞ্জন বিমলিন হইয়া গেল। ঋষির ধর্ম্মবলের নিকট ক্ষত্রিয়-বীরের ধর্ম্মবল হীনতর; ঋষির ভগবৎপ্রদীপ্ত অন্তঃসৌন্দর্য্যের নিকট শকুন্তলার অপূর্ব্ব বাহ্যরূপরাশি অতি বিমলিন। সেই রূপরাশির মোহে ঋষির চিত্ত বিগলিত হওয়া দূরে থাক্, সুন্দরীর চিত্তে নিজ রূপরাশির মত ধর্ম্মসৌন্দর্য্য নাই বলিয়া যখন তিনি ধর্ম্ম লঙ্ঘন করিলেন, অমনি ধর্ম্মবলে বলীয়ান্ ঋষির ধর্ম্মকোপ জাগরিত হইল। রূপের প্রভাব, সে কোপের কিছু কি শমতা করিতে পারিয়াছিল? যিনি ধর্ম্মের পবিত্ররূপ দেখিয়াছেন, তিনি কি পাপ-রূপে মুগ্ধ হইতে পারেন? কে কবে রূপসীকে দেখিয়া—রূপসী কি? অসামান্য রূপসীকে দেখিয়া নির্দ্দয়ভাবে শাপ দিতে পারিয়াছে? চিত্তের সেই ধীরতা ও স্থৈর্য্য কেবল দুর্ব্বাসার ছিল। এ কি সামান্য

সংযম-অভ্যাস ও ধর্ম্মবলের কথা! তাঁহার ধর্ম্মবল যে সর্ব্ববলোপরি বিজয়ী হইয়া উঠিল। তাই বলি, এরূপ ধর্ম্মবলের চিত্র পুরাণ ভিন্ন কি আর কোন দেশের কোন সাহিত্যে আছে? না, কল্পনায় আনিতে পারিয়াছে? হিন্দু পৌরাণিক সাহিত্যের এতই ধর্ম্ম-গৌরব! এ দৃশ্য দেখিলে কত না ধর্ম্মবলে মন উত্তেজিত হয়। শকুন্তলা-তুষ্মন্তের মদনোন্মত্ত ছবি কোথায় তলিয়া যায়? সে ছবিতে কলঙ্কপাত করে। কল্পনায় পাপ-দৃশ্য ডুবিয়া গিয়া ইহাই ভাসমান হয়। পুরাণ এই পর্য্যন্ত আসিয়াই স্থির হয় নাই। অন্যদিকে তুষ্মন্তের কামোন্মত্ততার পরিণাম ও ফলাফল আঁকিয়া ধর্ম্মগৌরব আরও উজ্জ্বলিত করিয়া দেখাইয়াছে। সে চিত্র পরে দেখাইতেছি।

যদি বল, নাটকে ত এ দৃশ্য শ্রুত হয় নাই? এই অভিশাপ-ব্যাপার নেপথ্যে হইয়া গেল। নেপথ্যে অভিশাপ হইবারই কথা, যেহেতু প্রকাশ্য রঙ্গভূমিতে অভিশাপপ্রদান হিন্দু অলঙ্কার-শাস্ত্রে নিষিদ্ধ। সাহিত্যদর্পণকার সেই কথাই বলিয়াছেন। যে সাহিত্যে শাপ-ব্যাপার আছে. সে সাহিত্যে সেই ব্যাপারের বিধি-নিষেধ-সাধক বিধানও আছে। কিন্তু যে বিলাতী সাহিত্যে শাপের গন্ধমাত্র নাই, সে সাহিত্যের অলঙ্কার-শাস্ত্রে তাহার বিধি-নিষেধ-সাধক বিধানও নাই। সে যাহা হউক, নেপথ্যে যখন অভিশাপ-ব্যাপার সম্পন্ন হইয়া গেল, বলিতে পার, সে ব্যাপারের দৃশ্যপট পাঠকের বা শ্রোতার মনে কিরূপে উদিত হইতে পারে? কিন্তু আমরা বলি, সেই অভিশাপের শব্দ-মাত্র যথেষ্ট। নেপথ্যে এরূপ কার্য্যের অভিনয় হয় এই জন্য যে, তদ্দ্বারা লোকলোচন হইতে অভিনয়ের নির্দ্দয়তা ও ভীষণতা অপসারিত হয় মাত্র। অভিনয়ে সে ব্যাপার দেখিলে পাছে লোকে তৎক্ষণাৎ উৎসাহিত হইয়া রঙ্গভূমির

শান্তিভঙ্গ করে, তাই তাহার প্রকাশ্য অভিনয় দেখান নিষিদ্ধ। নেপথ্যে শাপ-ব্যাপার সম্পন্ন হইয়া গেলে, শ্রোতৃবর্গের তৎসম্বন্ধে হস্তক্ষেপ করিবার আর কোন অবকাশ থাকে না। কিন্তু যেই শ্রোতৃবর্গ সেই ভয়ঙ্কর অভিশাপের রব কর্ণগোচর করিলেন, অমনি তাঁহারা শিহরিয়া উঠিলেন। কি? এমত অসামান্য সুন্দরীরত্ন অভিশপ্ত! কে সে অভিসম্পাত করিল?—দুর্ব্বাসা। অমনি কল্পনা শকুন্তলা-দুর্ব্বাসা-চিত্র চিত্তে অনুরঞ্জিত করিয়া দিল। কল্পনায় সে চিত্র উজ্জ্বলবর্ণে চিত্রিত হইল। কলিকাতায় যে এত খুন হয়, কে কবে সে খুনের ব্যাপার স্বচক্ষে দেখিয়াছে? কাগজে পড়িবামাত্র তাহাদের অনুচিত্র কল্পনা আঁকিতে বসে। অমনি সেই ভয়ানক ব্যাপারে গাত্র শিহরিয়া উঠে। এ কথা আমরা "সাহিত্য-চিন্তা"য় বিশিষ্টরূপে প্রদর্শন করিয়াছি। তাই বলি, পৌরাণিক বিবরণেরও যে ফল, নেপথ্যে অভিশাপেরও সেই ফল। কল্পনায় সমভাবেই শকুন্তলার সমক্ষে দুর্ব্বাসা সমুদিত ও জাজ্বল্যমান। সেই রূপে জাজ্বল্যমান, যে রূপের বর্ণগৌরবে রবিবর্ম্মা সেই চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন।

শকুন্তলার প্রতি দুর্ব্বাসার অভিশাপ-চিত্রের কিরূপ ফল, তাহা উক্ত হইল; কিন্তু দুষ্মন্ত যে বহু রমণীর পাণিগ্রহণ করিয়াও অতৃপ্ত ইন্দ্রিয়লালসার বশবর্ত্তী হইয়াছিলেন, তাঁহার সেই কামোন্মত্তার প্রতি নাটককার অভিসম্পাতের উল্লেখ করেন নাই কেন? বলিতে গেলে, তাঁহারই ত সমূহ পাপলালসা। তিনি না একজন সুধার্ম্মিক জিতেন্দ্রিয় রাজর্ষি বলিয়া বিখ্যাত ছিলেন? তবে কেন ঋষিকন্যা সুন্দরী শকুন্তলাকে দেখিয়াই তাঁহার এতদূর কামোন্মত্ততা ও মোহ উপস্থিত হইল? যে ইন্দ্রিয়লালসা একজন সুন্দরীকে দেখিয়া

উত্তেজিত হইল, তাহা ত তদ্রূপ অপর সুন্দরীকে দেখিয়াও হইবে। তবে তাঁহার সেই কামপ্রবৃত্তির সীমা কোথায়? এত মহিষীর পাণিগ্রহণ করিয়াও যিনি সন্তুষ্ট নহেন, তিনি ত প্রবৃত্তির দাস। প্রবৃত্তির দাসত্বই দোষও পাপ। ধর্ম্মের আদেশ প্রবৃত্তির সংযম, দাসত্ব নহে। তাই ধর্ম্মের উপর হিন্দু-বিবাহ স্থাপিত। কিন্তু নাটকীয় শকুন্তলার প্রেম যথার্থ প্রেম, সে প্রেমের উৎপত্তি রূপজ অনুরাগে বটে, এবং তজ্জন্যই তাহা সেই এক কারণে দূষিত হইয়াছিল বটে; কিন্তু যেরূপে উপজাত হউক না কেন, সেই অনুরাগ ও কাম ক্রমে প্রকৃত প্রেমে পরিণত হইয়াছিল *। তাহা উৎপত্তি-স্থানে কামজ বলিয়া অভিশপ্ত হইয়াছিল, কিন্তু বহুমহিষী-পতি দুষ্মন্তের ইন্দ্রিয়-লালসার কি কিছু খণ্ডনযুক্তি আছে? নিজে দুষ্মন্ত সেই শকুন্তলার প্রতি অনুরাগকে পাপানুরাগ বলিয়া বিবেচনা করিতেন। নিজ বয়স্য মাধব্যের কাছে শকুন্তলার বিবরণ কতক কতক প্রকাশ করিয়া, তাই শেষে সেই বয়স্যের নিকটেই সেই পাপ ঢাকিবার জন্য বলিয়াছিলেন, আমি শকুন্তলা-সম্বন্ধে যাহা যাহা বলিয়াছি, তাহা সকলই অলীক বলিয়াই জানিবে। তবে নাটককার তাঁহার সেই ইন্দ্রিয়লালসার প্রতি শাপ-প্রয়োগের ব্যবস্থা করিলেন না কেন? যদি শকুন্তলার সামান্য অপরাধ শাপযোগ্য হয়, তবে ত দুষ্মন্তের গুরু অপরাধ আরও শাপযোগ্য। দুষ্মন্তের প্রতি অভিশাপ ত পদ্মপুরাণে দৃষ্ট হয়। এমন কি, মহাভারতে দুর্ব্বাসার শাপ নাই, কিন্তু তাহাতেও যে

---

* "সাহিত্য-চিন্তা"র ৭৫ পৃষ্ঠায় কামের সহিত প্রকৃত প্রেমের বিভিন্নতা প্রকাশিত হইয়াছে।

দুষ্মন্তের গুরু অপরাধের অভিশাপ আছে; তবে সে শাপ নাটকে নাই কেন? সেই কথাই এখন আলোচ্য।

বলিয়াছি ত নাটকীয় শকুন্তলা-প্রেমের উৎপত্তিস্থানেই দোষ ছিল, তাই সে প্রেম উৎপত্তি-স্থানেই অভিশপ্ত হইয়াছিল। রূপজ-কামানুরাগে সঞ্জাত হইয়া যে স্থলে সেই অনুরাগ দোষার্হ ধর্ম্ম-বিস্মৃতি-জনক মোহে পরিণত হইয়াছিল, সেই স্থলে যেন শকুন্তলাকে উদ্বুদ্ধ করিবার ও জ্ঞান দিবার জন্য দুর্ব্বাসার শাপ প্রযুক্ত হইয়াছিল। তদ্রূপ দুষ্মন্তের পাপানুরাগ যখন এতদূর মোহে পরিণত হইয়াছিল যে, তদ্দ্বারা ধর্ম্মের হানি ও সামাজিক অনিষ্টাপাতের কারণ হইয়াছিল, তখনই দুষ্মন্ত অভিশপ্ত হইয়াছিলেন। পুরাণের এগুলি বড় সূক্ষ্ম ধর্ম্ম-নৈতিক তত্ত্ব। তাহাই পাপ, যাহার কর্ম্মফল মন্দ। কর্ম্ম-ফল ধরিয়াই শাস্ত্রে পাপ-পুণ্যের বিচার হইয়াছে। এজন্য ধর্ম্ম-শাস্ত্র যাহাকে পাপ বলিয়াছেন, তাহাকেই পাপ বলিয়া গণ্য করিতে হইবে। এই তত্ত্ব বুঝিতে পারিলেই পুরাণের অভিসম্পাত-সকলের তাৎপর্য্য বুঝা যায়। পুরাণ ধর্ম্মশাস্ত্র; এজন্য তাহা অধ্যাত্ম-বিদ্যাই প্রকাশ করে। পৌরাণিক অভিশাপ অধ্যাত্ম-তত্ত্বাবলির সুন্দর দ্যোতক। যে স্থলে পাপজনক মোহ ও ধর্ম্মের গ্লানি, সেই স্থলেই অভিশাপ।

মহাভারত পুরাণ-শ্রেষ্ঠ। ভগবান্ ব্যাস সেই ভারতমধ্যে সকল পৌরাণিক-রহস্যজনক ইতিহাসই সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। এজন্য তাঁহাকে সকল উপন্যাসের সারাংশভাগ দিয়াই সন্তুষ্ট হইতে হইয়াছে। শকুন্তলার উপাখ্যান প্রধানতঃ পদ্মপুরাণেই সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। ব্যাস তাহার সারাংশ গ্রহণ করিয়া নিজ কাব্যে তাহার স্থান দান করিয়াছেন। এজন্য মহাভারতীয় উপাখ্যানে আমরা

শকুন্তলাতত্ত্বের সার মর্ম্ম অবগত হইতে পারি। ধর্ম্মাচার লঙ্ঘনবশতঃ শকুন্তলার সামান্য অপরাধ মহাভারতীয় উপাখ্যানে অভিশপ্ত হয় নাই। কিন্তু দুষ্মন্তের গুরু অপরাধ উপেক্ষণীয় নহে। এজন্য সেই অপরাধ শকুন্তলা কর্ত্তৃকই অভিশপ্ত হইয়াছিল।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা বলিয়াছেন :—

"ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ সঙ্গস্তেষূপজায়তে।
সঙ্গাৎ সংজায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধোঽভিজায়তে॥
ক্রোধাদ্ভবতি সংমোহঃ সংমোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ।
স্মৃতিভ্রংশাদ্বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি॥" ২—৬২।৬৩

"যে যে বিষয় সতত ভাবনা করে, তাহার তাহাতে আসক্তি জন্মে; আসক্তি হইতে কামের উদ্ভব, কাম হইতে ক্রোধ, ক্রোধ হইতে মোহ, মোহ হইতে স্মৃতিভ্রংশ, স্মৃতিভ্রংশ হইতে বুদ্ধিনাশ, বুদ্ধিনাশ হইতে সর্ব্বনাশের উৎপত্তি হয়।"

গীতা অধ্যাত্ম-বিদ্যায় পাপপথের এইরূপ ক্রম দেখাইয়াছেন। সেই ক্রম দুষ্মন্ত-চরিতেও প্রকাশিত হইয়াছে। তাঁহার চরিতে দেখিতে পাওয়া যায়, প্রথমে শকুন্তলা তাঁহার দর্শনেন্দ্রিয়ের বিষয়ীভূত হইয়াছিল। তাহাতেই তাঁহার শকুন্তলার প্রতি প্রগাঢ় চিন্তা এবং সেই চিন্তা হইতে আসক্তি জন্মে। সেই আসক্তি কামে পরিণত হয়। সেই কাম হইতে তাঁহার কিরূপ ক্রোধের উৎপত্তি হইয়াছিল বলিতেছি।

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি, রাজা দুষ্মন্ত তাঁহার শকুন্তলাসক্তিকে নিজেই পাপাসক্তি বলিয়া বিবেচনা করিয়াছিলেন। সেই আসক্তিসন্তৃপ্তির দ্বার মুক্ত করিবার পন্থা মাত্র—গান্ধর্ব্ব-বিবাহ। সে বিবাহ দ্বারা শকুন্তলার সহিত মিলিত হইবার জন্য তিনি স্ত্রীজাতির নিকট নানা প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হইয়াছিলেন। এ সকল কথা

কাহারও নিকট প্রকাশ করেন নাই। বয়স্য মাধব্যের নিকট কতক কতক খুলিয়াই, শেষে সকলই অলীক বলিয়া ঢাকিয়া লইয়াছিলেন। কারণ, তিনি স্বরাজ্যমধ্যে অতি সুধার্ম্মিক, জিতেন্দ্রিয় নরপতি বলিয়াই বিখ্যাত ছিলেন। তাই তিনি নির্জ্জনে যে পাপকার্য্য করিয়া আসিয়াছিলেন, তাহা গোপন করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছিলেন। সবাই জানে, জিতেন্দ্রিয় রাজর্ষি দুষ্মন্ত পরস্ত্রীর মুখাবলোকনে পরাঙ্মুখ। তাই তিনি একদা গর্ব্ব করিয়া বলিয়াছিলেন :—

"প্রথিতং দুষ্মন্তস্য চরিতং তথাপীদং ন লক্ষয়ে।"

"কুমুদান্যেব শশাঙ্কঃ সবিতা বোধয়তি পঙ্কজান্যেব।

বশিনাং হি পরপরিগ্রহসংশ্লেষপরাঙ্মুখী বৃত্তিঃ॥"

"দুষ্মন্তের সকল কার্য্যই সর্ব্বজনবিদিত; তথাপি ইহা কেন মনে হইতেছে না?

"হে তপস্বিন্, আপনি জানিবেন যে, শশাঙ্ক কুমুদিনীকে আর দিবাকর পদ্মিনীকেই প্রস্ফুটিত করিয়া থাকেন, তেমনি জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তিগণও পরস্ত্রী-মুখাবলোকনে পরাঙ্মুখ।"—অভিজ্ঞান-শকুন্তল, পঞ্চম অঙ্ক।

তিনি কেবল স্বীয় মহিষীগণ ব্যতিরেকে আর কোন ললনার মুখাবলোকনে পরাঙ্মুখ। তবে তিনি কিরূপে শকুন্তলার সহিত নির্জ্জন বিবাহের কথা প্রচার করিতে পারেন? সে কথা প্রকাশিত হইলে তাঁহাকে আর কে রাজর্ষি বলিবে? পরিবারবর্গ ও মহিষীগণই বা সেই লজ্জাকর ব্যাপার শুনিয়া কি বলিবে? তিনি যে সেই গান্ধর্ব্ব-বিবাহ করিয়াছিলেন, তাহার সাক্ষী কে? তিনি মনে করিতেন, তাহা মৃগয়া-সম্বন্ধীয় একটী গোপনীয় ঘটনা মাত্র। ইন্দ্রিয়লালসা পরিতৃপ্তি করিবার জন্য তিনি স্ত্রীজাতির নিকট যেসকল প্রতিজ্ঞা করিয়া আসিয়াছেন, তাহার আবার পালন

করা কি? পালন করিতে গেলেই ত সেই রহস্য প্রচারিত হইয়া পড়িবে। এজন্য সেই প্রতিজ্ঞা-সকল চিরদিনই অপালিত ছিল। এই পাপকার্য্যের সমস্ত বিষয়ই তাই তিনি বিস্মৃতিনীরে ডুবাইয়া দিয়াছিলেন। তাই বলিয়াছি, দুর্ব্বাসা শাপ না দিলেও তাঁহাকে শকুন্তলাকে ভুলিয়া থাকিতে হইয়াছিল। এপ্রকার বিবাহের নিয়মই এইরূপ। তাই মহাভারতেও দেখিতে পাওয়া যায়, দুর্ব্বাসার শাপ অভাবেও দুষ্মন্ত শকুন্তলাকে ভুলিয়া ছিলেন। তাহাতে আরও প্রকাশিত, সর্ব্বশেষে ধর্ম্মপত্নী শকুন্তলার সান্ত্বনা-জন্য দুষ্মন্তকে বলিতে হইয়াছিল :—

"প্রিয়ে! নির্জ্জন কাননে তোমার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলাম, কেহই জানিত না; দোষৈকদর্শী লোক পাছে তোমাকে কুলটা, আমাকে কামপরবশ এবং রাজ্যে অভিষিক্ত পুত্রকে জারজ মনে করে, এই ভয়ে আমি এতক্ষণ এতদ্রূপ বিচার করিতেছিলাম। তুমি ক্রুদ্ধা হইয়া আমার প্রতি যে সকল কটু বাক্য প্রয়োগ করিয়াছ, হে প্রিয়তমে, আমি তাহা ক্ষমা করিয়াছি।"—কা, সিং কৃত অনুবাদ।

শকুন্তলার কথা যখন তিনি এইরূপ বহুদিন ভুলিয়া গিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া রাজকার্য্য করেন, মনে করেন, যা হইবার, তাহা হইয়া গিয়াছে, আর আমি কখন এরূপ পাপকার্য্যে লিপ্ত হইব না, এমত সময় সহসা একদিন শকুন্তলাকে লইয়া কণ্বশিষ্যদ্বয় একেবারে প্রকাশ্য রাজদরবারে উপস্থিত হইলেন। দুষ্মন্ত তাঁহাদিগকে দেখিবামাত্র ক্রোধান্ধ হইয়া উঠিলেন। যতই তাঁহারা রাজবৃত্তান্ত প্রকাশ করেন, ততই তাঁহার রাগ বাড়িতে লাগিল। শকুন্তলা আবার গর্ভবতী। সেই গর্ভ দেখিয়াই ত তিনি জ্বলিয়া উঠিয়াছিলেন। ভাবিয়াছিলেন, কে তাহার গর্ভ করিল? আমি

ত একদিন মাত্র স্পর্শ করিয়াছিলাম। কই তাহার হাতে ত সে রাজাঙ্গুরীয় নাই। তা হবেই ত, একদিনের প্রার্থনায় যে সম্মত হয়, তাহার চরিত্র কিরূপ হইবে? তাই তিনি রাগে গর-গর করিয়া 'দূর দূর, বেশ্যা' বলিয়া তাঁহাকে রাজসভা হইতে তাড়াইয়া দিতে উদ্যত হইয়াছিলেন।

পদ্মপুরাণে উক্ত হইয়াছে যে, কণ্বশিষ্যদ্বয় শকুন্তলাকে আনিয়া উপস্থিত করিলে, রাজা তাঁহাকে গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিলেন এবং তাঁহাকে 'বেশ্যা বেশ্যা' বলিয়া গালি দিয়াছিলেন, এমত নহে, সেই শিষ্যদ্বয়কেও তৎসঙ্গে উত্তম মধ্যম কটূক্তি বলিয়াছিলেন। কি বলিয়াছিলেন?

"কত বেশ্যা আছে, এই কামসেবায় ভ্রমণ করে। রাজরাজ্ঞীর মহিষী হইতে কাহার না অভিলাষ হয়? এমন ব্রাহ্মণও অনেক আছে, যাহারা কপট তাপস বেশে ঐ সকল গণিকার সহিত ভ্রমণ করে এবং তাহাদের উপার্জ্জনের বিপুল ভোগ সম্ভোগ করে।"

রাজার এই কথা শ্রবণ করিয়া শিষ্যদ্বয় কি করিলেন?

"নিশম্য নৃপতের্বাক্যং শিষ্যৌ কণ্বস্য তাপসৌ।
শেপতুর্বিরহেণাস্যাঃ পশ্চাত্তাপমবাপ্স্যসি॥"

শিষ্যেরা রাজাকে এই কথা বলিয়া অভিসম্পাত করিলেন :—

"ইহার বিরহে তোমায় পশ্চাৎ অনুতপ্ত হইতে হইবে।"

এই বলিয়া সেই ব্রহ্মবাদী তাপসদ্বয় সক্রোধে চলিয়া গেলেন।

গীতার কথা মাত্রায় মাত্রায় ফলিয়া গেল। কাম হইতে ক্রোধ, ক্রোধ হইতে মোহের উৎপত্তি। ক্রোধের সঙ্গে সঙ্গেই মোহ উপস্থিত হয়। সেই মোহবশতঃ লোকের পূর্ব্ব উপকারাদি

কিছু স্মরণ থাকে না। ক্রোধে লোক অন্ধ হইয়া পড়ে। ক্রোধ পরম শত্রু। সেই ক্রোধ লোককে অকথ্য কথনে প্রবৃত্ত করায়। সুতরাং, সেই ক্রোধ-হেতু আজ রাজার মনে যে মোহ ও আত্ম-বিস্মৃতির উদয় হইয়াছিল, তাহাই শাপযোগ্য। আজ কণ্বশিষ্য-দ্বয় সেই জন্য রাজাকে শাপ দিয়া চলিয়া গেলেন। অন্য শাপ নহে, তাঁহারা শাপ দিলেন—"রাজন্, তোমাকে এই শকুন্তলা-বিরহে কাঁদিতে হইবে।" এ শাপ না দিলেও তাহাই ঘটিত। কারণ, তিনি আজ ক্রোধভরে শকুন্তলাকে দূর দূর করিয়া তাড়াইয়া দিতেছেন; কিন্তু সময়ক্রমে এমন কাল উপস্থিত হইবে, যখন তাঁহাকে সেই সাধ্বী সতীর জন্য অনুতাপ করিয়া কাঁদিতে হইবে। এ শাপ তাঁহার মোহ-জনিত কার্য্যের ফল-স্বরূপ আপনিই ফলিয়া যাইবে। যেমন দুর্ব্বাসার শাপ ফলিয়া গিয়াছে—রাজাকে শকুন্তলা-প্রেম ভুলিয়া থাকিতে হইয়াছে, যেমন দুর্ব্বাসা শাপ না দিলেও তাহা অধ্যাত্ম-নিয়মে ফলিত, তেমনি এই শিষ্যদ্বয়ের শাপ সেই অধ্যাত্ম-নিয়মে স্বতই ফলিয়া যাইবে। সুতরাং পুরাণে আমরা যে-সকল শাপ-বৃত্তান্ত পড়ি, তাহা অধ্যাত্ম-নিয়মেরই দ্যোতক। তাহাদের ফলাফল সেই নিয়মানুসারে অবশ্যম্ভাবী। প্রভেদ এই, কোন স্থলে সে ফল ফলিতে দেখা যায়, কোন স্থলে দেখা যায় না। যেখানে দেখা যায় না, সেখানে সেই ফল অন্তরে অন্তরে ঘটে। তাহা অধ্যাত্ম জগতে সূক্ষ্মরূপে দেখা দেয়, বাহিরে প্রকাশিত হয় না। তজ্জন্য মানুষ ভিতরে ভিতরে অধোগামী হইতে পারে। কালক্রমে সেই অধোগতির ফল দেখা দেয়।

পদ্মপুরাণে কণ্বশিষ্যদ্বয়ের এইরূপ শাপবৃত্তান্ত বর্ণিত হইয়াছে। নাটক তৎসেই পুরাণ-অবলম্বনে রচিত, তবে তাহাতে সে শাপ দৃষ্ট

হয় নাই কেন? তাহার কারণ, নাটক ত আর পুরাণ নহে। নাটকে প্রকাশ্য রঙ্গভূমিতে অভিশাপ হওয়া নিষিদ্ধ। তজ্জন্য সে শাপ নাটকে নাই। দুর্ব্বাসার শাপ স্ত্রীলোকের উপর, সুতরাং তাহা অনায়াসে নেপথ্যে প্রদত্ত হইয়াছিল। কিন্তু এখানে যে প্রকাশ্য রাজসভায় এই শকুন্তলার সাক্ষাৎ ব্যাপার অভিনীত হই-তেছে; তবে কিরূপে সে শাপ প্রদত্ত হইতে পারে? তথাপি ঠিক্ সেই শাপ না হউক, শার্ঙ্গরব তদনুরূপ বাক্য রাজাকে বলিয়া-ছিলেন। রাজা যখন বলিলেন:—

"হে তাপস! আচ্ছা, আমরাই যেন প্রতারক ও আমাদের বাক্য বিশ্বাসজনক নহে, কিন্তু বলুন দেখি, এই তাপস-কন্যাকে প্রতারণা করায় আমার কি লাভ হইবে?" তখন শার্ঙ্গরব বলিলেন—"বিনিপাতঃ। তোমার নিপাত লাভ হইবে।" এইরূপ কটূক্তি কি অভিশাপ নহে?

কিন্তু সেই সতীলক্ষ্মী তাপস-কন্যা শকুন্তলাকে রাজা যে, বেশ্যা বেশ্যা বলিয়া দূর দূর করিয়া তাড়াইয়া দিলেন, তাহাতে কি সেই সতীর মনে দারুণ বেদনার উৎপত্তি হয় নাই? সেই বেদনাতে তিনি কি বলিয়াছিলেন? সেই সতীলক্ষ্মী কুপিত পতিকে নিজে ত শাপ দিতে পারেন না, তাই তাঁহাকে পাকতঃ এইরূপ অভিশাপ-বাক্য প্রয়োগ করিলেন। পদ্মপুরাণে আছে:—

"যদি মে যাচমানায়া বচনং ন করিষ্যসি।
কণ্বশাপেন তে মূর্দ্ধা শতধৈব ফলিষ্যতি॥"

"হে দুষ্মন্ত! আমি পুনঃ পুনঃ যাচ্ঞা করিতেছি, যদি আমার ... যোগ না করেন, তাহা হইলে কণ্বশাপে আপনার মূর্দ্ধা শতধা বিদী... সাধ্বী আপনার কথায় পতির প্রতি দারুণ শাপবা...

করিতে না পারায় পিতার উপর ঠেশ দিয়া বলিলেন। কিন্তু সে শাপ বাস্তবিক তাঁহার নিজেরই। মহাভারত এ কথার প্রমাণ। মহাভারতে শকুন্তলা বলিতেছেন :—

"হে দুষ্মন্ত! তুমি যদি আমার কথায় অবজ্ঞা প্রদর্শনপূর্ব্বক উত্তর প্রদান না কর, তাহা হইলে অদ্য তোমার মস্তক শতধা বিদীর্ণ হইবে।"—সম্ভবপর্ব্ব। ত্রিসপ্ততিতম অধ্যায়।

অভিনয়ে এরূপ স্থলে নেপথ্যে কোন কথা রাজার সঙ্গে ঘটিতে পারে না বলিয়া নাটকে এইরূপ শাপবাক্য উচ্চারিত হয় নাই। শাপবাক্য উচ্চারিত না হউক, শকুন্তলা এই স্থলে যেরূপ কোপোজ্জ্বলিত হইয়া রাজাকে অগ্নিসম বাক্য বলিয়াছিলেন, তাহা শাপেরও অধিক। তদপেক্ষা শাপ দেওয়া ভাল ছিল। তিনি রাজাকে বলিয়াছিলেন :—

"অণজ্জ অত্তণো হিঅআণুমাণেণ কিল সব্বং পেক্খসি। কোণাম অণ্ণো ধম্মকঞ্চুঅব্যবদেসিণো তিণাচ্ছণ্ণকূবোবমস্স তুহ অণুআরী ভবিস্সদি।"

"হে অনার্য্য! আপনার হৃদয়ের ন্যায় অনুমান করিয়া সকলকেই দর্শন করিয়া থাকেন; ধর্ম্মকঞ্চুকের আবরণ দিয়া তৃণাচ্ছন্ন কূপতুল্য আপনার ন্যায় শঠতাচরণ করিতে কোন্ ব্যক্তির প্রবৃত্তি হয়?"

প্রকাশ্য রাজসভায় দাঁড়াইয়া "অনার্য্য" "শঠ" "প্রতারক" প্রভৃতি বাক্যে রাজাকে কটূক্তি করিতে কেবল সংসারানভিজ্ঞা তাপসকন্যা শকুন্তলাই সাহসিনী হইয়াছিলেন। না হইবেন কেন? তখন কি শকুন্তলার জ্ঞান ছিল? সাধ্বী শঠ, বেশ্যা প্রভৃতি-রবে একেবারে ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া উঠিয়া গায়ের জ্বালায় সেইরূপ উক্তি করিয়াছিলেন। শকুন্তলার তখনকার রোষকষায়িত ভাব দেখিয়া রাজা স্বগত কি ভাবিতেছেন দেখুন :—

"মদনাসাদবিভ্রমঃ পুনরত্রভবত্যাঃ কোপো লক্ষ্যতে। তথাহি—

"ন তির্য্যগবলোকিতং ভবতি চক্ষুরালোহিতং।
বচোঽপি পরুষাক্ষরং ন চ পদেষু সংগচ্ছতে॥"

"বনবাসহেতু ইহাঁর কোপ বিক্রমশূন্য, যেহেতু ইনি বক্রভাবে অবলোকন করেন না, ইহাঁর চক্ষুও অতিশয় লোহিত বর্ণ ধারণ করিয়াছে, বাক্যও অত্যন্ত নিষ্ঠুরাক্ষর-বিশিষ্ট এবং উহা লক্ষ্যীকৃত মাদৃশ পুরুষগণের প্রতি সঙ্গত হয় না।"

এই ভাবে তিনি যেন শাপ দিতে উদ্যত, এমতই বোধ হইয়াছিল। তাঁহার মনোগত অগ্নিপরীত অভিশাপ যেন সেই কোপোজ্জ্বল ভাবে ব্যক্ত হইতে আসিতেছিল। অথচ ব্যক্ত হইবার যো নাই বলিয়া যেন আরও উজ্জ্বল হইয়া দেখা দিয়াছিল। শকুন্তলা মনে মনে যেন দারুণ অভিসম্পাত করিতেছিলেন। সে অভিসম্পাত ফুটিয়া বাহির হইলেই মুখরিত হইয়া বলিত—"হে রাজন্, আমার বুক যেমন বিদীর্ণ হইয়াছে, তোমার শির যেন তেমনি বিদীর্ণ হয়।" নাটক পদ্মপুরাণের ইতিহাসাবলম্বনেই রচিত, সুতরাং বুঝিতে হইবে, নাটকে যদি পুরাণোক্ত অভিশাপ-বাক্য প্রকাশ্যে উচ্চারিত হইবার যো থাকিত, তাহা হইলে ঠিক্ সেই অভিশাপই শকুন্তলা উচ্চারণ করিয়া বলিতেন। নাটক সে অভিশাপ ব্যক্ত করিয়া বলিতে পারে নাই বটে, কিন্তু তাহার ফলাফল বিলক্ষণ দেখাইয়াছে। দুষ্মন্ত শেষে শকুন্তলার বিরহে একান্ত কাতর হইয়া যখন গীতোক্ত বুদ্ধিনাশ-হেতু উন্মাদপ্রায় হইয়াছিলেন, তখন তাঁহার মূর্দ্ধা শতধা বিদীর্ণ হইয়াছিল। সেই ফল দেখিয়াও অনুমান করিতে হয়, যাহা সেই ফলোৎপত্তির কারণ, তাহাই শকুন্তলার অভিশাপ। রাজা দুষ্মন্ত নিজ কর্ম্মদোষেই সেই অভিশাপভাগী হইয়া শত অনুতাপবাক্যে সেই অভিশাপেরই ফলশ্রুতির পরিচয় দিয়াছেন।

অপ্সরাগণের অভিশাপ।

অপ্সরা-কন্যা শকুন্তলার অভিশাপের কথা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, এ প্রস্তাবে অপ্সরাগণের অভিশাপের বিষয় বলা যাইতেছে।

দুষ্মন্ত ও শকুন্তলার গান্ধর্ব্ব-বিবাহ নির্জ্জনে সম্পন্ন হইয়া গেল। তাহাতে কি দুষ্মন্ত, কি শকুন্তলা, উভয়েই সন্তুষ্ট। তাঁহারা কাহার অহিত করিয়াছিলেন? কাহারই বা মনোবেদনা দিয়াছিলেন? আপাততঃ বোধ হয়, কাহারই নহে। কিন্তু বাস্তবিক কি তাই? তাঁহারা মনোবেদনা দিয়াছিলেন ধর্ম্মের, অহিত করিয়াছিলেন সমাজের; তাই সামাজিক ধর্ম্ম-নিয়মে শাপগ্রস্ত হইয়া উভয়েই অভি-সম্পাতের ফলভোগী হইয়াছিলেন। ধর্ম্ম, দুর্ব্বাসা রূপে মূর্ত্তিমান্ হইয়া যে অভিশাপ দিয়াছিলেন, তজ্জন্য শকুন্তলার যেমন অপমান, দুষ্মন্তও তেমনি হতমান হইয়াছিলেন। সুতরাং এক অভিশাপের ফল দুই জনকেই ভোগিতে হইয়াছিল। ইন্দ্রিয়-পরায়ণতা-হেতু দুষ্মন্তের যে পদস্খলন হইয়াছিল, তাঁহাকে সেই পাপের ফলভোগ করিতে হইয়াছিল। অপ্সরা-কন্যা শকুন্তলা একদা যৌবনের অধীর-তায় উন্মত্তা হইয়া নির্জ্জনে দুষ্মন্তকে বিবাহ করিযা যে সামাজিক ধর্ম্মনিয়ম লঙ্ঘন করিয়াছিলেন, তাহা কালিদাস কণ্বশিষ্য শার্ঙ্গরবের মুখ দিয়া এইরূপ বলিয়াছেন:—

"ইত্থমপ্রতিহতং চাপল্যং দহতি।
অতঃ পরীক্ষ্য কর্ত্তব্যং বিশেষাৎ সঙ্গতং রহঃ।
অজ্ঞাতহৃদয়েষেবং বৈরীভবতি সৌহৃদম্॥"

"চাপল্যহেতু যাহার তাহার সহিত যে প্রণয় করিয়াছিলে, তাহাই এক্ষণে প্রদীপ্ত অনলস্বরূপ হইয়া দগ্ধ করিতেছে। অতএব বিশেষরূপে পরীক্ষা না করিয়া নির্জ্জনে সৌহৃদ্য স্থাপন করা অকর্ত্তব্য। যাহার অন্তঃকরণ জানা নাই, তাহার সহিত প্রণয় ঘটিলে বৈরিভাব ধারণপূর্ব্বক সেই প্রণয়ই বিদ্বেষ-ভাবে পরিণত হইয়া থাকে।"

শকুন্তলা সেই বিদ্বেষ-ভাবের ফলভোগী হইয়া একদা দুষ্মন্ত কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত, যথাবিধি অপমানিত ও লাঞ্ছিত হইয়াছিলেন।

এ ত গেল সমাজ-ধর্ম্মলঙ্ঘনের জন্য অভিশাপ এবং তাহার ফল-ভোগ। কিন্তু স্বর্গবাসী অর্জ্জুন অপ্সরা উর্ব্বশী কর্ত্তৃক কেন অভি-শপ্ত হইয়াছিলেন? তিনি কি ধর্ম্মলঙ্ঘন করিয়াছিলেন? ধর্ম্মলঙ্ঘন করা দূরে থাক্, বীর সংযম-ধর্ম্মের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়া উর্ব্বশীকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন। অর্জ্জুন যেমন উর্ব্বশীকে, ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে দেখা যায়, মহাতপস্বী দেবল তেমনি অপ্সরা রম্ভাকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন। পৌরাণিক সাহিত্যে এরূপ স্থলে শাপাভিনয়ের অর্থ কি? আর্য্যসাহিত্যে অপ্সরাগণের এরূপ অভিশাপের রহস্য কি? পুরূরবার প্রতি আসক্তা হইয়া উর্ব্বশী নিজেও একদা অভিশপ্ত হইয়াছিলেন কেন?

পৌরাণিক সাহিত্যে স্বর্গ বলিয়া এক স্বতন্ত্র লোকের সৃষ্টি দেখা যায়। সে লোক অমর দেবগণের আবাস-স্থান। অমরলোকের সহিত মর্ত্ত্যলোকের স্বাতন্ত্র্য অবশ্যম্ভাবী। পুরাণ যখন সেই দেব-লোকের সৃষ্টি দেখাইয়াছে, তখন তাহাতে সেই অমরগণের লোক-সমাজের সর্ব্বাঙ্গ দেখাইতে হইয়াছে। যেখানে লোক-সমাজ আছে, সেখানে বেশ্যা থাকিবেই থাকিবে। নহিলে সমাজের অঙ্গহানি হয়। কিন্তু সমাজের সেই অবশ্যম্ভাবী অঙ্গের সম্ভাবনা দেখাইলেও সেই বেশ্যাগণ মর্ত্ত্যলোকের বেশ্যার মত সামান্যা বেশ্যা নহেন। তাঁহারা

দেববেশ্যা—দেব-সেবিকা—দেবগণের আনন্দদায়িনী অপ্সরাগণ। তন্ত্র-শাস্ত্রেও দেখিতে পাই, বেশ্যা-শব্দের অর্থ দেব-সেবিকা। দেব-মন্দিরেই তাঁহাদিগের অবস্থান এবং দেবকার্য্যের অনুষ্ঠানাদির আয়োজন, তৈজসপাত্রাদির পরিমার্জ্জন এবং মন্দিরাদি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করিয়া রাখা তাঁহাদিগের ব্যবসা ও বৃত্তি। এই কার্য্য ও ব্যবসার জন্য সমাজে যে শ্রেণীর লোক আবশ্যক, বেশ্যাগণ সমাজের সেই শ্রেণীর লোক ও দেবমন্দির-পরিচারিকা। মর্ত্ত্যলোকের সামাজিক ব্যবস্থা এই যে, সেইরূপ দেবপরিচর্য্যা দ্বারা সর্ব্বদা দেবসঙ্গ এবং সাধুসঙ্গ লাভ করিয়া, দেবকার্য্যের অনুষ্ঠানাদি দেখিয়া এবং সেই অনুষ্ঠানে ব্যাপৃতা থাকিয়া তাহারা দেবভক্তি লাভপূর্ব্বক ক্রমে সাধু পুণ্যপথে প্রতিষ্ঠিতা হইয়া ধর্ম্মলাভে সমর্থা হইতে পারে। মর্ত্ত্যলোকে বেশ্যাগণের কার্য্য যদি দেবপরিচর্য্যা হয়, তবে নিজ দেব-লোকেও যে তদ্রূপ হইবে, এ কথা ত পড়িয়াই রহিয়াছে। সুতরাং স্বর্বেশ্যাগণ অমরলোকেও দেবপরিচারিকা। তাই পুরাণে দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্নরী ও অপ্সরাগণ স্বর্গে দেবগণের আনন্দবিধানার্থ সতত নৃত্যগীতে প্রবৃত্ত হইয়া দেবসেবা করিয়া থাকেন এবং সুরপতি ইন্দ্রের আদেশ বহন করিয়া সর্ব্বদা তাঁহার মনস্তুষ্টি-সাধন করেন। ইন্দ্রের আদেশে তাঁহারা যাজ্ঞিক ও তপস্বিগণের মন-পরীক্ষার্থ মর্ত্ত্য-ধামে প্রেরিতা হয়েন। সেখান, যতদিন পর্য্যন্ত না চিত্তশুদ্ধি ও সংযম লাভ হয়, ততদিন পর্য্যন্ত যজ্ঞফল ও তপস্যাসিদ্ধি হয় না। যজ্ঞের বা তপস্যার উদ্দেশ্য যাঁহাদের সিদ্ধ হয় নাই, যাঁহারা ভাণ-যাজ্ঞিক বা ভাণ-তপস্বী, তাঁহারা দেবেন্দ্রের এই সূক্ষ্ম দৈব পরীক্ষা দ্বারা ধরা পড়েন। পাপের এই দৈব সূক্ষ্ম পরীক্ষা করেন—দেব-নিয়োজিতা স্বর্বেশ্যাগণ। স্বর্বেশ্যার আর এক অর্থ দাঁড়াইতেছে—

পাপ-মলিনতার দৈব সূক্ষ্ম পরীক্ষাকারিণী শক্তি। এই স্বর্গীয় সূক্ষ্ম শক্তি দ্বারা চিরকালই এই মর্ত্ত্যধামে কপট বা অসিদ্ধ তপস্বী ও যাজ্ঞিকগণ পরীক্ষিত হইয়া আসিতেছেন।

আর এক কারণেও এই বেশ্যাগণ ভূতলে প্রেরিতা হইতেন। যখন যখন কোন অসামান্য পুরুষোৎপত্তির আবশ্যকতা হইত, তখন তখন সেইরূপ পুরুষের জন্মের জন্য এই বেশ্যাগণ ভূতলে মুনি ও তপস্বিগণের নিকট প্রেরিতা হইতেন। সেইরূপ বিশ্বামিত্র ও মেনকার মিলনে শকুন্তলার উদ্ভব হইতে ভরতের উদ্ভব হইয়াছিল। ভূতলের সহিত দেবশক্তি-সম্পন্ন স্বর্গলোকের এইপ্রকার সম্বন্ধ রাখিবার নিমিত্ত এইরূপ বন্ধনের সৃষ্টি। সেই বন্ধন এই স্বর্বেশ্যাগণ দিয়া থাকেন। তাঁহারা দেবতার কার্য্য-সাধনার্থ আবির্ভূতা হন। নরলোকের সহিত তাঁহাদের মিলন কোন কার্য্যবিশেষ-সাধনার্থ এক দিনের বা এক মাসের বা দুই মাসের জন্য। তাঁহারা কাম-পরতন্ত্রা নহেন। কামপরতন্ত্রা হইলে এরূপ ঘটিত না। যতদিন না কামের চরিতার্থতা সিদ্ধ হয়, ততদিন পর্য্যন্ত সেই প্রবল রিপুর পরাক্রম দেখা যাইত। কিন্তু অপ্সরাগণের বাসনা একবার সংসর্গমাত্রেই চরিতার্থ হইত।

এই অপ্সরাগণ আবার সর্ব্বপ্রকার তপস্বী ও ইন্দ্রিয়-সংযমীর পরীক্ষা করিতেন। একদা ইন্দ্র স্বীয় পুত্র অর্জ্জুনের সংযম-পরীক্ষার্থ, তিনি কতদূর স্বর্গলাভের জন্য প্রস্তুত হইয়াছিলেন, তাহাই দেখিবার নিমিত্ত তাঁহার সমীপে একটী ছল করিয়া উর্ব্বশীকে পাঠাইয়াছিলেন। পুরাণ দেখাইল, যথার্থ ইন্দ্রের অংশে অর্জ্জুনের জন্ম বটে। তাঁহার সংযমশিক্ষা দেবোপম। তিনি যথার্থই স্বর্গের উপযুক্ত পাত্র—শ্রীকৃষ্ণের সখা হইবার যোগ্যতা লাভ করিয়াছেন।

তাই অর্জ্জুন ধীরভাবে উর্ব্বশীকে মাতৃ-সম্বোধনে প্রত্যাখ্যান করিলেন। উর্ব্বশী পরাস্ত হইল। পরাভব জন্য কোপাবিষ্টা হইয়া তাঁহাকে অভিসম্পাত করিলেন। কিন্তু ইহা প্রকৃত পক্ষে অভিসম্পাত নহে, দেবশক্তিলাভ—যে দেবোপযোগিনী সংযমী শক্তি-বলে তিনি এক বৎসরকাল মৌনাবলম্বন করিয়া ক্লীবের ন্যায় কালযাপন করিয়াছিলেন। তত বড় বীর্য্যবান্ অর্জ্জুন ক্লীবত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন বলিয়াই ছদ্মবেশে কাল কাটাইতে পারিয়াছিলেন। এই সংযম-বল যে অর্জ্জুনের ছিল, উর্ব্বশী তাহারই পরীক্ষা করিয়াছিলেন এবং এই দেবকার্য্য সিদ্ধ করিবার নিমিত্ত ইন্দ্রালয়ে অর্জ্জুনসমীপে উর্ব্বশীর উদয় এবং অভিশাপ। এ কথা অর্জ্জুন বুঝেন নাই। কিন্তু এক বৎসরের নিমিত্ত যে অর্জ্জুনের বীর্য্য হরণ করা আবশ্যক, সে কথা দেবগণের ঈশ্বর ইন্দ্র জানিতেন। জানিয়া, উর্ব্বশী দ্বারা অর্জ্জুনকে অভিশপ্ত করিলেন। পুরাণ এইরূপে সূক্ষ্ম দেবকার্য্যের স্থূল অবয়ব দেখান।

অষ্টাবক্রের অভিশাপও তদ্রূপ সূক্ষ্ম দেবকার্য্যের স্থূল অবয়ব। শিব-অংশে দেবলের জন্ম, যেমন ইন্দ্রের অংশে অর্জ্জুনের জন্ম। রাধিকার বরে দেবল অতি রূপবান্ পুরুষ হইয়াছিলেন, এত রূপবান্ ও সুন্দর যে, রম্ভা তাঁহার রূপে মুগ্ধা হইয়াছিলেন। দেবল সেই রূপগর্ব্বে কিছু গর্ব্বিত; তজ্জন্য সহস্র বৎসর তপস্যা করিয়াও সিদ্ধ হইতে পারেন নাই। সিদ্ধ হইতে পারেন নাই বলিয়া তিনি দেবদয়া লাভ করিলেন। তাই তাঁহার নিকট অপ্সরা রম্ভা প্রেরিতা হইলেন। মুনিবর রম্ভার প্রার্থনায় সম্মত না হওয়াতে রম্ভা তাঁহাকে অভিসম্পাত করিয়া বলিলেন—"তুমি উপযাচিকা কন্যাকে প্রত্যাখ্যান করিলে, তন্নিমিত্ত তুমি পূর্ব্ব-সঞ্চিত তপোবল হইতে পরিভ্রষ্ট

হইবে। তোমার এ মনোহর রূপ কুৎসিত কদাকারে পরিণত হইয়া অষ্টস্থানে বক্রতা প্রাপ্ত হইবে।"

যেমন অভিশাপ, অমনি তাহার ফল ফলিয়া গেল। যেরূপে হউক, দেবলের অষ্ট স্থানে বক্রতা হইল। তজ্জন্য রূপাভিমান অপগত হওয়াতে দেবলের নূতন তপ আরব্ধ হইল। এ তপ নিরভিমান তপস্যা। ব্রাহ্মণ তখন দেহের শোভা ভুলিয়া গিয়া অন্তরের শোভা-সম্পাদনে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। এই অন্তঃ-সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি-সাধনাই অষ্টাবক্রের নূতন যোগসাধনা। সুতরাং রম্ভার অভিশাপ ত অভিশাপ নহে, তাহা দেবগণের আশীর্ব্বাদ, যেমন আশীর্ব্বাদ অর্জ্জুনের প্রতি উর্ব্বশীর অভিশাপ। অপ্সরাগণ এইরূপ দেবগণের দৌত্যকার্য্যে ব্রতী ছিলেন। অভিশাপছলে তাঁহারা অভিশপ্ত জনগণে দেবশক্তির সঞ্চার করিয়া দিতেন। কিন্তু ইহাঁদের মধ্যে একটি নিগূঢ় কথা নিহিত আছে। তাঁহারা যে পর-পুরুষ-সংসর্গ করিতেন, তাহাতে কি পাপস্পর্শ নাই?

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি, এই অপ্সরাগণ স্বর্গরাজ্যের সৃষ্টি। স্বর্গলোক যদি সম্ভাবিত হয়, তবে সেই পবিত্র লোকের অধিবাসিগণ দেবসম পবিত্র। তাঁহাদের গাত্রে পাপ স্পর্শ করিবে কেন? লোকের অঙ্গস্পর্শ করিলেই কি পাপ হয়? গীতা শিক্ষা দিয়াছেন, আসক্তিতেই পাপ-পুণ্য নির্ভর করে। যেখানে যেরূপ আসক্তি, সেইখানে সেইরূপ ধর্ম্মাধর্ম্ম। দেখুন, ভ্রাতা, ভগিনী, পিতা, মাতা, চিকিৎসক—সকলেই সুন্দরী ললনার গাত্রস্পর্শ করিয়া থাকে, কিন্তু তাহাদের কাহারই তাহার প্রতি কু-আসক্তি নাই বলিয়া তাহাদের গাত্রস্পর্শে কোন পাপ নাই। কিন্তু যাহার কামাসক্তি আছে, তাহার অঙ্গস্পর্শে সতী কি আপনাকে কলঙ্কিতা জ্ঞান করেন না? আমি

একটী সুন্দরী নারী দেখিয়া যে মুগ্ধ হইব, ইহা আশ্চর্য্য নহে, পাপও নহে। যেহেতু, তাহা রূপের সহিত চক্ষের স্বাভাবিক সম্বন্ধ-জনিত ফল। সে ফল না ঘটাই অস্বাভাবিক। তবে পাপ কিসে হয়? মনে কর, আমি একটী গোলাপ ফুল দেখিলাম। সেই ফুল দেখা অবধি তৎপ্রতি যদি আসক্তি জন্মে, তবে সেই আসক্তিতেই পাপ-পুণ্য নির্ভর করিতেছে। সে যদি পরের গাছের ফুল হয় এবং আমি সেই আসক্তি-হেতু তাহা চুরি করিয়া আনিয়া সম্ভোগ করি, তবেই সেই আসক্তি-হেতু আমার পাপ। কিন্তু সেই গোলাপ যদি আমার বাগানের ফুল হয়, এবং আমি সেই ফুল কেবল পূজার্থ চয়ন করি, তবে সেই আসক্তিতে কি আমার পুণ্যসঞ্চার হয় না? তদ্রূপ পুরুষ বা স্ত্রী-সম্ভোগ। আমরা পুরাণে দেখিতে পাই, বলি-রাজ, অন্ধমুনির ঔরসে নিজ মহিষীর গর্ভে, একদিন মাত্র সংসর্গ-বশতঃ অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ প্রভৃতি পুত্রোৎপাদন করিয়া লইয়াছিলেন। এই সংসর্গে কি অন্ধমুনি ও রাজমহিষীর কিছু কামাসক্তি ছিল? না, কুন্তী ও সূর্য্য-সমাগমে কাহারই আসক্তি ছিল? যদি আসক্তি না থাকে, তবে পাপ-পুণ্য কোথায়? অপ্সরাগণের সংসর্গ এইরূপ আসক্তি-রহিত সংসর্গ। তাঁহারা সবাই দেবদূতী। দেবতার দৌত্যকার্য্য জন্য কিয়ৎকালের নিমিত্ত আসক্তিহীন সংসর্গ করিতেন।

এইরূপ আসক্তিহীন কর্ম্ম, কেবল দেবোদ্দেশে কৃত হওয়াতে দেবলোকবাসিনী স্বর্বেশ্যাগণেই শোভা পায়। কারণ, সেইরূপ কর্ম্মই সাত্ত্বিক কর্ম্ম। সেরূপ সাত্ত্বিক কর্ম্মই পাপপুণ্য-রহিত। গীতা বলিয়াছেন :—

"নিয়তং সঙ্গরহিতমরাগদ্বেষতঃ কৃতম্।
অফলপ্রেপ্সুনা কর্ম্ম যত্তৎ সাত্ত্বিকমুচ্যতে॥" ১৮।২৩

যে কর্ম্ম নিত্য অনুষ্ঠেয়, যে কর্ম্ম আসক্তিবর্জ্জিত, যে কর্ম্ম অনুরাগ বা দ্বেষ বশতঃ কৃত না হয়, কেবল মাত্র কর্ত্তব্যবোধে কৃত হয়, এবং যে ফলকামনা-রহিত পুরুষ কর্ত্তৃক সম্পাদিত হয়, সেই কর্ম্মকে সাত্ত্বিক বলিয়া জানিবে।

সেবক যেমন প্রভুর আদেশে প্রভুর কার্য্য করিয়া থাকে, সেই সেই সকল কার্য্য তাহার নিজের কার্য্য বলিয়াও ভাবে না এবং তাহার ফল-প্রত্যাশাও করে না, কেবল মাত্র দেবোদ্দেশে কর্ত্তব্য-বোধে কৃত হয়, সেই সাত্ত্বিক কার্য্যে পাপও নাই, পুণ্যও নাই। যেহেতু, তাহাতে কর্ম্মকর্ত্তার নিজ কর্ত্তৃত্বজ্ঞান কিছুই নাই। স্বর্বেশ্যা-গণ কেবল এইরূপ কর্ম্মে ব্যাপৃত হইতেন। রম্ভা এবং উর্ব্বশী সেইরূপ কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়া দেবলের এবং অর্জ্জুনের ধর্ম্ম পরীক্ষার্থ আসিয়াছিলেন। আসিয়া তাঁহারা যে অভিশাপ দিয়াছিলেন, তদ্দ্বারা দেবল এবং অর্জ্জুন আরও তপস্যাবল লাভ করিতে পারিয়া ছিলেম।

স্বর্গে পাপ এবং পাপাসক্তির অধিকার নাই। তাই অপ্সরাগণ যতদিন নির্ম্মল-চরিত্র থাকিতেন, ততদিন স্বর্গে তাঁহারা অবস্থান করিতে পারিতেন। যেই মাত্র কাহারও চরিত্রে পাপস্পর্শ হইত, অমনি তিনি স্বর্গচ্যুত হইতেন। মর্ত্ত্যে পাপের ফলভোগ না হইলে সে পাপের ক্ষয় হয় না। এজন্য আমরা দেখিতে পাই, উর্ব্বশী যখন পুরূরবার প্রতি কামাসক্ত হইয়াছিলেন, তখন তিনি স্বর্গচ্যুত হইয়া মর্ত্ত্যে সেই পাপাসক্তির ফলভোগার্থ শাপগ্রস্তা হইয়াছিলেন। যতদিন না তাঁহার পাপক্ষয় হইয়াছিল, ততদিন তিনি স্বর্গধামে স্থান প্রাপ্ত হন নাই। কালিদাসের "বিক্রমোর্ব্বশী" নাটক এ কথা সপ্রমাণ করিতেছে—আসক্তিই পাপ-পুণ্যের হেতু। কর্ম্ম-ভোগে পাপসক্তি পরিবর্জ্জিত হইলেই পাপ ক্ষীণ হয়। পাপমুক্ত

হইয়াই উর্ব্বশীর শাপান্ত হইয়াছিল; শাপান্তে যেই মায়ামুক্ত হইলেন, অমনি পুরূরবাকে পরিত্যাগ করিয়া স্বর্গধামে চলিয়া গেলেন। তবেই দেখা যাইতেছে, পুরাণে আমরা যে অভিশাপের এত ছড়াছড়ি দেখিতে পাই, তাহা কখন মনুষ্যপ্রোক্ত, কখন দেবরাজ্যের অমানুষ বেশ্যাগণের কঠোর উক্তি। বর যেমন সাক্ষাৎ দেবগণের উক্তি, অভিশাপ তেমন নহে। তাহা হইলে কি রক্ষা ছিল? এই জন্যই শাস্ত্রে দেবগণের অভিশাপ নাই; কিন্তু বর আছে। কারণ, দেবগণের মনোবেদনা হইতে পারে না; কিন্তু কৃপা হইতে পারে। অভিশাপে দেবগণ মানুষ এবং এই স্বর্বেশ্যা দ্বারা কার্য্য করেন; কিন্তু ইহার ফলাফল বড়ই সুন্দর। কি মানবোক্তি কি স্বর্বেশ্যাবাণী, উভয়ই অভিশাপকারীর মনোবেদনার ফল বটে, কিন্তু ঐ দেববেশ্যাগণের ঠিক মনোবেদনা নহে; তাহা মনোবেদনার ভাণ মাত্র। তদ্রূপ ছল করিয়া তাঁহারা অভিশাপ দিতেন। তাঁহাদের বাণী পাকতঃ দেববাণী মাত্র। সেই বাণী দ্বারা তপস্বিগণ আরও দেবশক্তি-সম্পন্ন হইয়া সংযম-পথে অধিকতর তপোবল ও ধর্ম্মলাভ করিতেন। কিন্তু মানব-প্রোক্ত অভিশাপের প্রকৃতি অন্যরূপ। তাহা পাপকে উজ্জ্বল করিয়া পাপীর নিকট দেখাইয়া দেয়। দেখাইয়া দেয়, কোন পাপই উপেক্ষণীয় নহে; কারণ, সর্ব্ববিধ পাপই ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইয়া পাপীকে অধোগামী করিতে থাকে। অভিশাপ পাপীর চেতনা জন্মাইয়া দেয়; যদি তাহাতে পাপীর চেতনা না হয়, সে যদি অভিশাপ তুচ্ছ করিয়া যায়, তাহাতে অভিশাপকারীর তত ক্ষতি বৃদ্ধি নাই, যত ক্ষতি সেই পাপীর নিজের। সে যদি চেতনা লাভ করিয়া পাপপথ হইতে বিরত হইতে পারে, তবেই ভাল; সেই অভিশাপের

ফলভোগ হয়। নহিলে পাপী অভিশাপ অবহেলা করিয়া বরাবর পাপ-পথে অগ্রসর হইতে থাকে, অগ্রসর হইয়া ক্রমে আপনার পাপের ফলভোগ করিতে থাকে; তখন তাহার মনে হয়, এত দিনে সেই অভিশাপের ফল ফলিল। তখন সে যে শাস্তি ও দুঃখ পায়, মনে করে, এ দুঃখ ও শাস্তিভোগ আপনারই কৃতকর্ম্মের ফল; ইহাতে ভগবানের কোন দোষ নাই। আমি আপনার শাস্তি আপনিই আনিয়াছি। আপনিই যে দুষ্কর্ম্ম করিয়াছিলাম, তাহারই ফল এতদিনে ফলিল; বিধাতার অলঙ্ঘ্য নিয়মে কেহই পাপ করিয়া নিস্তার পাইতে পারে না। অভিশাপ পাপীকে এইরূপে মনে মনে শাসন করে, ও চেতনা দিয়া দেয়। তাহা শুধু পাপীর শাসন নহে, তাহা পুণ্যপথের প্রারম্ভ ও উত্তেজনশক্তি। অতএব, হিন্দুর মনে এই অভিশাপভয় সর্ব্বদা জাগরূক বলিয়া হিন্দু আপনার দোষ ও পাপভোগ আপনার ঘাড়েই ফেলে এবং বিধাতাকে নির্দ্দোষ, নিষ্কলঙ্ক ও পরম মঙ্গলময় রূপে সন্দর্শন করিয়া পুণ্যপথে অগ্রসর হইতে থাকে। তাই অভিশাপভয় জাগরূক রাখিবার নিমিত্ত আর্য্যসাহিত্যের সর্ব্বত্রই সেই অভিশাপের এত প্রাচুর্য্য লক্ষিত হয়। সেই অভিশাপের ফলশ্রুতি কি সুন্দর! কি মধুর!

নাটকাভিনয়।

অভিনয়-ফল।

ইতিহাসবেত্তা ডো সাহেব তাঁহার ভারতবর্ষীয় ইতিবৃত্তে বলেন:—

নগরমধ্যে যখন এই সমস্ত ব্যাপার সংঘটিত হইতেছিল, তখন দিল্লীর দ্বারনিচয় অবরুদ্ধ ছিল। সুতরাং কিয়দ্দিবস-মধ্যে দিল্লীতে অন্নকষ্ট উপস্থিত হইল, দিন দিন ক্রমে সহস্র লোক দুর্ভিক্ষের করাল কবলে পতিত হইতে লাগিল। নাদির-সা নগরবাসিগণের আর্ত্তনাদে বধির হইলেন। কিন্তু মানবসমাজের সকল দুঃখেরই সীমা আছে; দারুণ দুর্ঘটনা-মধ্য হইতেও অচিরাৎ এমত এক বিষয়ের অভ্যুদয় হয়, যাহাতে সকল কষ্ট নিবারিত হয়। সেই বিষম দুর্ভিক্ষ-সময়ে "টুকী"-নামক তাৎকালিক কোন সুপ্রসিদ্ধ কুশীলবের সদাশয়তা ও অনুকম্পা না হইলে দিল্লীবাসিগণ একে একে সকলেই কালগ্রাসে নিপতিত হইত। টুকী, নাদির সার সমক্ষে আদেশক্রমে কোন নাটকের সুন্দর অভিনয় দেখাইলেন। নাদির-সা সেই অভিনয়-দর্শনে পরম পরিতুষ্ট হইয়া অভিনেতাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন—তুমি অভিরুচি-মত আত্মপুরস্কার প্রার্থনা কর। টুকীর হৃদয় তখন জনসমাজের দুঃখে ক্রন্দন করিতেছিল। তিনি প্রণিপাত-পূর্ব্বক কহিলেন,—রাজন্! যদি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, অনুমতি করুন, দিল্লীর সিংহদ্বার বিমুক্ত হয়, তাহা হইলে শত সহস্র লোকের প্রাণরক্ষা হইবে। তদীয় প্রার্থনানুসারে অনতিবিলম্বে দিল্লীর দ্বারনিচয় বিমুক্ত হইল। অমনি জনস্রোত তদ্দিকে প্রবাহিত হইয়া নিকটস্থ জনপদমধ্যে প্রবেশ করিল। অনতিদীর্ঘকাল-মধ্যে নগরের অন্নকষ্ট বিদূরিত হইল।

সহস্র লোকের একদা প্রাণরক্ষা করা সকল অভিনেতার ভাগ্যে না ঘটুক, অভিনেতৃগণ মনে করিলে যে দুর্ভিক্ষ অপেক্ষাও

সামাজিক গুরুতর অনিষ্টের প্রতীকার করিতে পারেন, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

আজকাল যাত্রার পরিবর্ত্তে নাটকাভিনয়ের প্রমোদে উন্নত বঙ্গীয় সমাজকে অধিকতর আকৃষ্ট দেখা যায়। ইহাতে বিলক্ষণ প্রতীতি হইতেছে, সেই সমাজের রুচি কিয়ৎ পরিমাণে মার্জ্জিত হইয়াছে। বাঙ্গালী, ইন্দ্রিয়সুখের স্থানে মানসিক সুখের রসাস্বাদন করিতে শিখিতেছেন। এজন্য বঙ্গসমাজে একটি নূতন ব্যবসায়ের দ্বার উন্মুক্ত হইতেছে। যাত্রাওয়ালাদিগের পরিবর্ত্তে অভিনেতৃদলের উদয় হইতেছে। এই অভিনেতৃগণ ব্যবসায়ী হউন, যাত্রাওয়ালাদিগের অপেক্ষা ইহাঁদিগের কার্য্য অতি গুরুতর। জনসমাজের হৃদয় ও মনের সহিত ইহাঁদিগের সম্বন্ধ, সেই সমাজের কেবল প্রমোদ উৎপাদন করাই ইহাঁদিগের কার্য্য নহে। যে অভিনেতৃদল কেবল জনসমাজের প্রমোদ উৎপাদনের দিকেই লক্ষ্য রাখেন, তাঁহারা স্বকীয় ব্যবসায়ের গুরুত্ব বুঝেন না, এজন্য এ কার্য্যের ভার গ্রহণ করা তাঁহাদিগের কর্ত্তব্য নহে। যখন অভিনেতৃদল ব্যবসায়ী হইয়া পড়েন এবং কেবল অর্থলোভী হয়েন, তখন তাঁহাদিগের হস্তে এই গুরুতর কার্য্যের ভার সুসম্পন্ন হওয়া সুকঠিন। অভিনেতৃদল সুশিক্ষিত, মার্জ্জিতরুচি এবং নিতান্ত সাবধান না হইলে তাঁহাদিগের ব্যবসায় বিশুদ্ধ ও সুন্দরভাবে কখনই চলিতে পারে না। ক্রমে ক্রমে এ বিষয় অধিকতর প্রতিপন্ন হইবে।

সাহিত্যসংসারে নাটকীয় সাহিত্যের যে একটি বিশেষ ধর্ম্ম আছে, অন্য কোন সাহিত্যের সে ধর্ম্ম নাই। নাটকীয় সাহিত্য, সমাজমধ্যে যেমন আলোচিত হয়, এমত আর কোন সাহিত্য হয় না।

অন্যান্য সাহিত্যে গ্রন্থকারের সহিত পাঠকের সাক্ষাৎ সম্বন্ধ। অন্যান্য সাহিত্যে যে পরিমাণে পাঠকের সংখ্যাবৃদ্ধি হইবে, সেই পরিমাণে তাহার আলোচনা হইবার সম্ভাবনা। সে স্থলে গ্রন্থকার সুস্থিরভাবে ধীরে ধীরে পাঠকের সহিত সম্ভাষণ করেন। তদ্দ্বারা যতদূর কার্য্য হয়, সেই পর্য্যন্তই শেষ। কিন্তু নাটকীয় সাহিত্যে কেবল অধ্যয়নে শেষ হয় না। সেই অধীত বিষয়ের অভিনয় করিতে পারিলে জনসমাজকে কিরূপ বিচালিত, উৎসাহিত এবং প্রমোদিত করা যায়, তাহা দেখিবার ইচ্ছা জন্মে। এই জন্য অভিনেতৃগণের সৃষ্টি। এই জন্য নাটকীয় সাহিত্যে গ্রন্থকার এবং সাধারণ সমাজের মধ্যবর্ত্তী আর একটী লোকশ্রেণীর আবশ্যকতা হয়। ইহাঁরা গ্রন্থকারের ভাব ও কবিত্ব সম্যক্‌রূপে প্রকটন করেন এবং প্রকৃত অভিনয় দ্বারা গ্রন্থপ্রতিপাদ্য বিষয়ের যতদূর ফলাফল প্রত্যাশা করা যাইতে পারে, তদুৎপাদনে সচেষ্ট হয়েন। নাটকীয় সাহিত্য যখন সমাজমধ্যে এতদূর আলোচিত হয়; যখন তদ্দ্বারা সমগ্র জনসমাজ বিচালিত, উৎসাহিত, আকৃষ্ট এবং প্রমোদিত হয়; তখন সেই সাহিত্য কেবল জনসমাজের সাহিত্যমধ্যে গণনীয় এমত নহে, তাহা জনসমাজকে পরিচালন এবং প্রণোদন করিবার পক্ষে প্রধান সাধন বলিয়া ধর্ত্তব্য করিতে হইবে। অতএব সেই সাহিত্যের গুরুত্বাভিমান যে অধিকতর, তাহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। অভিনেতৃগণ এই সন্ধিস্থলে সংস্থাপিত হইয়া সকল সময় কি আপনাদিগের অবস্থার গুরুত্ব বুঝিতে পারেন? অনেক দল জানেন না, তাঁহাদিগের প্রকৃত অবস্থা ও কর্ত্তব্য কি? যাঁহারা এই কর্ত্তব্য এবং অবস্থার গুরুত্ব সম্যক্ উপলব্ধ করিতে পারেন, তাঁহারাই উদ্দেশ্যলাভে কিয়ৎ পরিমাণে কৃতকার্য্য

হইতে পারেন। অভিনেতৃগণ এই সন্ধিস্থলে পরিস্থাপিত হইয়াছেন বলিয়া তাঁহাদিগের উপর সাধারণ সর্ব্বজনেরই দৃষ্টি রহিয়াছে। নাটককার স্বকীয় কল্পনা ও কবিত্বের সম্যক্ পরিচয় এবং বিক্ষারণের জন্য অভিনেতৃসমাজের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া রহিয়াছেন। সাধারণ জনগণ অভিনেতৃ-সমাজের রুচি ও তাঁহাদিগের আশা ও প্রবৃত্তি যাহাতে সন্মার্গে পরিচালিত ও নিয়মিত হয়, তজ্জন্য তাঁহাদিগের প্রতি একদৃষ্টে চাহিয়া রহিয়াছেন। তাঁহারা অভিনেতৃগণের উপর স্বর্ণবর্ষণ করিতেছেন; কিন্তু অভিনেতৃসমাজ হইতে যাহা ফিরিয়া চান, তাহা রাশি রাশি স্বর্ণে প্রদান করিতে পারে না। সাধারণের রুচি যদি কোন পক্ষে দূষিত হইয়া থাকে, সামাজিক নীতির যদি অবনতি হইয়া থাকে, প্রবৃত্তি যদি কলুষিত হইয়া থাকে, আশা যদি নীচগামিনী হইয়া থাকে, দেশের আচার-ব্যবহারের যদি সংস্কার আবশ্যক হইয়া থাকে, তবে আমোদ-সহকারে, অলক্ষ্যভাবে এবং ধীরে ধীরে সেই রুচি, নীতি, প্রবৃত্তি এবং আচার-ব্যবহারের উন্নতি সাধন করা অভিনেতৃসমাজের কর্ত্তব্য। শুধু ইহাই নহে, তাঁহারা সমুদয় জনসাধারণকে মানবীয় দুঃখে দুঃখী করেন; সমস্ত জনসমাজকে মানবজাতির ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে আবদ্ধ করেন; মানবপ্রকৃতির উচ্চতর শক্তি ও ক্ষমতা প্রদর্শন করিয়া প্রতিপন্ন করেন যে, মানবজাতির অভ্যন্তরে দেবশক্তি নিহিত আছে; তাঁহারা পৃথিবী হইতে মানবের চক্ষু স্বর্গের দিকে লইয়া যান; তখন মানব আপন দেবভাব উপলব্ধি করেন; তখন মানব একদা জীবনের উচ্চ অধিকার ও উদ্দেশ্যের প্রতি লক্ষ্য করেন; একবার অনন্তের প্রতি তাঁহার দৃষ্টি পড়ে; ভাবেন, জীবনের সার্থকতা লাভের জন্য এবং মানবনামের গৌরব স্থাপন

জন্য, ঐহিক সকল যন্ত্রণা এবং দুঃখভোগও শ্রেয়স্কর। যখন অভিনেতৃগণ দর্শক ও শ্রোতৃবর্গের নয়ন হইতে অশ্রুধারা আকর্ষণ করিতে থাকেন, তখন কি আর একবার সেই দর্শকমণ্ডলী মিত্রতা এবং ভ্রাতৃসম্বন্ধ-সূত্রে আবদ্ধ হয়েন না? অভিনেতৃগণ যখন মানবহৃদয়কে নানা ভাববেগে সঞ্চালিত করিতে পারেন, তখন তাঁহাদিগের হস্তে কি প্রভূত শক্তি ন্যস্ত নাই? এই শক্তির সদ্ব্যবহার এবং কুব্যবহারের উপর অভিনেতৃসমাজের দায়িত্ব ও প্রয়োজনসিদ্ধি কি নির্ভর করিতেছে না? সময়ে সময়ে এই শক্তির কুব্যবহারজনিত কুফল নিবারণের জন্য রাজশাসনেরও আবশ্যকতা হইয়াছিল। গ্রীস এবং ইংলণ্ডের ইতিবৃত্ত তাহা প্রতিপাদিত করিয়া দেয়।

জনসমাজের উপর যখন অভিনেতৃমণ্ডলীর এতদূর প্রভাব, জনসমাজের সহিত তাঁহাদিগের যখন এত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ, তখন সেই সমাজরূপ গ্রন্থ বিশেষরূপে অধ্যয়ন করিয়া তাহাদের দোষ-গুণ, রুচি-প্রবৃত্তি ও অবস্থা সম্যক্‌রূপে আলোচনা করিয়া দেখা তাঁহাদিগের নিতান্ত কর্ত্তব্য। কিন্তু এত গুরুতর বিষয় যে অভিনেতৃদলের সকলেই সুসম্পন্ন করিয়া উঠেন, এমত কখনই প্রত্যাশা করা যায় না। এই গুরুতর ভার যাঁহাদিগের উপর ন্যস্ত আছে, তাঁহারা যদি সকলেই নিতান্ত অর্ব্বাচীন ও কর্ত্তব্যজ্ঞান-বিরহিত হন, তাহা হইলে নাটকাভিনয় হইতে জনসমাজে যে কিরূপ গরলময় ফল উৎপন্ন হয়, তাহা অনায়াসে অনুমিত হইতে পারে। যাঁহারা অভিনেতৃবর্গের নেতৃত্বভার গ্রহণ করিবেন, অন্যূন তাঁহারা সুবিজ্ঞ ও কর্ত্তব্যজ্ঞানসম্পন্ন না হইলে সে অভিনেতৃমণ্ডলী দ্বারা যে রঙ্গভূমি পরিস্থাপিত হইবে, সে রঙ্গভূমির কলুষিত আমোদ

ও অভিনয়াদি কেবল অমঙ্গলই প্রসব করিতে থাকিবে। জন-সমাজমধ্যে যাহাতে এরূপ রঙ্গভূমি প্রতিষ্ঠিত না হয়, তাহা করাই কর্ত্তব্য। কারণ, তদ্দ্বারা সমাজের ইষ্ট-সাধন হওয়া দূরে থাক, বরং তরুণ-বয়স্কগণকে কেবল দূষিত আমোদ প্রমোদে এবং ক্রমশঃ পাপপথে প্রবৃত্ত করিতে থাকিবে। সে রঙ্গভূমি যাহাতে ত্বরায় উৎসন্ন হইয়া যায়, তাহার চেষ্টা করা জনসমাজের নিতান্ত কর্ত্তব্য।

কিন্তু যে চারণবর্গের নেতৃগণ কর্ত্তব্যবিমূঢ় নহেন, যাঁহারা স্বকীয় কার্য্যভারের গৌরব বিলক্ষণ অবগত আছেন, তাঁহাদিগের দ্বারা যে রঙ্গভূমি প্রতিষ্ঠিত হয়, সে রঙ্গভূমি কেবল পরম পরি-শুদ্ধ আমোদের স্থান নহে, তাহা সর্ব্বজনেরই শিক্ষা ও উপদেশের স্থান। রঙ্গভূমির নেতৃবর্গ সমাজের প্রবৃত্তি ও অভিরুচি পর্য্যা-লোচনা করিয়া যেপ্রকার নাটকের অভিনয় করেন, তাঁহাদিগের প্রকৃতি ও ধাতু বুঝিয়া নাটককারগণ নাটক প্রণয়ন করিতে উদ্যত হইবেন, রঙ্গভূমিতে উপস্থিত হইয়া সমাজের রুচি শিক্ষা করিয়া যাইবেন, এবং সেই শিক্ষাভূমির উপর নাটকের কবিত্ব ও কল্পনা সংস্থাপিত করিবেন। কি গ্রন্থকার, কি সাধারণ জনগণ, উভয় শ্রেণীর লোকমণ্ডলীকে পরিচালিত, প্রমোদিত এবং নিয়মিত করা রঙ্গভূমির কার্য্য। যে উভয়সঙ্কট সন্ধিস্থলে রঙ্গভূমির নেতৃগণ অবস্থিত, তাহা তাঁহাদিগের অগ্রে হৃদয়ঙ্গম হওয়া অত্যাবশ্যক। তৎপরে সেই হৃদ্বোধের সহিত আপনাদিগের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য অবধারণ করিয়া লওয়া উচিত।

গ্রন্থ-নির্ব্বাচন।

অভিনেতৃগণের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য অবধারণ করিতে হইলে, দেখা উচিত, অভিনয় কার্য্যের উদ্দেশ্য কি? নাটক-রচনার যে উদ্দেশ্য,

নাটকীয় অভিনয়েরও সেই উদ্দেশ্য। মানব-মনে নাটকের ফল-শ্রুতি উৎপাদন করাই ইহাদিগের উদ্দেশ্য। যে নাটক অধ্যয়ন করিলে মানবমনে কোনরূপ সংস্কার বা ফল চিরমুদ্রিত হইয়া না যায়, সে নাটক বৃথায় রচিত হইয়াছে। সে নাটকের কিছুই কবিত্ব নাই। অভিজ্ঞানশকুন্তল-পাঠে কাহার হৃদয়ে না সাধ্বী শকুন্তলার চরিত্র চির অঙ্কিত হইয়া যায়? উত্তররামচরিতের সীতা ও রামচন্দ্রের চিত্র কাহার না হৃদয়ে চিরকালের জন্য সেই নাটক-অধ্যয়নের ফল-স্বরূপ অঙ্কিত হইয়া রহিয়াছে? এইরূপ ফলশ্রুতি উদ্দীপন করা যখন নাটক-অধ্যয়নের ফলস্বরূপ প্রতীয়-মান হইতেছে, তখন সেই উদ্দীপনাকে অধিকতর প্রবল করা অবশ্য অভিনয়ের প্রয়োজন বলিয়া গণনা করিতে হইবে। যদ্দ্বারা দর্শক-গণের মনে কোন একটি ভাব উদ্দীপিত হয়, কোন সংস্কার বদ্ধমূল হইয়া যায় এবং কোন চিত্র উজ্জ্বলরূপে অঙ্কিত হইয়া যায়, তাহাই বাস্তবিক নাটকাভিনয়ের ফল। যে নাটকাভিনয়ের পরিণামে হৃদয়ে কোন সংস্কার উদিত না হয়, সে স্থলে হয় নাটকের, না হয় অভিনয়ের ত্রুটি অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। এজন্য অনেক সময় দেখিতে পাওয়া যায় যে, অভিনেতৃগণ প্রয়োজন সিদ্ধ হইল না বলিয়া গ্রন্থকারকে অপরাধী করিতেছেন, অথবা অভিনয়ের ত্রুটি হইয়াছে বলিয়া গ্রন্থকার অভিনেতৃগণের উপর সমস্ত দোষা-রোপ করিতেছেন। কোন স্থানে অন্যতর পক্ষের, কোন স্থানে বা উভয় পক্ষেরই ত্রুটি পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। অতএব গ্রন্থের দোষে যেমন অভিনয় বিনষ্ট হয়, তদ্রূপ অভিনয়ের দোষে সুগ্রন্থও কলঙ্কিত হইতে পারে। এজন্য অভিনয়ের ফলাফল, কি গ্রন্থ কি অভিনয়, উভয়েরই উপর নির্ভর করিতেছে। সুতরাং সুগ্রন্থ-

নির্ব্বাচন করিয়া অভিনয় করা অভিনেতৃগণের একটি প্রধান কর্ত্তব্য বলিয়া প্রতীতি হইতেছে।

সুগ্রন্থ-নির্ব্বাচন করা বড় সহজ ব্যাপার নহে। ইহাতে অভিনেতৃগণের বিলক্ষণ বিচারশক্তির আবশ্যকতা হয়। দেশ, কাল, পাত্র বিবেচনা করিয়া গ্রন্থের নির্ব্বাচন করা আবশ্যক। নহিলে, উৎকৃষ্ট গ্রন্থ হইলেও তাহার অভিনয়ে কোন ফলোদয় হয় না। অনেক নাটক আবার এরূপ আছে, যাহার আদ্যোপান্ত সকল স্থানই নির্দ্দোষ, অথচ অভিনয়ের শেষে কোন ফলোদয় হয় না, অথবা অশুভ ফলের উদয় হয়। কোন কোন গ্রন্থের দুই এক স্থল পরিত্যাগ করিতে হয়, এবং দুই এক স্থান পরিবর্দ্ধিতও করিতে হয়। এই কার্য্যে অভিনেতৃগণের যেপ্রকার বিচক্ষণতা আবশ্যক হয়, তাহা অনায়াসেই অনুমান করা যাইতে পারে। যাঁহাদিগের নিজে নাটক রচনা করিবার শক্তি আছে, যাঁহারা সুবিজ্ঞতার সহিত নাটকের গুণাগুণ বিচার করিতে পারেন, এরূপ ব্যক্তি ভিন্ন অভিনয়যোগ্য গ্রন্থ অন্য কেহ নির্ব্বাচন করিয়া উঠিতে পারেন না। অতএব সুপাত্র বিবেচনা করিয়া তবে, অভিনয়ের অধ্যক্ষতার ভার তাঁহার হস্তে সমর্পণ করা বিধেয়। পূর্ব্বকালে গ্রীস এবং ইংলণ্ডে নাটকাভিনয়ের সুখ্যাতি ছিল কেন? তখন নিজে গ্রন্থকারগণ অভিনয় শিক্ষা দিবার ভার গ্রহণ করিতেন। তখন নাটককারগণও অভিনয়ের আবশ্যকীয় নানা বিদ্যায় ভূষিত থাকাতে সেই কার্য্যভারের উপযোগী হইতেন। এক্ষণে গ্রন্থকারগণকে তদ্রূপ নানা বিদ্যায় পারদর্শী দেখা যায় না, সুতরাং অভিনয়ের অধ্যক্ষতার উপযোগী হইতে পারেন না। যাহা হউক, এই অধ্যক্ষতার গুরুতর কার্য্যভার যে একজন সুপণ্ডিত ও বিচক্ষণ ব্যক্তির

হস্তে সমর্পিত থাকা নিতান্ত আবশ্যক, তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই।

সুগ্রন্থ নির্ব্বাচিত হইলে, অভিনয়ের গুণাগুণের উপর তাহার ফলাফল সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে। নাটকের যথাযথ অভিনয় করা অভিনেতৃগণের সুপ্রধান কর্ত্তব্য। কারণ, যথাযথ অভিনয় না হইলে অভিনয়ের প্রয়োজনসিদ্ধির সম্ভাবনা নাই। এক্ষণে অভিনয়ের গুণাগুণ নির্দ্দিষ্ট করিতে পারিলে তবে প্রকৃত অভিনয় কি পদার্থ, তাহা স্থির করা যাইতে পারে।

নাট্যবিভ্রম।

অপ্রকৃত বিষয়কে প্রকৃত ও প্রত্যক্ষবৎ প্রতীয়মান করাকে অভিনয় কহে। অভিনয় দ্বারা দর্শকমণ্ডলীর মনে এপ্রকার ভ্রান্তি উৎপাদন করা চাই, যেন প্রত্যক্ষীভূত সমস্ত বিষয় প্রকৃত প্রস্তাবে সংঘটিত হইয়া যাইতেছে। উৎকৃষ্ট অভিনয়ের গুণ এই যে, তাহার কৃত্রিমতার অনুভব হয় না। কৃত্রিমতার অনুভব হইলেই আর ভ্রান্তি থাকে না। ভ্রান্তি বিনষ্ট হইলেই সমস্ত ইন্দ্রজাল বিনষ্ট হয়। দর্শকমণ্ডলীকে এই ইন্দ্রজালে বিমুগ্ধ করাকে নাট্যবিভ্রম কহে। যে পরিমাণে এই নাট্যবিভ্রম উৎপাদিত হইবে, সেই পরিমাণে অভিনয়ের গুণাগুণ প্রতিপাদিত হইবে। যেখানে নাট্যবিভ্রম সম্পূর্ণ, সেখানে অভিনয়ও সর্ব্বাঙ্গসুন্দর। যেখানে নাট্যবিভ্রম অসম্পূর্ণ, সেখানে অভিনয়ের সকল অঙ্গ উৎকৃষ্ট হয় নাই। অতএব, নাট্যবিভ্রমই নাটকাভিনয় পরীক্ষা করিবার প্রধান সাধন। কিন্তু এই নাট্যবিভ্রম কিরূপে উৎপাদিত হয়, তাহা বিচার করা কর্ত্তব্য।

অভিনেতৃগণ অভিনয়-কার্য্য সুসম্পন্ন করিলে, দর্শকবর্গের মনে নাট্যবিভ্রম উৎপাদিত হয়। একদিকে অভিনয়, অন্যদিকে দর্শকগণের চিত্তভাব ও প্রবৃত্তি, এই উভয় বিষয়ের উপরেই নাট্য-বিভ্রম নির্ভর করিতেছে। অপ্রকৃত বিষয় প্রকৃতবৎ প্রতীয়মান হইলেও তাহা সম্পূর্ণরূপে প্রকৃত হইতে পারে না; তাহাতে এমত ত্রুটি সকল অবলক্ষিত হইবে, যাহাতে অপ্রকৃত পদার্থকে প্রকৃত পদার্থ হইতে প্রভেদ করিয়া দিবে। অতএব দর্শকগণকে অনেক স্থলে কল্পনা-শক্তির প্রয়োগ করিতে হইবে। দর্শকমণ্ডলীর কল্পনা-শক্তি যে পরিমাণে কার্য্য করিবে, সেই পরিমাণে কৃত্রিম পদার্থকে প্রকৃত বলিয়া উপলব্ধি হইতে থাকিবে। যে পরিমাণে অনুমানের ত্রুটি হইবে, সেই পরিমাণে কৃত্রিমতা প্রতীত হইবে। আবার প্রকৃতিবিশুদ্ধ উৎকৃষ্ট এবং অভিনয়োপযোগী নাটক নির্ব্বাচিত না হইলে, যথাযথ অভিনয় হইলেও সকল সময় নাট্যবিভ্রম ঘটে না। এমত স্থলে দর্শকমণ্ডলী যে পরিমাণে প্রকৃতির সহিত পরি-চিত আছেন, সেই পরিমাণে ভ্রান্তি উৎপাদিত হইবে। প্রকৃতি যাঁহারা ভাল বুঝেন, তাঁহাদিগের নিকট অপ্রাকৃতিক বিষয়ের যথাযথ অভিনয় হইলেও নাট্যবিভ্রম জন্মে না। এজন্য দর্শকমণ্ডলী অপেক্ষা অভিনেতৃগণের অধিকতর প্রকৃতির সহিত পরিচিত থাকা আবশ্যক। অভিনয়রূপ পরীক্ষায় নাটক প্রক্ষিপ্ত হইলে, তবে নাটকের গুণাগুণ উজ্জ্বলরূপে প্রতীয়মান হয়। কিন্তু প্রকাশ্য অভিনয়ের পূর্ব্বে, অভিনীত নাটকের দোষ-সমূহ পরিত্যক্ত না হইলে অভিনয়-কালে বড় বিরক্তি ধরে। যে যে স্থলে প্রকৃতি-ভঙ্গ হইয়াছে, অভিনেতৃগণের সে সকল স্থল প্রাকৃতিক করিয়া লওয়া উচিত। কিন্তু তা বলিয়া বাস্তবিক প্রকৃতি-বিশুদ্ধ স্থানকে

বিকৃত করা নিতান্ত অকর্ত্তব্য। অনেক অভিনেতাকে সেরূপ করিতেও দেখা যায়। অনেকে নাটককে এরূপ বিকৃত আকারে অভিনয় করেন যে, তাহাতে গ্রন্থকে নিতান্ত অপমানিত করা হয় এবং সুতরাং অভিনয়ের প্রতি অশ্রদ্ধা জন্মে। সুবি-খ্যাত গ্যারিক্ ইংলণ্ডীয় নাট্যসমাজের অধ্যক্ষতা গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে, শেক্সপিয়ারের নাটক-সমূহ বিকৃত আকারে অভিনীত হইত। গ্যারিকের সময়াবধি শেক্সপিয়ার-কৃত নাটকবৃন্দের সমগ্র রচনার অভিনয় আরব্ধ হইয়াছে। গ্যারিক্, সেই জগদ্বিখ্যাত নাটককারকে এরূপ শ্রদ্ধা ও সম্মান করিতেন যে, তিনি তাঁহার নাটকের বিকৃতি-সাধনে ভীত হইতেন। শেক্সপিয়ারের গুণগ্রাহিতাই গ্যারিকের প্রধান গুণ ছিল। গুণগ্রাহী ছিলেন বলিয়া এবং মানব-প্রকৃতির ভাব বিলক্ষণ বুঝিতেন বলিয়াই গ্যারিক্ শেক্সপিয়ার-কৃত নাটকের যথাযথ অভিনয়কার্য্যে কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন। অতএব যে অভিনেতৃগণ, বাহ্য প্রকৃতি এবং মানব-প্রকৃতির ভাব বিলক্ষণ বুঝিতে পারেন, তাঁহারাই যথার্থ ভাবের সহিত অভিনয় করিতে পারেন। অন্যথা অভিনয়-কার্য্য সুসম্পন্ন হয় না।

দৃশ্যাভিনয়।

নাট্যবিভ্রম উৎপাদিত করিতে হইলে যথাযথ অভিনয় আবশ্যক। অভিনয়ের দুইটী প্রধান অঙ্গ দৃষ্ট হয়। কোন নাটকাভিনয় সন্দর্শন করিতে হইলে একদা এই দুই দিকেই দর্শকগণের দৃষ্টি পড়ে—দৃশ্য এবং কার্য্যাভিনয়। দৃশ্যপট, দূর হইতে রঙ্গভূমির বাহ্য দৃশ্য, অভিনেতৃগণের বেশভূষা, বয়স এবং জাতি প্রভৃতি কেবল চাক্ষুষ বিষয়-সমুদায় দৃশ্যাভিনয়ের বিচার্য্য। ভাবব্যঞ্জক অঙ্গ-ভঙ্গি এবং

কথাবার্ত্তা-প্রভৃতি কার্য্যাভিনয়ের বিষয়। এই দুই বিষয় এক্ষণে স্বতন্ত্রভাবে আলোচনা করা যাইতেছে।

প্রকৃতের সহিত অপ্রকৃতের সাদৃশ্য যত ঘনিষ্ঠ হইবে, দৃশ্যাভিনয় সেই পরিমাণে সম্পূর্ণ হইবে। দর্শকগণের মনে নাটক-সন্নিবেশিত ব্যক্তিবর্গের ভাব ও সংস্কার যেপ্রকার, অভিনেতৃগণ জাতিতে, বয়সে, আকারে, বেশভূষায় এবং কণ্ঠধ্বনিতে যতদূর সেই সংস্কারের নিকটবর্ত্তী হয়, ততদূর নাট্যবিভ্রম সঞ্জাত হয়। যে স্থান পরিদৃশ্য-মান করিতে হইবে, পরিপ্রেক্ষিত চিত্র দ্বারা সেই স্থানকে দূর হইতে যেন তদ্রূপ দেখায়; তজ্জন্য ত্রুটি হইলে নাট্যবিভ্রম বিনষ্ট হয়। অভিনেতৃগণেরও নিষ্ক্রমণ যথাদেশে সম্পন্ন হওয়া আবশ্যক। যথা-দেশ হইতে রঙ্গভূমিতে প্রবেশ করা এবং তথা হইতে নিষ্ক্রান্ত হওয়া দৃশ্যাভিনয়ের বিষয়; যে ভঙ্গিতে প্রবেশ এবং নিষ্ক্রমণ করা যায়, তাহা কার্য্যাভিনয়ের বিষয়। প্রত্যুত, কেবল দর্শনশক্তির যাবতীয় বিচার্য্য বিষয় দৃশ্যাভিনয়ের অধিকারভুক্ত। নাটক যখন অধ্যয়ন করা যায়, তখন দৃশ্যাভিনয়ের সমস্ত বিষয় কল্পনাস্থানীয় থাকে; কিন্তু সেই কল্পনাকে যখন বাহ্যাবয়বে পরিদৃশ্যমান করিতে হইবে, তখন তাহাকে যথাসাধ্য সেই কল্পনার অনুরূপ করিতে না পারিলে দৃশ্যাভিনয় তৃপ্তিকর হয় না, সুতরাং দৃশ্যাভিনয়জনিত আনন্দও অনুভূত হয় না।

কার্য্যাভিনয়।

দৃশ্যাভিনয় অপেক্ষা কার্য্যাভিনয় অতি গুরুতর ব্যাপার। নাটকীয় ব্যক্তিগণের চরিত্র এবং হৃদয়ভাব—কথাবার্ত্তা, অঙ্গবিলাস এবং ভাব-ভঙ্গিতে যথাযথ প্রকটন করা কার্য্যাভিনয়ের বিষয়। দৃশ্যাভিনয়ের ত্রুটি লোকে বরং কল্পনা দ্বারা কিয়ৎ পরিমাণে

সম্পূর্ণ করিয়া লইতে পারেন, কিন্তু কার্য্যাভিনয়ের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য করিয়া অভিনয় দর্শন করিতে আসেন। মানব আত্ম-বিষয়ে যেমন অনভিজ্ঞ, এমত আর কিছুতেই নহে। আত্মব্যতীত অপর যাবতীয় পদার্থ বিষয়ে মানবকে বিশেষ জ্ঞানী ও পরিচিত বোধ হয়। কিন্তু তিনি যখন আত্মপ্রকৃতি সম্বন্ধে কোন কল্পনা অথবা অনুমান করেন, সেই স্থানেই তাঁহার যত গোলযোগ ও প্রমাদ উপস্থিত হয়। বিভিন্ন অবস্থায় মানবপ্রকৃতি কিরূপ কার্য্য করে, মানবহৃদয় কিরূপ ভাব ধারণ করে, তাহা সাধারণ জনগণের নিকট প্রহেলিকাবৎ প্রতীয়মান হয়। মানব, অপর সকলই অনুকরণ করিতে পারেন, কিন্তু বিভিন্ন অবস্থায় আপনার ভাব যথাযথ অনুকরণ করিতে হইলেই তাঁহার বিপদ্ ঘটে। সকলে তাহা বুঝিয়া সম্পন্ন করিয়া উঠিতে পারেন না। আবার, অভিনয় যথাযথ হইলেও অনেক সময়ে দর্শকমণ্ডলী তাহা ঠিক্ বুঝিয়া উঠিতে পারেন না। বাস্তবিক, মানবের নিকট মানব নিজে একটি বিষম প্রহেলিকা। মানবপ্রকৃতির জটিল গ্রন্থি-সকল খণ্ডন ও আলুলায়িত করিতে অনেকে জানেন না। এই জন্য কার্য্যাভিনয়-দর্শনে সকলের প্রগাঢ় অভিনিবেশ জন্মে। কার্য্যাভিনয় যত স্বাভাবিক ও প্রকৃতিসঙ্গত বলিয়া অনুভূত হইতে থাকে, লোকের মনে তত আনন্দের উদয় হয়। কার্য্যাভিনয়ের সঙ্গে সঙ্গে দর্শকগণ নিজ অন্তরেই যেন সকলই অভিনয় করিয়া যাইতেছেন। কারণ, মানবের জন্য মানবের সহানুভূতি অতি প্রগাঢ়তর। এই সহানুভূতিসম্ভূত হইলে দর্শকগণ কল্পনাবলে নাটকের যাবতীয় অবস্থা ও ঘটনাবলী আত্মভাগ্য বলিয়া অনুমান করিয়া লয়েন। তখন আত্ম-আভ্যন্তরিক সেই কাল্পনিক অভিনয়ের সহিত রঙ্গভূমির

প্রত্যক্ষীভূত অভিনয়ের তুলনা করিতে থাকেন। যেখানে সাদৃশ্য উপলব্ধি হয়, সেই খানে আনন্দ। অন্যথা বিরক্তির উদয় হয়। অতএব, কার্য্যাভিনয়ের প্রশংসা ও গৌরব দর্শকগণের সহানুভূতি ও মানব-প্রকৃতি-বোধের উপর অনেকাংশে নির্ভর করিতেছে।

নাটকীয় ব্যক্তির চরিত্র এবং হৃদয়স্থ রাগাদির অভিনয়-ভেদে কার্য্যাভিনয়ের এই দ্বিবিধ অঙ্গ। এই দুই অঙ্গের অভিনয় স্বতন্ত্র নহে, একত্রই প্রদর্শিত হয়। অতএব ইহাদিগের ভেদ কেবল কাল্পনিক এবং বিচারের জন্য।

লোক-চরিত্রাভিনয়।

যে ব্যক্তির চরিত্র যাঁহাকে অভিনয় করিতে হইবে, তদ্বিষয় তাঁহার বিলক্ষণ আলোচনা করিয়া দেখা উচিত। নাটকের মধ্যে গ্রন্থকার সেই ব্যক্তিকে কি ভাবে সাজাইয়াছেন, সে ব্যক্তিকে কি প্রকার প্রকৃতি প্রদান করিয়াছেন, তিনি কি ধাতুর লোক, তাঁহার চরিত্রে একদা কি কি গুণের সমাবেশ আছে এবং কি কি দোষই বা বিমিশ্রিত আছে, এই সমস্ত বিষয় মনে মনে সম্যক্ পর্য্যালোচনা করিয়া নাটকীয় ব্যক্তির চরিত্রের অনুরূপ অনুমান ও কল্পনা করিয়া লওয়া অভিনেতার প্রধান কর্ত্তব্য। এই কর্ত্তব্য-সাধন জন্য তাঁহার নাটক-খানি আদ্যোপান্ত ভালরূপে অধ্যয়ন করা উচিত। অধ্যয়ন করিলে তিনি আরও দেখিতে পাইবেন, তাঁহার পাত্রের সহিত নাটকীয় অন্যান্য পাত্র ও পাত্রীর কিপ্রকার সম্বন্ধ। এই সম্বন্ধ জানা না থাকিলে, কোন্ পাত্রের সমক্ষে কি ভাব ধারণ করিতে হইবে, অভিনয়কালে তাহার ঠিক্ অভিনয় ঘটিয়া উঠে না।

কোন্ ব্যক্তি কিরূপ চরিত্রের লোক, তাহা নির্ণীত হইলেই যথেষ্ট হইল না; অভিনয়ের আদি অবধি শেষ পর্য্যন্ত সেই ব্যক্তির চরিত্র ঠিক্ রাখিয়া অভিনয় করা উচিত। অভিনয়-কালীন একই চরিত্রের যদি নানা স্থানে অসঙ্গতি ঘটে, তবে আর পাত্রকে বরাবর ঠিক্ রাখা হইল না। এপ্রকার চরিত্রভঙ্গ-দোষ কার্য্যাভিনয়ে নিতান্ত নিন্দনীয়। এজন্য, নাটকীয় ব্যক্তির চরিত্র কিরূপ, তাহা স্মরণ রাখিয়া সর্ব্বদা সাবধানে অভিনয় করা উচিত।

অভিনয়ে আত্ম-বিস্মৃতি।

এই চরিত্র-ভঙ্গ-দোষ, হয় অভিনেতার অনভিজ্ঞতা, না হয় তাঁহার আত্মবিস্মৃতি হইতে সমুৎপন্ন হয়। যিনি নাটকীয় পাত্রের চরিত্র ভাল বুঝিতে পারেন না, তাঁহার সে চরিত্র অভিনয় করা উচিত নহে। অনেকে মনে করেন, তাঁহারা একজনের চরিত্র ভাল বুঝিয়াছেন বলিয়া, নাটকীয় অন্যান্য ব্যক্তির চরিত্রও তদ্রূপ বুঝিতে পারেন। এজন্য না জানিয়া শুনিয়া, চরিত্রের কল্পনা ভালরূপে ঠিক্ না করিয়া সাহসপূর্ব্বক অজ্ঞাতকুলশীল জনের চরিত্র অভিনয় করিতে যান। সুতরাং অনভিজ্ঞতা-নিবন্ধন সর্ব্বস্থানে লোক-চরিত্র সুরক্ষিত করিতে পারেন না। আবার কেহ কেহ এক নাটকের মধ্যগত দুই বা ততোধিক ব্যক্তির চরিত্র অভিনয় করিতে যান, সুতরাং অনেক সময় এরূপ আত্মবিস্মৃতি ঘটে যে, কাহার কিপ্রকার চরিত্র, তাহা ঠিক্ রাখিয়া বরাবর অভিনয় করিয়া যাইতে পারেন না। এতদ্ব্যতীত চরিত্রভঙ্গদোষ অন্যপ্রকার আত্মবিস্মৃতি হইতেও সমুদ্ভূত হইতে দেখা যায়। অভিনেতা কখন কখন আপনাকে এতদূর ভুলিয়া থাকেন যে, আমি শ্রোতৃ-

বর্গের সমক্ষে অভিনয় করিতেছি, এবং অপরকে আমার অভিনয় প্রদর্শন করিতে আসিয়াছি, এরূপ জ্ঞান হয়; সেই একপ্রকার আত্মবিস্মৃতি। দর্শকমণ্ডলীকে অভিনয় দেখাইতে আসি নাই, কেবল স্বকার্য্য সাধন করিয়া যাইতেছি, এরূপ সংস্কার ও প্রতীতির সহিত অভিনয় না করিলে সকল সময় অভিনয়ের কার্য্যগুলি প্রকৃত, স্বাভাবিক, ও স্বাধীনভাবে প্রকটিত হয় না। অনেক সময়ে আপনাকে সলজ্জ জ্ঞান হয়, সুতরাং হস্তপদ সঙ্কুচিত হইয়া আইসে। কে যেন আমার কার্য্য দেখিতেছে, কি মনে করিতেছে, এই ভাবনায় অভিনয়কার্য্য যথেচ্ছ নির্ব্বাহিত হয় না। ভল্‌টেয়ার কোন নটীকে অভিনয় শিক্ষা দিতেছেন, এমত সময় নটী বলিল, "এরূপ করিলে লোকে আমাকে যে ভূতে পেয়েছে বলিবে।" ভল্‌টেয়ার উত্তর করিলেন—"যাহাতে তোমাকে লোকে যথার্থই ভূতে পেয়েছে বলে, তাহাই আমি চাই।" এই কথার মর্ম্ম স্মরণ রাখিয়া অভিনেতৃগণের রঙ্গভূমিতে প্রবেশ করা উচিত। আমরা অনেক অভিনেতাকে নাটকীয় স্বগত বাক্যাবলি এরূপ ভাবে উচ্চারণ করিতে দেখিয়াছি, যেন তাঁহারা শ্রোতৃবর্গকেই সম্বোধন করিয়া অভ্যস্ত-পাঠ আবৃত্তি করিতেছেন। তাই অনেক অভিনেতাকে দেখা যায়, তাঁহারা শ্রোতৃবর্গের মুখপানে চাহিয়া অভিনয় করিয়া যাইতেছেন। দর্শকমণ্ডলীর হাব-ভাব দেখিয়া শুনিয়া মনোভঙ্গহেতু অভিনয়ে ব্যাঘাত ঘটিবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা।

ভাবাভিনয়।

হৃদয়-ভাবের অভিনয়ই নাটকাভিনয়ের প্রধানতম অঙ্গ। মানবহৃদয়ের বিশাল রঙ্গভূমির অভিনয় প্রদর্শন করাই নাটকের

শ্য প্রধান উদ্দেশ্য। নাটকীয় ঘটনাবলিদ্বারা মানবহৃদয়ে ক্ষণে ক্ষণে যে নানাবিধ ভাবের অভ্যুদয় ও ব্যতিক্রম ঘটিতেছে, নাটকীয় ব্যক্তিগণ ভাবের আবেগ দ্বারা যেরূপ অভিভূত, বিচলিত অথবা প্রণোদিত হইতেছে; কখন শোক-তাপ, কখন হর্ষ-উৎফুল্লতা, কখন রাগ-দ্বেষ, কখন দর্প-অভিমান প্রভৃতি ভাবের আবেশ দ্বারা মানবহৃদয় হয় ত একেবারে মুহ্যমান হইয়া আছে, না হয় উদ্বোধিত এবং প্রমত্ত হইতেছে; এই সমস্ত ভাবের আবেশ প্রকৃতরূপে প্রকটন করা ভাবাভিনয়ের বিষয়। এক্ষণে এই ভাবাভিনয়ের প্রকৃতি ও অনুষ্ঠানাদির পর্য্যালোচনা করা যাইতেছে।

মানব যেপ্রকার অবস্থায় পতিত হয়েন, তাঁহার হৃদয়ে তদনুরূপ ভাবের আবির্ভাব হয়। ভাবের প্রাবল্য ও উদ্বেগ অনুসারে তাহা হৃদয়ে অধিক বা অল্পকাল স্থায়ী হয়। এই নিয়ম শুধু মানব-সাধারণে নয়, ইহা প্রাণিমাত্রেই অবলক্ষিত হয়। হর্ষ, বিষাদ, ভয়, সাহস প্রভৃতি ভাবাবেগ মানবের যেমন, নিকৃষ্ট প্রাণিগণেরও তেমনি। এই সমস্ত ভাব প্রকটনের পদ্ধতি সর্ব্বজাতিতে সমান। পণ্ডিতবর ডার্উইন্ সাহেব প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, যাবতীয় প্রাণিগণ একরূপেই ভাব-প্রকটন করিয়া থাকে। এজন্য তিনি একখানি স্বতন্ত্র গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন। সেই গ্রন্থে তিনি প্রদর্শন করিয়াছেন যে, সর্ব্বোচ্চ মানব জাতিতে যেপ্রকার অঙ্গসূচনা ও মুখভঙ্গি দ্বারা হৃদয়স্থ ক্রোধাদি ভাবসমূহ স্বতই প্রকটিত হয়, নিকৃষ্ট প্রাণিগণেও তদ্রূপ। হর্ষে, বিষাদে, ভয়ে, ক্রোধে, লজ্জায়, প্রেমে, বাৎসল্যে, ঘৃণায়, উৎসাহে, হিংসায় মানবের মুখে, চক্ষে, এবং সমগ্র অঙ্গভঙ্গিতে যে ভাব প্রকটিত দেখিবে, ইতর প্রাণিতেও সেই ভাব অবলক্ষিত হয়। ইতর প্রাণিগণও

ঐ সমস্ত ভাবে উদ্বোধিত ও উত্তেজিত হয় এবং তাহারাও একই-প্রকার অঙ্গ-সূচনা দ্বারা সে-সমস্ত ভাব প্রকাশ করিয়া থাকে। হর্ষে মানবমুখের যেপ্রকার বিস্ফারণ হয়, শোকে তাহা যেরূপ ম্লান হইয়া যায়, ত্রাসে তাহার শিরা-সকল যেমন সঙ্কুচিত হইয়া যায়, ইতর প্রাণিগণের মুখেও তদবস্থায় সেই সমস্ত ভাবেরই প্রকটন। বাস্তবিক, যাবতীয় হৃদয়ভাব-প্রকটনের পদ্ধতি একই। হৃদয়ভাব প্রকটন-সম্বন্ধে মানব-জাতি ইতর প্রাণিগণের সহিত এক নিয়মে আবদ্ধ। এ বিষয়ে সমস্ত প্রণীর একই ভাষা। বরং মানবের ভাষা এ বিষয়ে পরাস্ত হয়। কারণ, মানব-ভাষা হৃদয়-ভাবের অতি অল্পাংশই প্রকাশ করে। তদীয় মুখ-মণ্ডলে ও অঙ্গ-ভঙ্গিতে সেই ভাবের সমগ্র প্রচণ্ডতা, বল ও তেজ স্পষ্ট প্রকাশিত হয়। মানব যে ভাবে কথা কহুন না কেন, হৃদয়ের ভাবাবেগ দেখিতে হইলে, তাঁহার কথা শুনিতে যাই না, তাঁহার অঙ্গেই সমস্ত প্রকটিত দেখি। ভাব-প্রকাশ-সম্বন্ধে প্রকৃতি যখন একমাত্র ভাষায় কথা কহেন, তখন সেই প্রকৃতির ভাষা কিপ্রকার, তাহা পর্য্যা-লোচনা করিয়া দেখা অভিনেতৃগণের প্রধান কর্ত্তব্য। এই ভাষার নিয়মাদি তত্ত্ববিৎ ডার্উইন সাহেব যেপ্রকার অভিনিবেশের সহিত অধ্যয়ন ও পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছেন, তাহা তৎপ্রণীত গ্রন্থে বিলক্ষণ প্রতীত হয়। আমরা ডার্উইন সাহেবের এই গ্রন্থখানি সমগ্র নাট্যসমাজকে পড়িতে বলি। ডি ওরেটোর-নামক প্রস্তাবান্তে সিসিরো এই বিষয়ের কিঞ্চিৎ পর্য্যালোচনা করিয়াছেন, তাহাও দ্রষ্টব্য। *

---

* Vide Spectator Paper No. 541.

কিন্তু কেবল অধ্যয়নে এই ভাব-প্রকটনের পারগতা জন্মে না। অঙ্গ-ভঙ্গিতে ভাবের প্রকটন হওয়া প্রাকৃতিক ও স্বতঃসিদ্ধ। যে ভাবের বাহ্যসূচনা করিতে হইবে, হৃদয়ে সে ভাব সমুদ্ভূত হইলেই তাহা আপনা-আপনি প্রকাশিত হইয়া পড়ে। প্রকৃতিসমুদ্ভূত হৃদয়ভাবের বাহ্যবিকাশের বিপর্য্যয় ঘটাইতে হইলে বরং বিশেষ চেষ্টা ও ক্লেশ করিতে হয়, সহজে ঘটিয়া উঠে না। সহস্র চেষ্টা করিলেও স্বাভাবিক ভাব-বিকাশের সমস্ত চিহ্ন প্রচ্ছন্ন করা সুকঠিন হয়। হৃদয়ে ভাবের আবেগ হইলে তাহা অব্যবহিত কালে মুখমণ্ডলে প্রত্যক্ষীভূত হয়, একবার প্রত্যক্ষীভূত হইলে তাহার প্রত্যাহার করা কেবল বিড়ম্বনা মাত্র। সেই ভাব কিয়ৎপরিমাণে প্রকাশিত হইয়া পড়িবেই পড়িবে। নাটকীয় ব্যক্তিগণ এইপ্রকার অবস্থায় অনেক সময়ে পতিত হয়েন। যে ব্যক্তি প্রকৃত পক্ষে এই অবস্থায় অবস্থাপিত হয়েন, তিনি ভিন্ন এইপ্রকার ভাবের স্বাভাবিক অভিনয় প্রদর্শন করা অন্যের পক্ষে প্রায় অসাধ্য হয়। কারণ, ভাব-প্রকটন মাত্রই স্বাভাবিক ও স্বতঃসিদ্ধ। চেষ্টাকৃত করিতে গেলে তাহার প্রায় বিপর্য্যয় ঘটে। অঙ্গ-ভঙ্গিদ্বারা ভাবের অভিনয় যদি নিতান্ত বিকৃত ও চেষ্টাকৃত দেখায়, তাহা হাস্যজনক হইয়া পড়ে। নাটকীয় ভাবের প্রকৃত অভিনয় করা যে অত্যন্ত দুঃসাধ্য ব্যাপার, তাহার কারণ এই। প্রকৃতি ব্যতীত অন্য কেহ যাহা সাধন করিতে পারে না, অভিনেতাকে অনেক সময়ে তাহা চেষ্টা দ্বারা সাধন করিতে হইবে। অভিনেতা যদি নিজে প্রকৃতির বশবর্ত্তী হইতে পারেন, তিনি যদি পরপ্রকৃতিকে অভিনয়কালে কিয়ৎক্ষণের জন্য আত্ম-প্রকৃতি রূপে উপলব্ধি করিতে পারেন, তবেই তাহা সুসিদ্ধ হইবার সম্ভাবনা।

যে ব্যক্তি পরভাগ্যকে কল্পনাতে আত্মভাগ্য বলিয়া অচিরাৎ অনুমান করিয়া লইতে পারেন, যাঁহার হৃদয় ভাববিষয়ে এত ভঙ্গ-প্রবণ যে, কাল্পনিক বাহ্যবিষয় দ্বারাও সে হৃদয় অচিরাৎ বিচলিত এবং ব্যথিত হইতে পারে, এবংবিধ প্রকৃতির ব্যক্তি একদা ভাবাভিনয়ে কিয়ৎ-পরিমাণে সার্থকতা লাভ করিতে পারেন। কিন্তু যাঁহাদিগের কল্পনা তেজস্বিনী নহে; যাঁহাদিগের প্রকৃতি এত কঠোর যে, শীঘ্র বিচলিত হইবার নহে; যাঁহাদিগের হৃদয় এত দৃঢ় যে, কাল্পনিক বিষয় দ্বারা ত্বরায় তাহার বিকার জন্মে না, তাঁহারা অভিনয় কার্য্যের সম্যক্ উপযোগী নহেন। যাঁহাদিগের স্নায়ু-শক্তি কিঞ্চিৎ প্রবল, সহজে তাঁহাদিগের চিত্ত-বিকার উৎপাদিত হয়; সুতরাং তাঁহারাই ভাবাভিনয়-পক্ষে বিলক্ষণ উপযোগী।

কিন্তু যাঁহাদিগের স্নায়ু-শক্তি নিতান্ত প্রবল, নাটকীয় কল্পনা দ্বারা যাঁহাদিগের এতদূর চিত্তবিকার জন্মিতে পারে যে, সেই কল্পনা-সমুৎপাদিত প্রবল ভাবে একেবারে যেন প্রমত্ত হইয়া পড়েন, তাঁহারা অভিনয়ে ব্যাপৃত হইলে অনেক বিপদ্ ঘটিবার সম্ভাবনা। ততদূর প্রবল ভাব তাঁহাদিগের শারীরিক অবস্থার উপযোগী না হওয়াতে অবশেষে তাহাতেই তাঁহাদিগের প্রাণবিয়োগ হইয়াছে। কাল্পনিক বিয়ষকে তাঁহারা প্রকৃত বলিয়া প্রকৃষ্টরূপে উপলব্ধি করাতে এইপ্রকার বিপদ্ ঘটিয়াছিল। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, নাট্য-বিভ্রম নিতান্ত প্রবল হইলেও অভিনয়ে তাহার সম্পূর্ণতা হয় না। নানাপ্রকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ত্রুটি বশতঃ কল্পনাশক্তি তাহাতে সম্যক্-রূপে বিমুগ্ধ ও ব্যাপৃত হয় না। এরূপ হইবার সম্ভাবনা থাকিলে, ইউরোপীয় সাহিত্য-সাধারণ খুনান্ত নাটকের ভীষণ ব্যাপার ও পর্য্যবসান মানবীয় কল্পনার বিষম নিগ্রহ ও যন্ত্রণার বিষয়

হইত *। মানবীয় কল্পনাশক্তি সেই পর্ব্বতপ্রমাণ গুরুভারের প্রপীড়ন বহনে অক্ষম। যাঁহাদিগের কল্পনা নিতান্ত প্রবল, যাঁহাদিগের শারীরিক প্রকৃতি এপ্রকার যে, সামান্য ঘটনার প্রভাবে অনায়াসে চিত্তবিকার উৎপাদিত হয়, সেই প্রবল স্নায়ুশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিগণ যদি কখন খুনান্ত নাটকের অভিনয়কার্য্যে বিনিযুক্ত হন, তাহা হইলে তাঁহাদিগের প্রাণবিয়োগ হইবার অনেক সম্ভাবনা। আইস্যাক্ ডিস্‌রেলী এবংবিধ প্রাণবিয়োগের কতিপয় অদ্ভুত দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিয়াছেন †। ফরাশী অভিনেতা মণ্টফুরী যখন র‍্যাসীন-প্রণীত ওরিষ্টিশ-নাটকীয় এণ্ড্রোম্যাকীর চরিত্র ও হৃদয়ভাব অভিনয় করিতেছিলেন, তখন তাঁহার সেই অভিনয়-প্রয়োজনীয় অঙ্গচেষ্টায় প্রাণবিয়োগ হয়। মস্তরী, বণ্ড প্রভৃতি কতিপয় প্রসিদ্ধ কুশীলবগণের নামও উল্লিখিত হইয়াছে।

নীরব অভিনয়।

পূর্ব্বেই পরিব্যক্ত হইয়াছে যে, মানবীয় হৃদয়ভাব অধিকাংশ অঙ্গভঙ্গি ও মুখস্ফূর্ত্তিতে প্রকটিত হয়। মানবহৃদয়ের গভীরতম ও নিগূঢ়তম ভাবসমূহ বাক্যে প্রকাশিত হইবার নহে। সেসমস্ত বাক্যাতীত। উচ্চতর নাটকশ্রেণীতে এইপ্রকার ভাবের অনেক দৃশ্য সংরচিত হয়। এইপ্রকার ভাবের অভিনয় নিতান্ত দুঃসাধ্য। তাহা কেবল অঙ্গ-বিলাসে প্রকাশ করিতে হয়। তাহার সঙ্গে বাক্যের সংশ্রব নাই। নীরবে ইহার অভিনয় হইয়া যায়। এজন্য, ইহাকে নীরব অভিনয় বলিলেও বলা যাইতে পারে। শকুন্তলা

* Vide Schlegel's Dramatic Literature Lec. XVII.

† Vide Curiosities of Literature on Tragic Actors.

যখন লতামণ্ডপে প্রিয়দর্শন দুষ্মন্তের সমক্ষে অবস্থিত, তখন তাঁহার যেরূপ ভাবোদয় হইয়াছিল, তাহা কি তিনি বাক্যে প্রকাশ করিয়াছিলেন? সেই সকল পূর্ব্বানুরাগচিহ্ন রাজা দুষ্মন্ত লক্ষ্য করিয়া শকুন্তলার মন বেশ বুঝিতে পারিয়াছিলেন (৯৮ পৃষ্ঠা দেখ)। লতামণ্ডপ হইতে যাইবার সময় যখন, কুরুবক-শাখায় বল্কল সংলগ্ন হইয়া গিয়াছে—এই ছল করিয়া শকুন্তলা দুষ্মন্তকে ফিরিয়া ফিরিয়া দেখিতেছিলেন, তখনকার ভাব কি কথায় প্রকাশিত হয়? সীতাদেবীকে বনবাসে লইয়া গিয়া দেবর লক্ষ্মণ তাঁহাকে যখন সেই নিদারুণ সংবাদ বিজ্ঞাপন করিলেন, তৎক্ষণাৎ সীতাদেবীর যে চিত্তবিকার জন্মিয়াছিল, তাহা বাক্যে প্রকটন করিতে যাওয়া বিড়ম্বনা মাত্র। যাহা হউক, এই নীরব অভিনয়ের একটী দৃষ্টান্তস্থল আমরা নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম।

পারস্য-রাজ্য-বিজয়কালে মহোদয় আলেকজাণ্ডার-ভূপতি ভয়ানক জ্বররোগে আক্রান্ত হয়েন। তৎকালে তাঁহার মনে দিগ্বিজয়বাসনা আত্যন্তিক প্রবল থাকাতে ত্বরায় আরোগ্যলাভের জন্য নিতান্ত অধীর হইলেন। এ দিকে পারস্যরাজ ডেরায়স উপযুক্ত অবসর লাভ করিয়াছেন ভাবিয়া, শয্যাগত শত্রুর নিধন-চেষ্টায় ব্যস্ত হইলেন। আলেকজাণ্ডারকে বিষ-প্রয়োগ করিবার জন্য তিনি বিপুল অর্থের প্রলোভন দেখাইয়া তদীয় মিত্রগণকে হস্তগত করিবার চেষ্টা দেখিতে লাগিলেন। রাজবৈদ্য ফিলিপ্‌স্ দিনত্রয়ের মধ্যে উপযুক্ত ঔষধ প্রয়োগ-দ্বারা আরোগ্যবিধান করিবেন—এরূপ প্রতিশ্রুত হইয়া ঔষধ প্রস্তুত করিতে লাগিলেন। এমত সময় আলেকজাণ্ডার কোন মিত্রের নিকট হইতে পত্র পাইলেন যে, ডেরায়স-কর্ত্তৃক নিযুক্ত হইয়া ফিলিপ্‌স্ তাঁহাকে ঔষধ বলিয়া

বিষদান করিবেন। আলেকজাণ্ডার পত্র পাইবা মাত্র শিহরিয়া উঠিলেন। কিন্তু তৎপরে স্থির চিত্তে ভাবিয়া দেখিলেন যে, রাজ-বৈদ্য কখন অবিশ্বাস-ভাজন নহেন। তিনি মনে করিলেন, রাজ-বৈদ্যকে অবিশ্বাস করা অপেক্ষা তাঁহার হস্তে প্রাণত্যাগ করাও শ্রেয়স্কর।

অবধারিত দিনে ঔষধ-হস্তে ফিলিপ্স্ উপস্থিত হইলেন। আশা-বিলসিত প্রসন্ন মুখে রাজবৈদ্য আলেকজাণ্ডারের সম্মুখে উপবিষ্ট হইলেন। আলেকজাণ্ডার সসম্ভ্রমে শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া বসিলেন। তাঁহাদিগের চারি চক্ষু একত্র মিলিত হইল। তখন বীরবর রাজবৈদ্যকে পত্রখানি দিয়া তাঁহার নিকট ঔষধ-গ্রহণানন্তর তৎক্ষণাৎ তাহা সেবন করিলেন। ফিলিপ্স্ ঔৎসুক্য-সহকারে যেমন পত্র পাঠ করিতে যাইবেন, অমনি চমকিত হইয়া গেলেন। পত্রপাঠ-সময়ে আলেকজাণ্ডার রাজবৈদ্যের মুখপানে একদা দৃষ্টিপাত করিলেন। দেখিলেন, ফিলিপ্সের মুখমণ্ডলে একদা ঘৃণা, রাগ—উভয়ই প্রজ্বলিত হইতেছিল। ফিলিপ্স্ আস্তে আস্তে পত্র রাখিলেন। কিয়ৎক্ষণ নীরব হইয়া রহিলেন। তাঁহার হৃদয়ে ও মুখমণ্ডলে সহস্র ভাব উদিত হইতেছিল। তৎপরে তিনি কহিলেন "মহাশয়! এ বিষয় আমি কিছুমাত্র না জানিয়া ঔষধ প্রস্তুত করিয়াছি। তাহা আপনিও সেবন করিয়াছেন। কিন্তু আপনার যেপ্রকার সঙ্কটসময় এবং আমার হস্তে আপনার প্রাণ যতদূর নির্ভর করিতেছে, এমত আর কখন ঘটে নাই। এ প্রকার ঘটনায় আমি তত আশ্চর্য্য হই নাই, কিন্তু আপনার বিশ্বাস এবং ঔদার্য্য দেখিয়া আমি অধিকতর আশ্চর্য্য হইয়াছি।" আলেক্জাণ্ডার কহিলেন, "এপ্রকার ঘটনায় যে, আপনার প্রতি আমার বিশ্বাসের পরিচয়

হইবে, আমার এমত ইচ্ছা ছিল না। আপনাকে যেরূপ অপ্রস্তুত দেখিতেছি, এক্ষণে ত্বরায় আমি প্রতিকার লাভ করি, এই আমার নিতান্ত বাসনা হইতেছে।"

এই দৃশ্যে বাক্য দ্বারা অভিনয় করিবার অতি অল্পভাগই আছে। ইহার অধিকাংশই নীরবে অভিনয় করিতে হইবে। বাস্তবিক, মানব-হৃদয়ের অধিকাংশ ভাবই অপ্রকাশিত থাকে। হৃদয়ের যন্ত্রণা, আনন্দ, উৎসাহ, আশা, নৈরাশ্য, লজ্জা, ভয়, কৃতজ্ঞতা প্রভৃতি কোন ভাবেরই সম্যক্ বাহ্যবিকাশ হইবার উপায় নাই। ভাষা, মুখ-ভঙ্গি, এবং অঙ্গচালনা দ্বারা তাহাদিগের যে অংশ বাহিরে প্রকাশিত হয়, তাহা নিতান্ত অসম্পূর্ণ। হৃদয়-ভাবের প্রাবল্য ও গভীরতা প্রকাশ করিতে হইলে অপরের নিকট আত্ম-অবস্থার সমুদায় প্রকাশ করিয়া তাহার সহানুভূতি উৎপাদন করিতে হয়। অপরে যখন পরকীয় অবস্থার সমুদায় ভাব উপলব্ধি করিতে পারে, তখন তাহার সহানুভূতি জন্মে এবং যে পরিমাণে সহানুভূতি উৎপাদিত হয়, সেই পরিমাণে পরকীয় হৃদয়ভাব বুঝিতে পারে। যে নাটকীয় দৃশ্য এইপ্রকার সহানুভূতি উৎপাদন করিবার বিশেষ উপযোগী, তাহার অভিনয়ে দর্শকগণের মনে বিশিষ্টরূপে ভাবোৎপাদন করাও যাইতে পারে। যে নাটক এইপ্রকার দৃশ্যনিচয়ে পরিপূর্ণ, তাহারই কল্পনা অতি উৎকৃষ্ট এবং সেই নাটকই উত্তমরূপে অভিনীত হইতে পারে। এই প্রকার নাটক নির্ব্বাচন করিয়া অভিনয় করিতে পারিলে অভিনেতৃগণ অল্পায়াসে কৃতকার্য্যতা লাভ করিতে পারেন।

মানবের হৃদয়ভাব যে অল্প পরিমাণে প্রকাশিত হয়, সকল সময়, এবং সকল অবস্থায় তাহাও আবার প্রকাশ করিবার যোগ্য বলিয়া

গণনীয় হয় না। মানবহৃদয়ে যে সমস্ত ভাব যখন সমুদিত হয়, তাহা যদি সকল প্রকাশ করা যায়, তাহা হইলে নিতান্ত অর্ব্বাচীন ও নির্ব্বোধের কার্য্য করা হয়। হৃদয়-ভাবের অধিকাংশ অপ্রকাশিত ও গোপনে রাখিতে হয়। কেবল ক্ষোভের বিষয় এই, যাহা প্রকাশ করিবার উপযোগী, তাহা সম্যক্ রূপে প্রকাশিত হয় না। নহিলে, একসঙ্গে মানব-হৃদয়ে যতপ্রকার মিশ্রিত ভাব উদিত হয়, তাহার কি সকল ভাব প্রকাশ করিবার উপযুক্ত বলিয়া গণনা করা যাইতে পারে? আবার হৃদয়ে হয় ত একপ্রকার ভাবের উদয় হইল, বাহিরে প্রকাশ করিবার সময় তাহাকে অনুরঞ্জিত করিয়া অন্যবিধ আকারে প্রকটন করা আবশ্যক বোধ হয়। মানবের ভাষা অনেক সময়ে হৃদয়-ভাব গোপন করিবার জন্যই প্রযুক্ত হয়। টালিরাণ্ড কহিয়া গিয়াছেন, মানবীয় ভাষা ভাব প্রকাশের জন্য যত না ব্যবহৃত হয়, তাহা গোপন করিবার জন্যই অধিকতর ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

কিন্তু ভাষা হৃদয়-ভাব প্রকাশ করিতে যেমন পরাস্ত, গোপন করিতেও তেমনি অসমর্থ। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, হৃদয়ভাব গোপন করিতে গেলেও তাহার কিয়দংশ বাহিরে প্রকটিত হইয়া পড়ে। প্রকটিত না হইলেও অবস্থা, ঘটনা এবং লোকপ্রকৃতি বোধ থাকিলে অপরের হৃদয়ভাব অনেকাংশে অনুমান করিয়া লওয়াও যাইতে পারে। প্রকাশযোগ্য হৃদয়ভাব প্রকাশ করা যেমন অভিনেতার গুরুতর কার্য্য, অপ্রকাশযোগ্য হৃদয়ভাব যাহাতে পরের নিকট ব্যক্ত না হইয়া পড়ে, এরূপে অভিনয়-কার্য্য সম্পাদন করাও তাঁহার ততদূর আবশ্যক। এজন্য আবার অনেক সময়ে অভিনেতার পক্ষে কেবল হৃদয়ভাব গোপন করিলে যথেষ্ট হয় না; ঘটনা, অবস্থা

এবং আত্ম-প্রকৃতিও গোপন করিতে হয়। কৌশলপূর্ব্বক সাবধানে অভিনয়কার্য্য সম্পাদন করিতে না পারিলে, বাহিরে যাহা গোপন করিবার চেষ্টা করা যায়, অনেক সময় তাহার হয় ত কিছু কিছু প্রকাশ হইয়া যাইতেছে, দর্শকমণ্ডলীর এমত অনুভব হইতে পারে।

আর একপ্রকার হৃদয়-ভাবও নীরবে অভিনীত হয় এবং তাহা অভিনয় করাও সুসাধ্য নহে। নাটকে এমত অনেক সংস্থান বিন্যস্ত হয়, যথায় হৃদয়ভাব অবস্থান্তরে অকস্মাৎ পরিবর্ত্তিত হয়। আনন্দ ও উৎসব-সময়ে হয় ত কোন দুঃসংবাদ উপস্থিত হইয়া হৃদয়-ভাব একেবারে বিপরীত দিকে প্রত্যাবর্ত্তিত করিয়া দিল, পাপানুষ্ঠান-সময়ে কেহ হয় ত হঠাৎ ধৃত হইয়া নিতান্ত অপ্রস্তুত ও লজ্জায় পতিত হইল। এইপ্রকার নাটকীয় সংস্থানে অভিনয় করা বড় সহজ নহে; এখানে বাক্যের প্রয়োজন নাই, অঙ্গ-চালনার প্রয়োজন নাই; কেবল নীরবে এরূপে স্তম্ভিত হওয়া চাই যে, দর্শকমণ্ডলী যেন ঠিক্ হৃদয়ভাবের উন্নয়ন করিতে পারেন।

নাটকের যে অসংখ্য স্থানে নীরব অভিনয়ের প্রয়োজন হয়, তাহা উল্লেখ করা যাইতে পারে না। কালিদাসের নাটকাবলির অভিনয় করিতে গেলে সেপ্রকার অনেক স্থল উপনীত হয়। উৎকৃষ্ট নাটক মাত্রেই এইপ্রকার সংস্থানে পরিপূর্ণ। এজন্য যাঁহারা নীরব অভিনয়ের বিষয় পুঙ্খানুপুঙ্খ জানিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদিগের উৎকৃষ্ট শ্রেণীর নাটকালোচনা করা নিতান্ত আবশ্যক।

ভাষা।

হৃদয়ভাবের আবেগ, সমস্ত হৃদয়েই নিলীন হয় না। বহ্নি তেজস্বী হইলে যেমন তাহা প্রজ্বলিত হইয়া শিখা দ্বারা বহির্দ্দেশে

সমস্ত তেজ ও উষ্ণতা বিনির্গত করিয়া দেয়, তেমনি হৃদয়ের উষ্ণতা সঞ্জাত হইলে তাহা বাহিরে বিমুক্ত হইতে চাহে। বাক্যই হৃদয়তাপ-বিনির্গমনের দ্বার-স্বরূপ। রোদনে শোকের উপশম বোধ হয়। চীৎকার ও তর্জ্জন-গর্জ্জনে ক্রোধ-রিপুর শমতা বিধান করে। বন্ধু-বান্ধবের নিকট হৃদয়-দ্বার উন্মুক্ত করিলে বিপ্রলম্ভের অনেক লাঘব জ্ঞান হয়। বাস্তবিক, ভাষাই ভাবপূর্ণ হৃদয়ের বাহ্য প্রবাহ। ভাবের প্রকৃতি-অনুসারে এই প্রবাহ কখন উচ্চ হইয়া স্ফীত হয়, কখন নীচগামী ও ধীরভাবে বহিতে থাকে। ভাষাও কখন উচ্চ হয়, কখন নীচ হয়; কখন মৃদু, কখন উগ্র; কখন দ্রুত, কখন ধীর; কখন কর্কশ, কখন মধুর হইয়া থাকে। কোন্ সময় কিপ্রকার হইবে, কেবল প্রকৃতি তাহা নির্দ্দেশ করিয়া দিতে পারে। কিপ্রকার ধ্বনিতে কাহার সহিত কথা কহিতে হইবে, কাহাকেও বলিয়া দিতে হয় না। হৃদয়ভাব যেপ্রকার থাকে, বাক্যের ধ্বনি তদনুযায়ী হইয়া থাকে। বাক্যের ধ্বনিতে হৃদয়-ভাবের পরিচয় হয়। বাগ্মী যখন বক্তৃতা করিতে থাকেন, তাঁহার কোন্ কথাগুলি কেবল মৌখিক ও অভ্যস্ত উপদেশ, এবং কোন্গুলিই বা বাস্তবিক হৃদয় হইতে সমুদ্ভূত হইতেছে, তাহা কাহাকেও বলিয়া দিতে হয় না। তাহা সহজে বাক্যের ধ্বনিতে ও নিঃসরণে প্রকাশিত হইয়া পড়ে। কারণ, হৃদয়ের কথা হৃদয়ে-গিয়া আঘাত করে আর কেবল মুখের কথা বাতাসে উড়িয়া যায়। যে অভিনেতা হৃদয় বেদনায় কথা কহিতে পারেন, তিনিই পরের হৃদয়ে সমবেদনা উদ্বোধিত করিতে পারিবেন।

স্বভাব অভিনয়।

অভিনেতার কার্য্যে অনেকগুলি নৈসর্গিক গুণের একাধারে সমাবেশ আবশ্যক। এই সমস্ত স্বাভাবিক গুণে ভূষিত না হইলে

অভিনেতার কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করা যায় না। প্রকৃতি ব্যতীত যাহা কিছুতেই প্রদান করিতে পারে না, তাহা শিক্ষা ও অভ্যাসের হস্ত হইতে প্রত্যাশা করা বিড়ম্বনা মাত্র। শিক্ষাতে রূপ দিতে পারে না, মধুর কণ্ঠ-ধ্বনি দিতে পারে না এবং সুকুমার হৃদয় দিতে পারে না। কিন্তু এই গুণগুলি অভিনেতার ব্যবসায়ের উপকরণ পদার্থ। স্বকীয় পরিশ্রম ও পরকীয় উপদেশে এই প্রকার গুণনিচয় লাভ করা যায় না। কিন্তু যে স্থলে স্বভাব এই সমস্ত গুণে অভিনেতাকে বিভূষিত করিয়াছে, তথায় শিক্ষা, পরিশ্রম, সুরুচি ও বিবেচনা যে, তাহাদিগের সদ্ব্যবহার ও নিয়োজন-পথ নির্দ্দেশ করিয়া দিতে পারে, তাহার আর সন্দেহ নাই। যে পুস্তক অভিনয় করিতে হইবে, সেই গ্রন্থখানি আদ্যোপান্ত অধ্যয়ন করিয়া তাহার কবিত্ব, অভিপ্রায় ও তন্নিবিষ্ট পাত্র এবং পাত্রীগণের বিষয় সম্যক্ রূপে পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে অভিনয়-কালে পাত্র ও পাত্রীগণের অবস্থা অনেকদূর স্বকীয় ভাগ্য বলিয়া উপলব্ধি হইতে পারে; তখন অভিনয়-কার্য্য স্বাভাবিক ও সুসম্পন্ন হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা। যে অভিনেতা স্বীয় কার্য্যে এতদূর অভিনিবিষ্ট হয়েন, ক্রমশঃ তাঁহার প্রকৃতি-বোধ জন্মিতে থাকে এবং প্রকৃতি-বোধ যত প্রগাঢ় ও তেজস্বী হইতে থাকিবে, ততই তিনি কৃত্রিমতার হাত হইতে মুক্ত হইতে পারিবেন। তখন তিনি উপদেশের অপেক্ষা না করিয়া যথাযথ অঙ্গ-ভঙ্গি-ক্রমে অনায়াসে অভিনয় করিয়া যাইতে পারিবেন। যিনি অভিনীত পাত্রের হৃদয়ভাব বিলক্ষণ বুঝিতে পারিয়াছেন, এবং সেই সম-বেদনায় ব্যথিত হইয়াছেন, তাঁহার পক্ষে সেই হৃদয়ভাব প্রদর্শন করা সুকঠিন নহে।

নাটকীয় যে ব্যক্তির চরিত্র অভিনয় করিতে হইবে, যদি তৎ-

প্রতি অশ্রদ্ধা বা অপরক্তি জন্মে, তাহা হইলে সে অভিনয়ে ব্রতী হওয়া উচিত নহে। কারণ, সেপ্রকার ঘৃণা জন্মিলে অভিনয়-কার্য্যে অনুরাগ জন্মে না। সুতরাং অনেক স্থলে তাহাতে প্রকৃতি-ভঙ্গের দোষাশ্রয় করিবার সম্ভাবনা। যে অভিনেতা অতি সুদক্ষ, তাঁহার কোন চরিত্রের অভিনয়ে অপারগতা জন্মে না। কারণ, চরিত্র ভালই হউক আর মন্দই হউক, তিনি জানেন যে, তাহাতে কিছু ক্ষতি নাই; কিন্তু সেই চরিত্রের স্বাভাবিক অভিনয় প্রদর্শন করাতেই অভিনেতার কৌশল ও গুণপনা। যিনি লম্পট, ভণ্ড, শঠ, অথবা খলের চরিত্র অভিনয় করেন, তিনি যদি এমত মনে করেন যে, সে অভিনয়েও পাপ আছে, অথবা তদ্রূপ অভিনয় করিলে লোকে আমাকে ঘৃণা এবং অশ্রদ্ধা করিবে, তাহা হইলে তাঁহার তদ্রূপ চরিত্রের অভিনয় করা বিহিত নহে। কারণ, সে অভিনয়ে তাঁহার হৃদয় মিলিত হইবে না। যাহাতে হৃদয় না মিশিতে চাহে, তাহা কথন স্বাভাবিক হয় না। অভি-নেতা এরূপ সঙ্কুচিত থাকেন যে, তিনি কখন অনায়াসে অঙ্গচেষ্টা করিতে পারেন না। যে দর্শকগণ আবার মনে করেন, কুচরিত্র-লোক ব্যতীত কুচরিত্রের উত্তম অভিনয় করিতে পারে না, আমরা তাঁহাদিগকে কি বলিব জানি না। তাঁহারা নিতান্ত ভ্রান্ত ও বিবেচনা-বিরহিত।

এই স্থলে আমার কোন অভিনয়-চতুর উত্তম কথকের কথা মনে হইল। কথক কীচকবধের পালা ধরিয়াছেন। কীচক যখন অভিসার-পথে গমন করিতেছে, তাহার তখনকার লম্পট-সুলভ অঙ্গবিলাস, দ্রৌপদীর সহিত অঙ্গচেষ্টা ও ইঙ্গিতাদি কথক এপ্রকার স্বাভাবিকভাবে বর্ণন ও প্রদর্শন করিলেন, যেন বোধ

হইল, তিনি একজন নিজেই লম্পটগুরু। দ্রৌপদী আবার যখন কীচকের সহিত ছলনা করিতেছেন, তখন কথকের অভিনয় দেখিয়া এই আশ্চর্য্য বোধ হইতে লাগিল যে, তিনি পুরুষ হইয়া স্ত্রীজাতির চরিত্র, অঙ্গবিন্যাস এবং বাক্য-বিরচন কিরূপে এমত পরিপাটীরূপে প্রদর্শন করিতে সমর্থ হইলেন! যখন কথকবর আবার ভীমের সহিত কীচকের যুদ্ধ-বর্ণন ও অঙ্গভঙ্গিক্রমে কিয়ৎপরিমাণে উভয়ের বীর্য্য ও বাহুবিক্রম দেখাইতে লাগিলেন, তৎকালে তাঁহাকেই যেন একজন মহা বীরপুরুষ বলিয়া অনুমান হইতে লাগিল। কথকের এইপ্রকার অসাধারণ অভিনয়-কৌশল দেখিয়া মনে মনে তাঁহার বিস্তর প্রশংসা করিতে লাগিলাম এবং যতক্ষণ তাঁহার সমক্ষে উপস্থিত ছিলাম, ততক্ষণ যাবতীয় বর্ণিত বিষয় কল্পনায় যেন প্রত্যক্ষ দেখিতে লাগিলাম। কথকের অভিনয়দক্ষতাই যে এপ্রকার হৃদয়-বিভ্রমের কারণ হইয়াছিল, তাহার আর সন্দেহ নাই। যিনি যেপ্রকার লোক, তিনি যে সেইপ্রকার লোকের চরিত্র বিশিষ্টরূপে অভিনয় করিতে পারিবেন, এ কথার যাথার্থ্য সকল সময় প্রতিপাদিত হয় না। এবং অনেক-সময় বিপরীতই ঘটে। কারণ, যিনি যেপ্রকার লোক, তাঁহার তদনুরূপ অভিনয়ে লজ্জা বোধ হয়। যিনি যেপ্রকার লোকের চরিত্র উত্তমরূপে অভিনয় করিতে পারেন, তাঁহাকে তদ্রূপ জ্ঞান করাও নির্ব্বোধের কার্য্য।

প্রকৃতি-বোধ।

নাটকীয় পাত্র ও পাত্রীগণের স্বভাব বুঝিয়া অনুরূপ অভিনয় করাতে যে প্রকৃতি-বোধ আবশ্যক করে, তাহা কিরূপে উৎপন্ন

হয়, ইহা একটি বিসংবাদী বিষয়। প্রকৃতি-বোধ কিরূপে জন্মে, তাহা ঠিক্ নির্ণয় করা দুষ্কর। কেহ কেহ অনুমান করেন, এক একজনের কেমন স্বাভাবিক সংস্কার হইয়া উঠে। এক একজন কেমন সূক্ষ্মদর্শী থাকেন যে, তাঁহারা লোকসমাজের যাবতীয় লোকের প্রকৃতি যেন আণুবীক্ষণিক দৃষ্টিতে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পর্য্যবেক্ষণ করিয়া দেখিয়া থাকেন। এপ্রকার সূক্ষ্মদৃষ্টি সকলের অভ্যস্ত হয় না। এক একজনের মানসিক প্রকৃতিই এইরূপ যে, তিনি সকল বিষয় অভিনিবেশ-সহকারে তন্ন তন্ন করিয়া আপনা-আপনিই দেখিয়া থাকেন, তাহার জন্য বিভিন্ন শিক্ষার আবশ্যকতা হয় না। তবে স্বাভাবিক গুণ যে ভূয়োদর্শনে অধিকতর উন্নত ও প্রবৃদ্ধ হইতে পারে, তাহার আর সন্দেহ নাই। শিক্ষিত ব্যক্তির যদি এপ্রকার স্বাভাবিক সূক্ষ্মদৃষ্টি থাকে, তাহার ক্রমশই তীক্ষ্ণতা সম্পাদিত হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা। অনেক কুচরিত্র লোকের এই সূক্ষ্মদৃষ্টি ক্রমশঃ ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়াছে। যাহা হউক, এতদ্বিষয়ক সম্পূর্ণ জল্পনা ও তর্ক উত্থাপন করা আমাদের উদ্দেশ্য নহে। তবে সকলপ্রকার লোকের সংসর্গে না বেড়াইলে যে, প্রকৃতিবোধ উৎপন্ন হয় না, এ কথা সত্য বলিয়া স্বীকার করিতে পারি না।

অঙ্গভঙ্গি ও কণ্ঠধ্বনি।

যে কারণেই প্রকৃতিবোধ উৎপন্ন হউক না কেন, প্রকৃতিবোধ থাকিলে মানবপ্রকৃতিগত দোষগুণ এবং কাহার প্রকৃতিতে কোন্ গুণ ও দোষগুলি বিশেষ লক্ষ্যস্থল ও দেদীপ্যমান রহিয়াছে, তাহা যেন সহজজ্ঞানে প্রতীত হইতে থাকে। বাঙ্গালীর সমক্ষে ইংরাজগণ কিরূপে চলেন, কিরূপে কথাবার্ত্তা কহেন, কিরূপ

গর্ব্বিতভাবে গুরুত্ব ও প্রভুত্ব-ভাব প্রতিপদে প্রকাশিত করেন, উত্তম অভিনেতা যখন ইংরাজচরিত্র অভিনয় করিতে যাইবেন, তখন তিনি সে-সমস্ত অনুকরণ না করিয়া কখন ইংরাজ সাজিবেন না। প্রণয়ান্ধ প্রণয়ীর চরিত্র যিনি অভিনয় করিতে যাইবেন, সেই প্রণয়ী মহাবীরপুরুষ হইলেও সুস্নিগ্ধ ও মোহকারী প্রণয়দ্বারা সেই বীরপুরুষও কেমন কামিনীমন-বিমুগ্ধকর সুকুমার ভাবে বিনত ও বিচলিত হইয়া থাকেন এবং সেই ভাবে বিচলিত হইয়া তিনি কেমন স্ত্রৈণতার বিশেষ ভাবভঙ্গি দেখাইতে থাকেন, অভিনেতা তাহা উত্তমরূপে প্রদর্শন করেন। একজন ইংরাজচরিত্র অভিনয় করিল, অন্যজন প্রণয়রূপ হৃদয়ভাবের অভিনয় প্রদর্শন করিল বটে, কিন্তু ইহারা দুই জনেই কতকগুলি বিশেষ বিশেষ দ্রষ্টব্য গুণ ও দোষ দেখাইয়া ইংরাজ ও প্রণয়ীর ভাব দর্শকগণের মনে উদিত করিয়া দিল।

প্রতি হৃদয়ভাব বাহ্যজগতে যে-সমস্ত বিশেষ লক্ষণ, অঙ্গভঙ্গি ও কণ্ঠধ্বনিতে পরিব্যক্ত হয়, সেই সমুদায় তাহার পরিভাষা। হৃদয়াভ্যন্তরে যে কার্য্যটি হয়, মুখাবয়বে, বাক্যধ্বনিতে এবং সর্ব্বাঙ্গের ভঙ্গিক্রমে তাহা প্রকাশিত হইয়া পড়ে। ললাটের প্রতি রেখার সহিত এবং মনুষ্যের প্রতি কণ্ঠস্বরের সহিত হৃদয়ের যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ, তাহার পর্য্যালোচনা করা প্রতি অভিনেতার কর্ত্তব্য। হৃদয়বীণার একতন্ত্রে আঘাত কর, সমুদায় শরীরে তাহা ধ্বনিত হইবে। অঙ্গভঙ্গির সমুদায় লক্ষণ বিবৃত করিতে গেলে একখানি বৃহৎ গ্রন্থ হইয়া পড়ে। তবে টলী (Tully) কণ্ঠধ্বনির যে কতিপয় সামান্য সূত্র প্রদান করিয়াছেন, তাহা ক্রমশঃ প্রদর্শন করা যাইতেছে।

মানব ক্রোধপরবশ হইলে তাহার কণ্ঠরব অতি উচ্চ, কর্কশ

এবং চড়া হয়, বাক্য-সকল দ্রুতগামী হইয়া পড়ে। ভারতচন্দ্র কোটালের শাসন-স্থলে রাজার উক্তিতে কহেন :—

"নিমক-হারাম বেটা, আজি বাঁচাইবে কেটা,
দেখিবি করিব যেই হাল॥
লুটিলি সকল দেশ, মোর পুরী ছিল শেষ,
তাহে চুরি করিলি আরম্ভ।
আন বাচ্চা এক খাদে, গাড়িব হারামজাদে,
তবে সে জানিবি মোর দম্ভ॥"

শোকের ধ্বনি সম্পূর্ণ বিভিন্ন। শোকের বাক্য অতি মৃদু, ধীর, থাকিয়া থাকিয়া কম্পিত রবে উচ্চারিত হয়। কার্‌ডিনাল উল্‌সী রাজ্যের উচ্চতম পদ হইতে নিপতিত হইয়া যেপ্রকার শোচনীয় বাক্যে দুঃখ প্রকাশ করিয়াছিলেন, শেক্সপিয়ার তাহা একটি চমৎকার স্বগতবাক্যে বিরচন করিয়াছেন :—

"গৌরব! সম্পদ্! তোমাদের নিকট আমি বিদায় হইলাম। চিরকালের জন্য বিদায় হইলাম। মানবের এইরূপ অদৃষ্ট! আজি তিনি আশার নবপল্লবে শোভিত হন, কালি তাঁহার আশাবৃক্ষ মুকুলিত হয়, সহস্র সম্পদের ফলভরে অবনত হইয়া পড়ে, পরশ্ব কোথা হইতে দিক্‌ব্যাপী কুজ্‌ঝটিকা সমুত্থিত হয়,—ভয়ানক সংহারমূর্ত্তি কুজ্‌ঝটিকা! মানব যখন মনে করিতেছে, তাহার আশা-বৃক্ষের ফল-সকল পরিণত-প্রায়, অমনি সেই বৃক্ষ সমূলে শুষ্ক হইয়া যায়। তখন মানব আমার মত দুরাশার সাগর-গর্ভে নিপতিত হয়।"

সীতা রামচন্দ্রকে উল্লেখ করিয়া সরমার নিকট ক্রন্দন করিতেছেন :—

"হায়, সখি, আর কিলো পাব প্রাণনাথে?
আর কি এ পোড়া আঁখি এ ছার জনমে
দেখিবে সে পা-দুখানি—আশার সরসে
রাজীব; নয়নমণি? হে দারুণ বিধি,
কি পাপে পাপী এ দাসী তোমার সমীপে?"

ভয়ের ধ্বনি অতি লঘু এবং ভঙ্গ; বাক্য-সকল দ্রুত এবং চপল। যথা :—

"বড় বাবু, পালিয়ে এসোগো, পালিয়ে এসো, ঐ দেখ বুড়ী বিড় বিড়,ক'রে কি মন্ত্র প'ড়্ছে, কি আপদ্! দুর্গা! দুর্গা! দুর্গা! কি হবে গা বড় বাবু? আমার তো বড় ভয় ক'র্ছে।"

সাহসের ধ্বনি ইহার ঠিক্ বিপরীত। কোমলকণ্ঠ সীতাদেবীও এককালে কেমন সাহসপরায়ণা হইয়া উচ্চ ভৎর্সনা-রবে দেবর লক্ষ্মণকে কহিতেছেন :—

"রে ভীরু, রে বীর-কুলগ্লানি, যাব আমি,
দেখিব করুণ স্বরে কে স্মরে আমারে
দূর বনে?"

সুখসঞ্চারিত হৃদয়ের বাক্যপরম্পরা অতি মৃদু, সুকুমার অথচ উল্লসিত। যথা :—

"এই যে, প্রাণেশ্বরী নিদ্রিতা; নিদ্রাবস্থায় প্রেয়সীর মুখারবিন্দ কি অনির্ব্বচনীয় মধুরতা ধারণ করিয়াছে! বোধ হয় যেন কোন দেব-দুহিতা বা গন্ধর্ব্ব-কন্যা ভূলোকে অবতীর্ণা হইয়াছেন। আহা বিনোদিনীর ওষ্ঠাধর কি সুন্দর, কি লোভনীয়!"—নন্দবংশোচ্ছেদ।

কিন্তু হৃদয় যখন আনন্দে উৎফুল্ল ও উন্মত্ত হইয়া উঠে, তখনকার উৎসব-বাক্য উচ্চরবে যেন নৃত্য করিতে থাকে। যথা :—

"সুধায় প্রেমেতে বাজ্‌রে বীণা,
বল্ সুধা বই ধন্ চাহি না,
অমন মধুর নাই পিপাসা।
সুধা কিবা ধন, সুধা সে কেমন,
সাধক বিনা কি জানিবে চাষা!"

স্থানান্তরে :—

"চোর ধরি, হরি হরি, শব্দ করি, কয়।
কে আমারে, আর পারে, আর কারে ভয়।"

ভাঁড়ামি।

অভিনেতা শ্রবণশক্তি-সহকারে স্থলবিশেষে যেমন কণ্ঠ-ধ্বনির উচ্চনীচতা, গাম্ভীর্য্য ও লঘুতা প্রভৃতি গুণনিচয়ের প্রয়োগকুশলতা প্রদর্শন করিবেন, যে স্থানে যেরূপ স্বরের আবশ্যকতা তাহা বিবেচনা করিয়া লইবেন, তেমনি আবার কণ্ঠধ্বনির প্রয়োগ-অনুসারে অঙ্গাদির অভিনয়কার্য্য প্রদর্শন করাও আবশ্যক। ভয়ে যখন কণ্ঠধ্বনি নীচ হইয়া পড়িয়াছে, তখন অঙ্গাদির চালনায় সঙ্কোচ, ব্যাকুলতা এবং শশব্যস্ততা প্রদর্শন না করিলে কণ্ঠধ্বনি মাত্রে যথাযথ অভিনয় হইবে না। টলী বলিয়াছেন, হস্তই বাগ্মীর মহাস্ত্রস্বরূপ। বাক্য এবং হস্তের যথাযথ চালনা দ্বারা বাগ্মী শ্রোতৃবর্গকে এক এক সময়ে মন্ত্রমুগ্ধ করিতে পারেন। হস্তের চালনা ব্যতীত বীরত্ব প্রভৃতি কতিপয় হৃদয়ভাবের সম্যক্ বিস্ফুরণ হয় না। যে ব্যক্তি কহেন, অভিনেতার হস্ত-পদের চালনার একেবারে আবশ্যকতা নাই, তিনি হৃদ্গত ভাব-প্রকাশের নিয়মাদি সম্যক্ অবগত নহেন। যথাসময়ে হস্তপদাদির সঞ্চালনের নিতান্ত প্রয়োজন। প্রয়োজন-কালে যেমন আবশ্যক, অপ্রয়োজন-কালে হস্তপদের চালনা তেমনি হাস্যজনক হয়। আবার যেপ্রকার অঙ্গচালনার আবশ্যকতা, তাহা না করিয়া অন্যবিধ কৃত্রিম অভিনয়-কার্য্য দেখাইলে নিতান্ত বিরক্তি ধরে। যাত্রার বৃন্দা দূতীর অসাময়িক এবং কৃত্রিম হস্ত-চালনা দেখিলে বোধ হয় যেন তাহার সেইপ্রকার মুদ্রা-দোষ আছে। পুনঃ পুনঃ সেই একইপ্রকার অঙ্গভঙ্গি ও কর-সঞ্চালন দেখিলে সুতরাং বিরক্তি বোধ হয়। কিন্তু কে না হৃদয়ভাবপূর্ণ এবং উৎসাহিত বাগ্মীর মুখস্ফূর্ত্তি ও করসঞ্চালন দেখিয়া একেবারে বিমোহিত হইয়া যায়?

কারণ, তাহা স্বভাবের কার্য্য, তাহা বৃন্দাদূতীর কৃত্রিম ও রচিত কার্য্য নহে।

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, হৃদয়ের ভাব প্রধানতঃ মুখে এবং নয়নভঙ্গিতে প্রকটিত হয়। এই বদন এবং নেত্রভঙ্গির ব্যভিচার ঘটিলে অভিনয়কার্য্য কেবল ভাঁড়ামি হইয়া উঠে। দূতীগিরি ও ভাঁড়ামি, এ দুই—প্রকৃত অভিনয়-কার্য্যের ব্যভিচার হইতে উৎপন্ন হয়। এজন্য ভাঁড়ামিও বিরক্তিকর হইয়া উঠে। অনেকে হাসাইবার জন্য এইপ্রকার ভাঁড়ামি করিতে গিয়া যাত্রাওয়ালার সং সাজিয়া বসেন বটে, কিন্তু তাহাতে অভিনয়পটুতা ও গৌরবের বিষয় কিছুই নাই। বার বার সেপ্রকার মুখভঙ্গি দেখিলে অধিকাংশ লোকেরই বিরক্তি ধরে। অভিনেতা যদি মনে করেন, আমি কেবল রং করিয়া দর্শকগণের মনোরঞ্জন করিব, তাহা হইলে তিনি নিশ্চয় প্রতারিত হয়েন। রঙ্গ ও ব্যঙ্গ করাও যদি অস্বাভাবিক হয়, তাহা ভাল লাগে না। কিন্তু যেখানে ব্যঙ্গ করা আবশ্যক, সেখানে না করিলে অভিনয় প্রীতিপ্রদ হয় না। অভিনয়-কার্য্যে আতিশয্য-দোষ ঘটিলেও ভাঁড়ামি হয়। এই আতিশয্য-দোষ অবিমৃষ্যকারিতার ফল। অনেক অভিনেতাকে এরূপ দেখিতে পাওয়া যায় যে, তাঁহারা পূর্ব্বে প্রস্তুত না হইয়া সময়কালে সমুদায় বিবেচনার উপর নির্ভর করিয়া থাকেন। তখন সহস্র দর্শকমণ্ডলীর সমক্ষে বিবেচনাশক্তি ঠিক্ রাখিতে পারেন না। যেখানে মনে করিতেছেন, এইপ্রকার অভিনয় করিতে হইবে, সেখানে হয় ত সেই অভিনয়-কার্য্যের কিঞ্চিৎ আতিশয্য ঘটে। পূর্ব্বে প্রস্তুত না থাকিলে অভিনয়-কার্য্যাদি যথাসময়ে ঠিক্ যোগাইয়া উঠে না। উপস্থিত-মত অভিনয় করিতে গেলে অভিনয় নিতান্ত কৃত্রিম হইয়াও পড়ে। অনেক

অভিনেতা আবার হাস্য-উৎপাদন করিবার জন্য জানিয়া শুনিয়া অভিনয়কার্য্যে রং মিশাইতে যান, সুতরাং আতিশয্যদোষে নিপতিত হয়েন।

নাটকাভিনয়ের ফলশ্রুতি।

সুশিক্ষিত ও সুরুচিসম্পন্ন জনগণের পক্ষে রঙ্গভূমি যেপ্রকার উচ্চতর মানসিক সুখের আকরস্থান, যেরূপ নির্দ্দোষ আমোদের আলয়, তাহা নাটকাভিনয়ের নৈতিক অংশ পর্য্যালোচনা করিলে অনায়াসে প্রতিপন্ন হইবে। যে রঙ্গভূমিতে সমুদায় শিল্পবিদ্যা একত্র হইয়া দৃশ্যাভিনয়ের ঐন্দ্রজালিক নাট্যবিভ্রম উৎপাদন করে, যথায় উৎকৃষ্টতর কবিগণের কল্পনাকৌশল ও সদ্ভাবসম্পন্ন কবিত্ব লোক-লোচনের প্রকৃত বিষয় হইয়া বাহ্যদৃশ্যে দেদীপ্যমান হয়, যথায় স্থপতিবিদ্যাবিৎ শিল্পকার রঙ্গভূমিকে নানা পরিভূষণে অলঙ্কৃত করিয়াছেন, চিত্রকর পরিপ্রেক্ষিত চিত্রে সমুদায় রঙ্গভূমি পরিশোভিত করিয়াছেন, সঙ্গীতজ্ঞগণ মধুর সঙ্গীতধ্বনি ও গীত-বাদ্যে মন মোহিত করিতেছেন এবং অভিনীত বিষয়ের রসোৎকর্ষ সাধন করিতেছেন, যথায় কতিপয় প্রহরের অভিনয়-কালে দেশের উন্নতি, শিক্ষা, সভ্যতা ও রুচির এককালে সম্যক্ পরিচয় হইয়া থাকে, সেই পরম রমণীয় স্থলে কি শিশু, যুবা ও বৃদ্ধ, কি পুরুষ ও নারী, কি নির্ধন ও রাজা, কি শিক্ষিত ও অশিক্ষিত—সকলেই কি পরম পরিতোষ লাভ করিয়া কিয়ৎ ক্ষণের জন্য জীবনের সুখ সম্ভোগ করিয়া থাকেন না? এখানে নৃপতি, সৈন্যাধ্যক্ষ ও রাজনীতিজ্ঞগণ ভূত-পূর্ব্ব সুপ্রধান কীর্ত্তি ও ঘটনানিচয়ের পুনরভিনয় দর্শন করিতেছেন, তৎসঙ্গে সঙ্গে আপনাদিগের কার্য্য ও অবদান-সমূহের তুলনা করিয়া তাঁহা-

দিগের আপেক্ষিক গৌরবাভিমান অথবা হীনতা উপলব্ধ করিতেছেন। এখানে তত্ত্ববিৎগণ এক প্রহর-মধ্যে শত সহস্র চিন্তার বিষয় সংগ্রহ করিতেছেন, লোকমণ্ডলীর ব্যবস্থা এবং রীতি-নীতি ও মানবপ্রকৃতির অভিজ্ঞতা লাভ করিতেছেন। রঙ্গভূমিতে আসিয়া চিত্রকর দেখিতেছেন, কোন্ বিষয়টি তাঁহার বর্ণযোজনায় ভাবপরিপূর্ণ ও উজ্জ্বলতর শোভায় পরিদৃশ্যমান হইবে। তরুণবয়স্কগণের হৃদয় সদ্ভাবে পরিপূর্ণ ও উন্মত্ত হইতেছে। বৃদ্ধগণ আবার কল্পনাবলে উৎসব এবং আনন্দপূর্ণ যৌবনপথে পরিভ্রমণ করিয়া আসিতেছেন। সকলেরই মন উৎসাহ ও আনন্দে পরিপূর্ণ হইতেছে। সকলেই কিয়ৎকালের জন্য পৃথিবীর শোক, তাপ ও ভাবনা-চিন্তা বিস্মৃত হইয়া পরম সুখী হইতেছেন। রঙ্গভূমির উচ্চতর আনন্দে যাহার হৃদয়কন্দর পরিপূরিত না হয়, বৃথায় তাহার শিক্ষা, বৃথায় তাহার রুচি এবং বৃথায় তাগার হৃদয়ধারণ। সেই হতভাগ্য কলুষিত ইন্দ্রিয়সুখের ভোগমদে এরূপ প্রমত্ত হইয়া আছে যে, তাহার নিকট পবিত্র মানসিক সুখের নির্ম্মল বারি নিতান্ত বিস্বাদ বোধ হয়। এই ফলশ্রুতি কিরূপ?

"ফলশ্রুতিরিয়ং নৃণাং ন শ্রেয়ো রোচনং পরম্।"

সমাপ্ত।